দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান রচনা সংগ্রহ



পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
গৌতম ব্যানার্জি

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭৩

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর দিদি
কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচি

প্রাক্‌কথন

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'Asiatic Research'-এর প্রকাশনার সূত্রপাত ঘটে।

এই ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার প্রভাব ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ ১৮৩২-র এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা '*বিজ্ঞান সেবধি*'র প্রকাশ। এটি Society for translating European Science' থেকে প্রকাশিত হোত। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে, "*বিজ্ঞান সেবধি* অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্রের নিধি—লর্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুক্ত এইচ এইচ উইলসন সাহেবের আদেশে শ্রীযুক্ত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।" আরও একটি ব্যাপার, এটি শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ভারতীয় ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকাও বটে।

অপরদিকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি মূলত মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষায় সুপরিকল্পিতভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। এছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনারও সূত্রপাত ঘটে প্রধানত তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেগুলি হোল-শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিজ্ঞানের বই *অঙ্কপুস্তকম্* এর প্রকাশ ঘটে ১৮১৭তে। তার এক বছর পর ১৮১৮ এর এপ্রিলে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সাময়িক পত্র *দিগ্‌দর্শন*। এটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা। প্রকৃত বিচারে এটি বিজ্ঞান পত্রিকা না হলেও প্রকাশিত ২৬টি সংখ্যায় ২০-টিরও বেশি বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা বিষয়ক নানারচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা যায় বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা '*বিজ্ঞান* সেবধি' প্রকাশের পর বেশ কয়েকটি মাসিক পত্রে বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি হোল—*জ্ঞানান্বেষণ* (সাপ্তাহিক, ১৮ জুন ১৮৩১)

সম্পাদক দক্ষিণানন্দন (রঞ্জন) মুখোপাধ্যায়; *জ্ঞানোদয়* (মাসিক, ডিসেম্বর ১৮৩১) সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র; *বিজ্ঞান সারসংগ্রহ* (পাক্ষিক, পরে মাসিক সেপ্টেম্বর ১৮৩৩), *বিদ্যাদর্শন* (মাসিক, জুন ১৮৪২), সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নকুমার ঘোষ; *তত্ত্ববোধিনী* (মাসিক, ১৬ আগস্ট ১৮৪৩) সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত—এইসব পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। শুধু বড়োদের পত্রিকায় নয়, শিশু-কিশোরদের সাময়িক পত্রিকাতেও বেশ কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি উনিশশতকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর সাময়িকের সংখ্যা ৩৯টি। সংখ্যায় এতগুলি হলেও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বহু পত্রিকা গবেষকদের নজরে আসেনি। এ প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। বর্তমানে যাঁর রচনা নিয়ে সংকলনটি প্রস্তুত—তাঁর একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, পিতা ব্রজকিশোর বসুর কর্মস্থল ভাগলপুরে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর (১২৭২ এর ৪ পৌষ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশাল জেলার চাঁদনীতে। তাঁর পিতা সে সময় ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্রজকিশোর একজন সুপণ্ডিত, বিদ্যানুরাগী, প্রসিদ্ধ সমাজ ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন। স্ত্রী জাতির উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট কাদম্বিনী গাঙ্গুলি তাঁর দিদি। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে এফ. এ পাশ করেন। শারীরিক অসুস্থতা বশত বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। কর্মজীবনের প্রথমভাগে তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন এবং সে সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রকৃতি নানা বিষয় উৎসাহের সঙ্গে চর্চা কবেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে বিদ্যানুরাগ ও বিশেষত প্রাণীবিদ্যাচর্চায় উৎসাহ লাভ করেন। প্রাণীবিদ্যাচর্চা তাঁব বিশেষ আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। এরপর তিনি কিছুকাল যশোহর সম্মিলনী স্কুলে শিক্ষকতার কার্যগ্রহণ করেন। পরে কয়েক বৎসর তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত ঢেঙ্কানাল রাজাপরিবারের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকরূপে কাজ করেন। তাঁব ভগিনীপতি খ্যাতনামা দেশকর্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন কলিকাতা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (Indian Association) এর সহ-কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি জাতীয় মহাসমিতির কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত যে শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তার কর্মীরূপে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করার জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে গমন করেন।

তিনি প্রধানত বালক-বালিকাদের উপযোগী প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'জীবজন্তু' ও 'চিড়িয়াখানা' নামে দুটি বই লিখেছিলেন। বই দুটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক ছিলেন।

জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যোগ ছিল। পূর্বোক্ত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের

পক্ষ থেকে তিনি একবার জীবন বিপন্ন করে ছদ্মবেশে আসামের চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটর যান সংস্থার (Taxi Drivers' Association) সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯২১, ২৫ নভেম্বর) তিনি প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর প্রিয় পত্রিকা সন্দেশে সুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র একটি ছোট রচনায় এবং পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি কবিতায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই দুটি রচনাই পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত হোল।

'*প্রবাসী*' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়েছে,"জীবজন্তু" নামক বালক-বালিকাদের পাঠ্যগ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ৫৫ বছর বয়সে আকস্মিক মৃত্যুতে বালক-বালিকারা একজন স্নেহশীল বন্ধু হারাইলেন। তিনি 'সখা' ও 'সাথী' হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহু মাসিকপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধদের জন্যও লিখিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুবিস্তৃত ছিল, জ্ঞানপিপাসাও খুব বেশি ছিল। তিনি এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এবং ভারত সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া একবার কুলির বেশে আসাম চা-বাগানে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। (পৃ. ৪৩৯-৪৪০)

দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্ভবত প্রথম বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয় '*সখা*' পত্রিকার ১৮৮৭-এর মার্চ সংখ্যায়। এ সময় *সখা* সম্পাদনা করতেন অন্নদাচরণ সেন। অনেকেই জানেন *সখার* প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। মাইনে পেতেন ২৬ টাকা। সেই টাকার অনেকখানি ছাত্রকল্যাণে ব্যয়িত হোত। এই ছাত্রঅন্তপ্রাণ শিক্ষকটি কিভাবে ছোট ছোট ছাত্রদের জন্য একটি পত্রিকা বার করা যায়, এজন্য প্রতিনিয়তই ভাবতেন। অর্ধাহারে, অনাহারে থেকে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে তিনি ১৮৮৩-এর ১ জানুয়ারি তিনি '*সখা*' প্রকাশ করলেন। ঠিক আড়াই বছর প্রমদাচরণ পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে পেরেছিলেন। কালব্যাধি যক্ষ্মায় ১৮৮৫-এর ২১ জুন তিনি প্রয়াত হন। বঙ্কিমচন্দ্রও *সখা* পড়ে মুগ্ধ হয়ে প্রমদাচরণকে লিখিছেন "এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয়গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচিমার্জিত। এই সখার সঙ্গে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক মাত্রেই সখিত্ব করা উচিত। 'সখা'র জন্য, যাহার ঘরে শিক্ষণীয় বালক-বালিকা আছে, সেই আপনার নিকট ঋণী।'

প্রমদাচরণের প্রয়াণের পর তাঁর শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী বছর দেড়েক *সখা* সম্পাদনা করেন। পরে অন্নদাচরণ সেন ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় '*সখা*' ১৮৯৪ এর মার্চ মাস পর্য্যন্ত চলে।

এই *সখা* পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ছোটবড় ১৪টি রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম রচনা 'পিপীলিকার উপদেশ' চারটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের

সংখ্যা বেশি। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক দুটি রচনা ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথী' (বৈশাখ ১৩০০) পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই ভিন্নধর্মী। প্রবন্ধগুলি পরীক্ষামূলক। পাঠকপাঠিকারা যাতে বিজ্ঞানের ভিতরে সাগ্রহে প্রবেশ করতে পারে, কার্য-কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়—এজন্যই পরীক্ষাগুলি সহজভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। বিশেষ করে 'বিজ্ঞান-কৌতুক' প্রবন্ধটি বেশ চিত্তাকর্ষক। 'মনের কথা বলা' অঙ্কবিষয়ক ধাঁধা। আমাদের কিশোর বয়সে এই ধরনের অঙ্ক মুখে মুখে ফিরত। চিত্রযোগে পরিবেশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রস্তুত সংকলনে চিত্রগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

'*সাথী*', এক বছর চলেছিল—১৮৯৩-এর মে থেকে ১৮৯৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত। এই সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া '*সখা*'-কে পরম স্নেহে বুকে তুলে নিলেন '*সাথী*' সম্পাদক ভুবনমোহন রায়। ভুবনমোহন রায় প্রয়াত সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের আত্মীয় ও একই স্থানের মানুষ। তাছাড়া তিনি '*সখা*'-র নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৮৪-র মে থেকে ১৮৯০-এর মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় ভুবনমোহন রায়ের প্রায় ৬০টির কাছাকাছি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক কাহিনি, স্থানিক বিবরণ সহ বহু মনীষীর জীবনকথা তিনি তুলে ধরেছিলেন। তবে 'সাথী' ঠিক 'সখা'র আদর্শেই ললিত হয়েছিল। ভুবনমোহন, প্রমদাচরণ ও সখাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়ে ও মর্যাদা দিয়েই নূতন প্রকাশিত পত্রিকার নাম দিলেন 'সখা ও সাথী'। 'সখা ও সাথী'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ—

"যে বয়সে বড় তাহার সম্মান করিতে হয়। সখা, সাথী অপেক্ষা যে বয়সে বড়ো সুতরাং সখাকে সাথীর সম্মান করা উচিত। বিশেষ প্রমদাচরণ এদেশে এপ্রকার পত্রিকার প্রবর্ত্তক বলিলেই হয়। তাই প্রমদাচরণের সম্মান ও স্মৃতিরক্ষার জন্য এবং তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই সম্মিলিত পত্রিকার নামকরণে (?) তাহার সখার নামই প্রথমে দেওয়া হইল। আমরা আশাকরি সাথীর গ্রাহকগণেরও এখন কোন ক্ষোভের কারণ নাই।" অর্থাৎ 'সাথী'র দ্বিতীয় বর্ষ 'সখা ও সাথী' নামে পরিচিত হোল।

এই 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের নানাধরনের ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ১৩০১-এর কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র-এই তিনটি সংখ্যায় 'শিকারী গাছ' নামে একটি সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রবন্ধটির সহ লেখক ছিলেন জনৈক রাসবিহারী সেন। অবশ্য অন্য তেরোটি প্রবন্ধই তিনি একাই লিখেছিলেন। আর একটা ব্যাপার 'সখা ও সাথী' চারবছর (বৈশাখ ১৩০১-চৈত্র ১৩০৪) চললেও তিনি এই পত্রিকায় দু-একটি রচনা ছাড়া আর কোনো লেখা লেখেননি। প্রকাশিত ১৪টি প্রবন্ধের মধ্যে ১৩টি জীববিজ্ঞান বিষয়ক। কেবল ১টি ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের।

'সখা ও সাথী'র প্রকাশের ১ বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় *মুকুল* প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। শিবনাথ ১৩০২-এর আষাঢ় থেকে ১৩০৭-এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত মুকুল যথেষ্ট দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনা পর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই 'মুকুল' পত্রিকায় একটিও রচনা লেখেননি। কিন্তু ১৩০৮ এর বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছেন। এর কারণ বোঝা কঠিন। অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'History of the Brahmo Samaj' '(2nd edn 1974) থেকে জানা যায় ১৯০৩-এর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির ৮ জন সদস্যের তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৩০৮-এর বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি মাত্র তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অবশ্য এই সময় তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকায় ১৩০৭-এর বিভিন্ন সংখ্যায় ২টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ২টি প্রবন্ধের মধ্যে একটি উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক ও অপরটি পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা আলোকবিজ্ঞানের। আলোকবিজ্ঞানের প্রবন্ধটি (আলোক : দৃশ্যও অদৃশ্য) ভাদ্র, আশ্বিন ও চৈত্র এই তিনটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৮-এর কার্ত্তিক সংখ্যায় উদ্ভিদের বংশ বিস্তার নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার অনেক পরে অর্থাৎ ১৩২৬-এর কার্ত্তিক সংখ্যায় 'মূষিকাদি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ছিল যথেষ্ট উচ্চমানের।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'ধ্রুব' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় অর্থাৎ বৈশাখ ১৩১৯ এ 'ক্যাঙ্গারু' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ধ্রুব মাত্র দু'বছর চলেছিল— এই দু'বছরে দ্বিজেন্দ্রনাথের আর কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি।

বিশিষ্ট সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি মাত্র রচনা প্রকাশিত হয়। 'প্রদীপ'-এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৪-এর পৌষ মাসে। তৃতীয়বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ ১৩০৬-এর মাঘ মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রদীপের সম্পাদকতা করেন। নতুন সম্পাদক হন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি মাত্র চারমাস (ফাল্গুন ১৩০৬ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। আষাঢ় ১৩০৭ থেকে বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রদীপের সম্পাদক পদে বৃত হন। তিনি একাধারে প্রদীপ-এর সম্পাদক, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারীও কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই সম্পাদনাকালে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৮-এর যুগ্ম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অমরজীব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এবারে সন্দেশ পত্রিকা প্রসঙ্গ। এই সন্দেশ পত্রিকার দ্বিজেন্দ্রনাথের ১৯টি ছোটবড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২৩-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩২৮ এর আশ্বিন পর্য্যন্ত তাঁর এই লেখাগুলির প্রকাশকাল। বলা যায় তিনি সন্দেশের বাঁধা লেখক ছিলেন।

সন্দেশ-এর প্রথম প্রকাশ ১৩২০ (১৯১৩)র বৈশাখে। সম্পাদনা করেছিলেন

সেকালের বিশিষ্ট লেখক ও নানা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ উপেন্দ্রকিশোর। সন্দেশের ভালো লেখা, ভালো ছবি, ভালো ছাপা, ভালো প্রচ্ছদ—সব নিয়ে *সন্দেশ* সার্থক নামা হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলা মজুমদারের মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সন্দেশের প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর স্মৃতিকথা 'পাকদণ্ডী'-তে তিনি এই ঘটনার মনোরম বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—"সন্দেশ প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই সময় সেই ঘরে যে ক'জন মানুষের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, তারা কেউই বোধহয় জীবনে কখনো "সে সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারবে না।" 'সন্দেশ'-এর প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। 'সন্দেশ' যখন খুশিতে ঝলমল করছে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—সে সময় উপেন্দ্রকিশোর মাত্র ৫২ বছর বয়সে (২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫, বাংলা ১৩২২, ৪ পৌষ) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণের পর তার সুযোগ্য পুত্র সুকুমার সন্দেশের হাল ধরেন। কিভাবে পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয়, আরও সুন্দর, রমণীয়, লোভনীয় করে তোলা যায়—এ নিয়ে সুকুমারেরও চিন্তার অন্ত ছিল না। সন্দেশের জন্য সুকুমার প্রয়োজন বোধে একই সংখ্যায় ছয়-সাতটি লেখাও লিখেছেন। এই সময়ে তাঁর বহু কবিতা ও নাটক প্রকাশিত হয়েছে। একটানা আটবছর (১৯১৫-১৯২৩) সন্দেশ সম্পাদনা করে সুকুমার দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগে মাত্র ৩৬বছর বয়সে বিদায় নিলেন।এই আট বছরের মধ্যে আড়াই বছর কেটেছে তার রোগশয্যায়। রোগজর্জ্জরিত দেহেও তিনি সন্দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। ভালোবাসার কি শক্তি! সুকুমারের সম্পাদনা কালেই দ্বিজেন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধই প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক।

এই প্রবন্ধগুলি ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের দুটি বইয়ের খবর আমরা পেয়েছি। একটি জীবজন্তু ও অপরটি চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানাটি একেবারে ছোটেদের জন্য লেখা। আখ্যাপত্রে লেখা রয়েছে এভাবে—চিড়িয়াখানা/প্রথমভাগ/ জীবজন্তু প্রণেতা/দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত/কলিকাতা/সিটি বুক সোসাইটী/৬৪নং কলেজ স্ট্রিট/মূল্য চার আনা/৬নং কলেজ স্কোয়ার সাম্য যন্ত্রে/সেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত/১৩১৮

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫। বইটিতে চিত্রসহ বানর, বনমানুষ, গিবন, হনুমান, মর্কট, সোনা ও ডায়না বাঁদর, বেবুন ও মাকড়সা বানর প্রভৃতি জন্তুর কথা।পৃথকভাগে মাংসাশী জন্তু ও খুরীজন্তুর আলোচনা আছে। মাংসাশী পশুদের মধ্যে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, ভালুক এবং খুরী জন্তুদের মধ্যে মৃগ, কালসার কুরঙ্গ, নীলগাই, হরিণ, লাল হরিণ, সম্বর, চিতাহরিণ, জিরাফ, উট, জলহস্তী, টেপির, গণ্ডার, জেব্রা, হাতী, ও কাঙ্গারুর কথা আছে।

'জীবজন্তু' প্রথম প্রকাশ ১৯১০ (বাং ১৩০৮) সিটিবুক সোসাইটী প্রকাশিত বইটি আরো উচ্চমানের! যেভাবে তিনি জীবজন্তুদের পর্ববিভাগ করেছেন—তা রীতিমত বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকলে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থটি প্রকাশের পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তিত *প্রদীপ* (১৩০৪-১৩০৫) পত্রিকায় বৈকুণ্ঠনাথ দাস সম্পাদিত ১৩০৮-এর ভাদ্র সংখ্যায় এই বইয়ের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি দীর্ঘ। তাই প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত হোল''...একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুস্তকখানির নাম জীবজন্তু, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। বর্ণনীয় বিষয় নামোল্লেখে ব্যক্ত হইতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর কিছু বলা আবশ্যক বোধ হয় না। দেখিতেছি এ পুস্তকে বিষয়টি শেষ হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য আমরা গ্রন্থকারের নিকট-এ বিষয়ে আরো কিছু আশা করিতে পারি।

বালকদিগের উপযোগী ভাষায় ধারাবাহিক প্রাণী বৃত্তান্ত বিষয় এমন মনোহর বাঙ্গলা গ্রন্থ আমি আর দেখি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং শিশুদিগের রুচি, উভয়ের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পুস্তক লেখা অতি কঠিন কার্য্য। এই কার্য্য এরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে গ্রন্থকারকে নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বালকগণের হস্তে যদি সকল সময় তাহাদের পড়িবার পুস্তক ক্রয় করিবার ভার থাকিত, তবে তাহারা দ্বিজেন্দ্রবাবুর এ পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে কখনই দিত না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ''(পৃ : ৩৬৪)

'মুকুল' ১৩০৮ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই বইযের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমালোচনাটিও যথেষ্ট বড়-তাই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি। ''—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু একজন সুলেখক। ছেলেদের জন্য লেখা তাঁহার অভ্যাস আছে। সখাতে তিনি অনেকদিন লিখিয়াছেন। এই বইখানিতে ইতর প্রাণীদের বিষয়ে অনেক কথা আছে। এই প্রকার পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ লেখেন নাই। অনেকদিন হইল শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একখানি ছোট স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তোমাদিগের দুর্ভাগ্য বলিয়া এমন বিষয় যাহা পড়িলে জ্ঞান ও আমোদ দুইই প্রাণ ভরিয়া পাইয়া মনে বিমল আনন্দের উদয় হয়, তাহা স্কুলে শিখিবার মত বলিয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের মনে হইল না।... ছেলেবেলায় আমাদের যাহার জন্য ক্ষোভ ছিল, শিশুদেরও তাহাদের পিতামাতাদের প্রকৃত বন্ধু দ্বিজেন্দ্রবাবু সে অভাব দূর করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বইখানিতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর ছবিতে পূর্ণ। জীবজন্তু সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার, সরল, বিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বইখানি তোমাদের জন্য লিখিত হইলেও বয়স্কেরাও ইহা পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিবেন; আমরা ইহা পড়িয়া অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই এরূপ

বলিতেছি। দ্বিজেন্দ্রবাবু বইখানিতে প্রাণিবৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লিখিবার প্রণালীর প্রধান বাহাদুরী এই যে, ইহাতে বিজ্ঞানের কঠিনতা ও নীরসতা নাই। স্থানে স্থানে ভাষাগত দোষ থাকিলেও লিখনভঙ্গী এমন সতেজ, সরল, ও মুগ্ধকর যে পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার বইখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইবে বলিয়া লিখেন নাই ইহা তাঁহার আর এক প্রশংসার কথা।" (পৃ: ২৯)

এবারে সংকলিত প্রবন্ধগুলির শৈলী বা পরিবেশন ভঙ্গি নিয়ে সামান্য আলোচনা করি। প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সহজ, সরল ভাষায় লিখিত। চিত্রযোগে পরিবেশিত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। কোথাও কোথাও পরিভাষার সামান্য সমস্যা থাকলেও গ্রহণযোগ্যতায় সেগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিতও তথ্যযুক্ত।

আগেই বলেছি, নানা দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্র থেকে রচনাগুলি সংকলন করা হয়েছে। জীর্ণতার কারণে বহু রচনার ছবি ব্যবহার করা যায়নি। আবার যেসব প্রবন্ধ ৭/৮ টি করে ছবি ছিল-সব ছবি না দিয়ে ৩/৪টি ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব ছবি মূলে অস্পষ্ট সেগুলি একেবারেই ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তবে মূলে যে ছবি ছিল সেই ছবিই ব্যবহৃত হয়েছে, ছবির কোনোরূপ বিকৃতি ঘটানো হয়নি।

মূলের বানানও অবিকৃত রাখা হয়েছে। দু-এক স্থলে দৃষ্টিকটু বানান বাধ্য হয়ে বর্জন করতে হয়েছে। রচনাগুলির প্রকাশস্থান ও প্রকাশকাল পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত হয়েছে—এতে পাঠকগণ প্রবন্ধটির পূর্ব পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশেও এটি সংযোজিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল ১২৯৪-১৩২৮। প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১১৪ বছর আগে ও শেষ রচনাটি ৯০ বছর আগে। এই সময়ের মধ্যে সংকলিত প্রবন্ধগুলির বিষয় নিয়ে অবশ্যই বিস্তর গবেষণা হয়েছে ও প্রচুর নতুন তথ্য আমাদের সামনে এসেছে। তবুও প্রায় একশো বছর আগে বিভিন্ন সাময়িকীতে কি ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো, সে কালের শিশু-কিশোর সাময়িকীর মান কেমন ছিল, লেখকেরা কি গভীর নিষ্ঠা দিয়ে লিখতেন-এ সব নানা কথা জানতে পারা যায়। সংকলিত প্রবন্ধগুলি আজও আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বিস্মৃতপ্রায় অকালপ্রয়াত বৈজ্ঞানিকের রচনাগুলি সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম অবহিত হোক, বিজ্ঞান ভাবনায় প্রাণিত হোক-এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা।

সংকলনটি প্রস্তুতকালে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। বহু উৎসাহী মানুষ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

পিপীলিকার উপদেশ

আমি কাল ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখিলাম যে, একটা ফড়িং হইয়া গিয়াছি এবং এদিক ওদিক করিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে অল্প অল্প ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, আর অমনি আমার সুমধুর ফড়িং কণ্ঠের গান ধরিয়া দিলাম। সে গানে মুগ্ধ হইয়া এক পিঁপড়ে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ আলাপ করিয়া আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। পিঁপড়ে তাহাদের বাড়ি যাইতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাদের বাড়ি পুকুরের ওপারে। পুকুর পার হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। দুজনার বুদ্ধি খাটাইয়া আমরা দুটা খড়ের ডাঁটার উপর একটা পাতা জড়াইয়া ভেলা তৈয়ার করিলাম। তার উপর দুজনা চড়িয়া একটা লম্বা খড় দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে চলিলাম। পুকুরে অনেক শেওলা, পানা, ঘাস জন্মিয়াছিল, তাহাতে আমাদের ভেলা বাধিয়া যাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে সে গুলি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পুকুরের মাঝখানে গিয়া দেখি জল হইতে বিড় বিড় করিয়া বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ও কি ভাই" সে বলিল "তাও জান না, ওখানে জলের ভিতর মাকড়সা ভূড় ভূড়ি তুলছে।' আমি আগে শুনিয়া ছিলাম যে 'মাকড়সারা কেবল স্থলেই থাকে।" পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "এরকমের মাকড়সারা জলের ভিতর থাকে আর জলের পোকা ধরিয়া খায়। সকলের রুচি ত আর সমান নয়, কেহ পাঁঠা খাইতে ভাল বাসে, কেহ আবার নিরামিষই খায়। ইহারা জলের পোকাই খাইতে ভাল বাসে তাই জলের ভিতর থাকে। জলের ভিতর থাকিয়াই নিশ্বাস টানে। জলের ভিতর গাছড়া থাকে, তাহাতে নিজের সূতা জড়ায় আর উল্টা ছোট ঘণ্টীর মত একটা বাসা সেই সূতা দিয়া তৈয়ার করে। বাসাটা প্রথমে জলে পূর্ণ থাকে, মাকড়সা জলের উপর উঠিয়া একগাল বাতাস টানিয়া লইয়া সেই বাসার তলে যাইয়া মুখের বাতাস ছাড়িয়া দেয়। বাতাস টুকু বাসার ভিতরে উপর দিকে থাকিয়া যায়। এইরূপ অনেকবার করিতে করিতে বাসাটা বায়ুতে পূর্ণ হইয়া যায় তখন মাকড়সা ইহার মধ্যে বাস করে ও স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস টানে। অনেক দিন পরে যখন ঘরের বাতাসটা খারাপ হইয়া যায় তখন মাকড়সা সেই বাসাটাকে কাত করিয়া ধরে আর ঘরের সব বাতাস বাহির হইয়া যায়। পুনরায়

নূতন বায়ু আনিয়া বাসা পূর্ণ করে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ রেসমের মত কোমল লোমে আবৃত, তাই জলে ইহাদের গাত্র ভিজিয়া যায় না।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর আমাদের ভেলা পুকুরের ওধারে আসিয়া লাগিল। পিঁপড়ের হাত ধরিয়া তাহাকে ভেলা হইতে নামাইলাম। দু'জনার হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে কত নূতন নূতন জিনিষ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর গিয়া এক গর্ত্তের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্ত্তের ভিতরটী বেশ শীতল। পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাই অল্পক্ষণের জন্য দু'জনায় ঘুমাইতে লাগিলাম। প্রথমে আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে এক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় নাই



তথাপি তিনি এমনি অশিষ্ট যে আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। একটা গাছে সূতা জড়ান জালের মত তাঁহার বাসা। দূর হইতে দেখিলাম কতকগুলি মাছির কঙ্কাল সেই বাসায় ঝুলিতেছে। আমি যাইতেছিলাম কিন্তু আমার পিপীলিকা বন্ধু আমার কানে কানে বলিলেন "উহাকে বিশ্বাস করিও না ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে, পক্ষীকে নিজের বাড়িতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ বধ করে, উহার নাম মাকড়সা।" মাকড়সা আমায় জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?" আমি বলিলাম "পিঁপড়েদের বাড়ি" তুমি কি পাগল হইয়াছ, প্রাণটা হারাবে না কি, যদি প্রাণের প্রতি কিছু মায়া থাকে তবে খবরদার পিঁপড়েদের বাড়ি যেও না। পিঁপড়েরা বড় দুষ্ট লোক, বড় রাগী, ওদের রাজ্যে সবাই সমান, রাজা টাজা নাই,

মার্কিন দেশের মত সবাই রাজা।" আমি বলিলাম "আমার বন্ধু পিঁপড়ে যে ওরকমের লোক তা আমার বিশ্বাস হয় না, তিনি বলিয়াছেন কোন ভয় নাই।" আমরা তথা হইতে চলিয়া গেলাম। পিঁপড়া মাকড়সার মুখে স্বজাতির নিন্দা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল "আপনি ওব্যাটাদের জানেন কি, আমি ওদের সব কুলের খবর জানি, আপনাকে সব বলিব।" আমরা পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি মাকড়সা মুখটী চুন করিয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া নিজের জালে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে করিয়াছিল আমাদের ভুলাইয়া তাহার জালে লইয়া গিয়া আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া উদর পূর্ণ করিবে। কিন্তু আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি না গিয়া রক্ষা পাইয়াছি। মাকড়সার কুলের খবর আমার বন্ধুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক, আমি আগামীবারে তাহা বলিব।

২

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—মাকড়সা আশ্চর্য্য কীট। ইহারা বড় হিংস্র; মায়া দয়া কিছুমাত্রই নাই। জীবন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। আহা, সেই পোকাগুলি তখন কত ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তাহা দেখিয়াও তাহাদের দয়া হয় না। অনেক দুষ্ট ছেলে আছে যারা পোকা মাকড় ব্যাং দেখিলেই কত যন্ত্রণা দেয় ও মারিয়া ফেলে, কিছুই দয়া হয় না, মাকড়সাও সেইরূপ। নিরামিষ ত খাইবেই না, তার পর মরা পোকা মাকড় ও খাইবে না। আমরা পিঁপড়ে, বুঝিলে ভাই, জেয়ন্ত পোকা টোকা খাই না, উদ্ভিদ খাই, চিনি খাই, মধু খাই, সন্দেশের ত কথাই নাই, আর মড়া জিনিসের মাংস খাই। জীব হিংসা করিতে আমাদের কেমন প্রাণে লাগে। ভাই! মাকড়সার অবস্থা দেখিলে আমাদের বড় দুঃখ হয়। তুমি ওদের গিয়ে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পার! ওদের শিক্ষা দিলে অনেক লাভ হইতে পারে।

ভাই! মাকড়সার আট্টা পা। আট্টা চোক। তলপেটে একটা থলিয়া আছে, সে থলিয়া হাঁসের ডিমের সাদা পদার্থের মত এক রকম রসে পূর্ণ। সে থলিয়ার গায়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম ফাঁপা লোম আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই রস বাহির হয়। বাহির হইবামাত্রই জমিয়া সূতার মত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সূতাগুলি একত্রিত হইয়া এক এক গাছি মাকড়সার সূতা হয়। এই সূতা দড়ির মত খোলা যায়। এই সূতা মাকড়সার অনেক কাজে আইসে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে, উপর উঠিতে বা নীচে নামিতে, বাসস্থান নির্মাণ করিতে, শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে, নিজের ডিমগুলি সাবধানে ঢাকিয়া রাখিতে, শীত হইতে পরিত্রাণের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতে—এই সকলেই মাকড়সা সূতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সকল মাকড়সাই একই প্রকারের জাল বুনে না। ইহাদের মধ্যেও মহারাট্টা, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, পার্শী আছে। ইহারা জাতীয় রীতি বজায়

রাখিতে বড়ই ইচ্ছুক। বাঙ্গালীর মত আবার জাতীয় রীতি অনুকরণ করিতে ভাল বাসে না; কোন কোন মাকড়সা গাড়ির চাকার মত জাল বুনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, কেহ আবার মাঝখানটা গর্ত্ত—ভিক্ষার ঝুলির মত—জাল বুনিয়া ঝুলাইয়া রাখে, আবার কেহ কেহ গর্ত্ত বা কোটরের মুখে বোম্বাই চাদরের মত পুরু জাল দিয়া দুয়ার নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে তাহার ভিতর বাস করে। সে দুয়ার মাকড়সা নিজের ইচ্ছায় খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে, অপরের পক্ষে সে দুয়ার খোলা বড় কঠিন ব্যাপার। কেহ দিবসে নিদ্রা যায়, রাত্রে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। কেহ রাত্রে ঘুমায়, সমস্ত দিবস শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ একস্থানে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, কখন ফাঁদে শিকার পড়িবে তাই ভাবিতে থাকে; সে স্থান হইতে আর নড়ে না। কাহার বা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, দিন রাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ শিকারের পশ্চাতে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে যায়, তৎপরে হঠাৎ তাহার গায়ে লাফাইয়া পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করে। কেহ কেহ বাতাসে নিজের সূতা উড়াইয়া দেয়, যখন সুতাটা বেশ বড় হয় তখন আর মাকড়সার ভার সূতাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; মাকড়সা শুদ্ধ সূতা বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে, ইহাকেই "চাঁদের বুড়ীর সূতা" বলে।

মাকড়সার বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়। একবার একটী মাকড়সা দুটী বৃক্ষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জাল তৈয়ার করে। জালটী বড় বলিয়া টান হয় নাই, বাতাসে বড় দুলিত, তাহাতে মাকড়সার বড় অসুবিধা হইত। টান করিবার জন্য জালের নীচের দিকে তিন চারিটী সূতা বাঁধিয়া সেগুলিকে গাছতলায় পাথর আর ঘাসের সহিত আট্‌কাইয়া দেয়। কিন্তু গাছতলা দিয়া লোক এবং গরু ও ছাগলের যাতায়াতে সে বাঁধগুলি ছিঁড়িয়া যায়। তখন মাকড়সা সূতার সাহায্যে নীচে নামিল এবং ভূমি হইতে একটি ছোট কাঁকর লইয়া পুনরায় সেই সূতার সাহায্যে উপরে উঠিয়া জালের নীচে সেইটিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল। কাঁকরের ভারে জালটি বেশ টান হইয়া রহিল। জালের তলা দিয়া অনায়াসে লোকজন যাতায়াত করিতে লাগিল, আর পূর্ব্বের ন্যায় ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিল না।

মাকড়সা রাগ এবং অভিযান প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মাছি ধরিয়া একটি মাকড়সার জালে ফেলিয়া দিতেন, আর যেই মাকড়সা সেই মাছি ধরিত, অমনি তিনি মাছিটিকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপ পাঁচ-ছয় বার করাতে মাকড়সার বড় রাগ হইল। পুনরায় মাছি ফেলিয়া দিলে সে আর ধরিতে আসিল না, জাল কাটিয়া দিয়া মাছিকে নীচে ফেলিয়া দিল। সেই লোকটী তারপর দিন মাকড়সার কত খোসামুদি করিলেন তথাপি তাঁহার মাছির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অনেকক্ষণ পরে সেটীকে দূরে ফেলিয়া দিল।

মাকড়সা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। মৃদুস্বরে বেহালা, হারমোনিয়াম বা পিয়ানো বাজাইলে মাকড়সাদিগকে অনেক সময়ে জাল ছাড়িয়া বাজনার নিকটে আসিতে দেখা গিয়াছে।

সঙ্গীতে এতই মুগ্ধ হয় যে, সে সময়ে তাহারা কোন বিপদের আশঙ্কা করে না। শব্দ কর্কশ হইলেই তাহারা পলাইয়া স্বস্থানে যায়।
অন্যান্য জীবের ন্যায় মাকড়সাও মৃত্যুর ভাণ করে। ভেককে আঘাত করিলে যেমন মড়ার মত পড়িয়া থাকে, কেন্নো পোকা নাড়িলে গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া যেমন পয়সার মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, মাকড়সাকে আঘাত করিলে সেই রূপ মড়ার মত পড়িয়া থাকে, পা ছিঁড়িয়া লইলেও নড়ে না। তারপর পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—এরা কেমন যে এক রকমের জীব তা বলা যায় না। এদের সমাজ নাই; শাসন-প্রণালী নাই। পারিবারিক স্নেহবন্ধন কিছুই নাই। ইহারা বড় স্বার্থপর, নিজের যোল আনাই বুঝে। অপরের খোঁজ খবরই রাখে না। একলা একলা থাকে, দু-তিন জন একসঙ্গে থাকিবে না, পরস্পরকে সাহায্য করিবে না, কাজেই ইহারা হিংস্র স্বভাব। যাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকে না, যাহাদের সমাজ নাই, তাহাদের দয়া, মায়া, স্নেহ, অনুরাগ, ভালবাসা—এই সকল বৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? আমরা পিঁপড়েরা ক্ষুদ্র জীব, আমরা পরের জন্য সারাদিন রাত খাটি, ভাই ভাই একসঙ্গে থাকি, আমাদের সমাজ-বন্ধন আছে, শাসন-প্রণালী আছে, অপরের অসময়ে সাহায্য করি, পীড়ার সময়ে সেবা শুশ্রূষা করি। আমাদের মধ্যে কেমন স্নেহ, বন্ধুতা আছে। আমরা বেশ সুখী—এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে আমরা পিঁপড়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩

যখন পিঁপড়ার বাড়ি আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেখানে যাইবামাত্রই বড় এক মজার যুদ্ধ দেখিলাম। একটা ক্ষুদ্র গুবরে পোকার সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে। বেচারা গুবরে পোকা একলা, তথাপি সে নির্ভয়ে অতি বীরত্বের সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত উৎসুক চিত্তে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অবশেষে গুবরে পোকারই জয় হইল, তাহার বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া আমি করতালি দিয়া 'সাবাস সাবাস' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাড়ির ভিতর দিয়া আহারাদির পর কিছুক্ষণ আমার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে শরীরের ক্লান্তি প্রযুক্ত শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাতটা যেন নির্বিঘ্নে কাটিয়াছিল, সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই; ভোর হইবামাত্র আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে জাগাইল। এবং আমার খাবার জন্য এক টুকরো মিছরি লইয়া আসিল। আমার আহার সমাপ্ত হইলে পর পিঁপড়ে কিছু গম্ভীর ভাবে আমাকে বলিল, "ভাই আমি তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমাদের দলের লোকের সহিত গুবরে পোকার যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহাতে আমাদের দলের লোক

হারিয়া যায় সেই জন্য তুমি গুবরে পোকাকে 'সাবাস' বলিয়াছিলে, তাহাতে আমাদের উদ্ধত স্বভাব কতিপয় যুবক বড় চটিয়াছিল, দেখ আমাদের ছোঁড়ারা বড় গোঁয়ার, তাদের অগ্রপশ্চাৎ কোন বিবেচনা নাই, আর বড় অভিমানী, তাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া কার্য কি?" আমার তখন মাকড়সার কথাগুলি সব মনে পড়িতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিলাম পরের ধানে মই দিতে যাওয়া বড়ই অন্যায়। আমার বন্ধুকে বলিলাম "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতি সাবধানে তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত ব্যবহার করিব।" তাহার পর আমরা দুজনে পিঁপড়ের দেশ দেখিতে লাগিলাম, তাহাদের বাড়ি ঘর দুয়ার রাস্তা নগর সমস্তই দেখিতে লাগিলাম। ইহাদের নগরটি প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির পাশে; অর্দ্ধেকমাটির উপরে অর্দ্ধেক মাটির ভিতরে। ইহাদের রাস্তাগুলি মাটিতে সুড়ঙ্গ করা, ঘরগুলিও মাটি খুদিয়া তৈয়ার করা।" মাটির উপরের অংশটি পিঁপড়েদের খুব পরিশ্রমের পরিচয় দেয়। মাটি দিয়া কেমন ছাত তৈয়ার করিয়াছে, ছোট ছোট খড় কুটা ও মাটি দিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ছোট ছোট ঘর করিয়াছে, সেগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই পরিস্কার।

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "আমাদের এ নগর অতি প্রাচীন। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য যে কবে আরম্ভ হয় তাহা ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহই বলিতে পারে না ইহা কত দিনকার। তবে আমাদের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপারের নির্দ্দেশ আছে। আমাদের দেশে কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে আমরা যুদ্ধে কত বন্দী আনিয়াছি। সন্ধি বিগ্রহ যে কত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। আমার মনে আছে এবং এই কথা আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, একদিন আবাল বৃদ্ধ সকলেই মহাভীত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই যে, আমাদের দেশে ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত ঘর বাড়ি ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল, কত লোক চাপা পড়িয়া মরিল, আমাদের শিশু সন্তান কত হারাইল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহসী ছিলেন তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখেন যে পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড অসুর, লম্বায় দশ বার হাজার হাত, চওড়ায় দু-তিন হাজার হাত, দুটা হাত ও দুটা পা, আসিয়া অমাদের নগরের অর্দ্ধেক উপড়াইয়া লইয়া গেল, তাহারই জন্য এত কাণ্ড হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিক হইল যে সেই শত্রুটা মানুষ বলিয়া যে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসুর আছে তাহারই একটা। ইহারা আমাদের শাবক চুরি করিতে আইসে, ইহারা শালিক-ময়না-বুলবুলি পোষে; তাহাদিগকে সেইগুলি খাইতে দেয়। আর মাছ ধরিবার সময়ে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা ধরিয়া তাহা দিয়া টোপ তৈয়ার করে। এই নিষ্ঠুর পাষণ্ডদের কিছুমাত্র মায়া দয়া নাই, আবার এই অসুরেরা সকলের প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া যাক করিয়া বেড়ায়। কেউত আর বলবার নাই, গায়ে জোর বেশি, যা খুশি তাই করে। কিন্তু ভাই, আমরা দলে বেশি, আমরাও সময়ে সময়ে তাদের বড় জব্দ করিয়া থাকি।" আমি বলিলাম "ওদের জবরদস্তির কথা আর

বলিও না। আমরা ফড়িং আমাদেরও ঐ রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, আর তাদের পোষা পাখিদের খাইতে দেয়। আমার ভাই, একদল মাসতুত ভাই আছে, তাদের কাছে তাহারা বড় জব্দ থাকেন, তখন ইহাদের সব বীরত্ব ও চালাকি বাহির হইয়া যায়। আমার মাসতুত ভাইরা পঙ্গপাল, তাহারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ওদের দেশে শস্য ক্ষেত্রে পড়ে, সেই বার ভায়ারা না খাইয়া মরেন, তাহাদের গায় পড়িলে ছটপট করিয়া মরেন, তখন আর ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস হয় না, তাদের গরু বাছুর ঘোড়া সবই পঙ্গপালের জ্বালায় ছট ফটিয়ে মরে।''

এই রকম কথাবার্ত্তার পর আমি কতকগুলি নূতন নূতন পোকার বাড়ি দেখিতে পাইলাম। এক রকম শুঁয়োপোকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম একি ভাই। পিঁপড়ে বলিল ''ওরা অনেক এখানে আছে। আমরা ওদের কিছু বলি না, আমাদের বাপ দাদারাও কিছু বলিতেন না, তাঁহারা আরও যত্ন করিতেন। আমাদের ছোট ছোট শিশুরা খোসা বদলায় ইহারা সেইগুলি খায়। আমাদের অন্যান্য যত ময়লা আবর্জ্জনা থাকে ইহারা তাহা খাইযা পরিষ্কার কবিয়া দেয়। ইহারা আমাদের বড় উপকার করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের উপকারে আসে। ইহারা না থাকিলে আমাদের বড় কষ্ট হইত। সেই জন্য আমরা ইহাদের ঘর বাড়ি দিয়াছি ও যত্ন করিয়া থাকি।''

তারপর একটা ছোট হল্‌দে রঙ্গের গুবরে পোকার মত একটা পোকা দেখিয়া বলিলাম ''একি ভাই!'' পিঁপড়া বলিল ''ওদের আমরা পুষিয়াছি। ওরা আমাদের গরু। ওরা দুধ দেয়। ওরা কেমন মধুর মত একরকম রস বের করে তা খাইতে বড়ই উপাদেয়। আমরা ইহাদের বড় যত্ন করি ও ভাল ভাল খাবার দি। আমাদের গোয়াল ঘরে আর এক রকমের গরু আছে, চল দেখ্‌বে চল।'' গিয়া দেখি ছিম্ গাছে বেগুন গাছে ও অন্যান্য গাছে যে ছোট ছোট উকুনের মত পোকা থাকে—তাই অনেক আছে।

পিঁপড়ে বলিল, ''আমরা যখনই ইহাদের গাছের উপর দেখিতে পাই তখনই শুঁড় দিয়া ইহাদের ল্যাজের উপর সুড় সুড়ি দি আর অমনি ওরা কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া এক রকম রস বাহির করে, আমরা তাহা পান করিতে বড়ই ভালবাসি। তাই আমাদের ছেলেরা, ইহারা পোষ মানে কি না তাই পরীক্ষা করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়া ছিল, এখন ইহারা বেশ পোষ মানিয়াছে এবং আমাদের ইচ্ছামত সুড় সুড়ি দিলেই সেই রস নির্গত করিয়া দেয়। ইহাদের ধরিয়া আনিয়াছি, এখানে আসিয়া ইহারা কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট নহে, কারণ আমরা ইহাদের সহিত কোন অসদব্যবহার করি না। তবে ইহাদের পোষা কিছু কষ্টকর, ইহারা গাছের রস ভিন্ন আর কিছুই খায় না, আমাদের এদেশে গাছ নাই তবে আমরা গাছ রোপণের চেষ্টায় আছি।''

পিঁপড়ের গোয়াল ঘরে এইরকমের সব গরু দেখিলাম।

৪

পিঁপড়েদের গোয়াল ঘর দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর আহারাদি করিয়া দুজনায় বাহির হইয়া গ্রাম দেখিতে গেলাম। বন, জঙ্গল, মাঠ, ঘাট সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, গাছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত পাখীরা সুমিষ্ট গান করিতেছিল। এরূপ নানা বস্তু দেখিতে শুনিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। পাঁচ হাত গাছের পঁচিশ হাত ছায়া হইতে লাগিল। সূর্য্য ডুবু ডুবু হয়। তখন আমরা বাড়ি ফিরিতে লাগিলাম। আসিবার সময়ে পথিমধ্যে একস্থানে ফোয়ারার মত ধুলি জোরে উপরদিকে উঠিতেছে দেখিলাম। কেন এরূপ হইতেছে, কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না; বড় আশ্চর্য্য হইলাম। আমি আমার বন্ধু পিঁপড়ের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাঁহার মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ে জড় সড় হইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি ভাই'। সে বলিল ''ভাই এখানে আমাদের অনেক শত্রু আছে। আমার প্রাণে বাঁচা বড় দুষ্কর। ঐ যে ধূলা উঠিতেছে ও কি জান যে বাঘে ধূলা উঠাইতেছে। বাঘ কি বুঝিতে পারিলে না। ওরা একরকম পোকা, পিঁপড়ে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খাইতে ভালবাসে। ওরা মাটিতে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, আমরা ফাঁদে পড়িলেই আমাদের ধরিয়া খায়। ওরা, বড় মজার ফাঁদ পাতে। প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে বড় একটা গোল দাগ দেয়। ওরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না, কেবল পিছন দিকে হাঁটে। সেই দাগের ভিতরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে থাকে। মাটি গর্ত্তের বাহিরে ফেলিবার সময়ে ধূলার ভিতর মাথাটি গুজিয়া দেয়, তার পরে জোরে মাথাটা সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দেয়, অমনি মাথার উপরের ধূলিগুলি দূরে গিয়া পড়ে। এরকম করিতেছিল বলিয়া ঐ ধুলি উঠিতেছিল। যে গর্ত্তটি খোঁড়ে সেটা দেখিতে ঠিক তেল ঢালিবার ফানেলের মত। মুখটি খুব চৌড়া, তার পর শেষভাগটা ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। গর্ত্তের চারিপাশে এমনি ভাবে আল্‌গা করিয়া ধুলি রাখিয়া দেয় যে, তার কাছে গেলেই গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে হয়। গর্ত্তের ভিতর ধুলা ঢাকা দিয়া কর্ত্তা বসিয়া থাকেন কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, ছোট কোন পোকা গর্ত্তের নিকট গেলেই, এমনি জোরে ভিতর হইতে ধূলা ছুড়িযা মারে যে, সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। তখনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া খায়। খাওয়া হইয়া গেলে খোসাটা ঐ রকম করিয়া ছুড়িয়া বাহির ফেলিয়া দেয় ও নূতন শীকারের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গর্ত্তটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পোকাগুলি বড় ছোট, তোমার মাথার মত বড় হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ এত বড় গর্ত্ত এক ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ার করিয়া শিকার ধরিবার আশায় বসিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং মেটে, মাথা আর গলা সমস্ত শরীরের পরিমাণে খুব ছোট। মুখের সম্মুখে খুব শক্ত ছোট দু'খানি কাস্তের মত শুঁড় বা দাঁত আছে তাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া খায়। ইহাদের চলন

বড় মজার, মাটিতে কেমন গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া থাকে, এক এক হেঁচকা মারে আর অনেক পিছনে গিয়া পড়ে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে থাকে, সম্মুখে যাইতে পারে না, আর আমাদের মত ক্রমাগত পা দিয়া হাঁটিতে পারে না। এই জন্য শিকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিতে পারে না। কাজেই ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ইহাদের অনেকদিন থাকিতে হয় না; কিছুদিন পরে একটা গুটি করিয়া কিছুকাল তাহার ভিতর থাকিবে তার পর ফড়িং-এর মত হইয়া উঠিয়া যাইবে। এখনকার অবস্থা বড় কষ্টজনক। তবে যদি ভবিষ্যতে সুখের জীবনের আশা না থাকিত, তবে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা কি দায়ের হইত।"

"এখানে ইহাদের অনেক গর্ত্ত আছে তাই আমার ভয় হইতেছে।" আমি বলিলাম "ভয় কি আমার হাত ধরিয়া চল, আমি থাকিতে কোন ভয় নাই।" আমরা সাবধানে চলিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। পিঁপড়েদের বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময়ে. তাদের প্রহরীরা আমার দিকে কট্ মট করিয়া তাকাইতে লাগিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। কলিকাতার বাবুদের বাড়িতে যেমন গ্যাসের আলোকে ঘর আলোকিত হয়, অন্যান্য লোকের ঘর যেমন কেরোসিন ল্যাম্পে বা প্রদীপে আলোকিত হয়, ইহাদের সে সব কিছু নাই অথচ ইহাদের ঘরগুলি সব আলোকময়। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ আলো কোথা হইতে আসিল, সে হাঁসিয়া বলিল, "সেওলার মত ছোট ছোট একরকম ব্যাং-এর ছাতার গাছ আছে রাত্রে খুব চক্‌চক করে, এ তারি আলো। আমরা ঘর আলোর জন্য এগুলিকে এখানে রোপণ করিয়াছি। কেন তুমি এরকম গাছ দেখ নাই? তোমরা কখন মাঠে ঘাটে বেড়াও না, তা জানিবে কি করিয়া। না দেখিলে শুনিলে কি কিছু জানা যায়। আমরা কত দেশ বেড়াইয়াছি, কত দেখিয়াছি, তাই কত শিখিয়াছি।" তার পর সে আমাকে কিছু খাবার দিয়া একটা ঘর দেখাইয়া দিল আর বলিল "এইখানে রাত্রে ঘুমাইও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক পরে আমি ঘরের দোর বন্ধ করিয়া শুইয়া আছি এমন সময়ে কে আমার দোরে আসিয়া "এ ঘরে কে" বলিয়া ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি বলিলাম "তুমি কে? কি চাও।" সে রাগিয়া বলিল "তুমি কে? ভাল চাও ত শীঘ্র দোর খোল।" আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলিয়া দিলাম আর বলিলাম "আমি তোমাদের বন্ধু. তোমাদেরই একজন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছেন," তখন সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি গিয়া শুইলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। কত দুর্ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসিল। ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন পুকুরের উপর এক ভেলা রহিয়াছে। হঠাৎ ভেলার পাশে এক প্রকাণ্ড মাথা হুস্ করিয়া উঠিল। তার চোখ দুটি কট্ মট্ করিয়া অমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, যেন দুটা আগুন জ্বলিতেছে। বড় ভয় হইল, পলাইবার জন্য মুখ ফিরাইলাম। সে দিকেও ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড মাথা, ঐ রকম দুটা চোখ জ্বলছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বিকটাকার মূর্ত্তি সব জল হইতে উঠিয়া

আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, সকলেরই চক্ষু আমার দিকে। সে সময়ে দেখি আমার পিঁপড়ে বন্ধু বলিতেছে "ঐ দেখ ভেলায় একটা ছিদ্র আছে, আইস ইহার ভিতর দিয়া জলে ডুব দি, আর উহারা ধরিতে পারিবে না।" ইতিমধ্যে শত শত বিকট মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গেল—নীচে নীচে আরও নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্বের সেই মাকড়সা আসিয়া বলিতে লাগিল "কেমন বেশ হয়েছে। আমি আগেই ত সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, বারণ করিয়াছিলাম পিঁপড়েদের ওখানে যাইও না।" তার পর দেখি যে এক ক্ষুদ্র কারাগারে বদ্ধ আছি। অনেকগুলি পিঁপড়ে ক্রোধান্ধ হইয়া দোর ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, "উহাকে মারিয়া ফেল, খাইয়া ফেল" বলিল চীৎকার করিতে লাগিল। আমি এক কোণে জড় সড় হইয়া করজোড়ে কাতরে মাপ চাহিতে লাগিলাম, বলিলাম "দোহাই তোমাদের! আমাকে রক্ষা কর, তোমাদের নিজের লোক আমাকে আনিয়াছে। কোথায় আমার বন্ধু আমাকে রক্ষা কর।" এ সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে ঠেলিতে লাগিল আর বলিল "ওঠ, বেলা হইয়াছে।" আমি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল "ওকি কাঁপছ যে, তোমার গা দিয়া ঘাম বাহির হচ্চে যে, কি হয়েছে কি?" আমি লজ্জায় কিছু বলিলাম না। তার পর উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু আহারাদি করিলাম।*

সখা। মার্চ ১৮৮৭ পৃ. ৩৫-৩৬
এপ্রিল " পৃ. ৫২-৫৪
মে " পৃ. ৬৮-৭০
জুন " পৃ. ৮৬-৮৯

* প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকলেও আর প্রকাশিত হয়নি।

আলোক পরীক্ষা

কোন একটি জিনিস জানতে হ'লে তার বিষয় অনুসন্ধান করতে হয়, সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হয়, তার সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা করতে হয়। তুমি যদি বল গোপালবাবু খুব ভাল লোক, তার মানে এই যে, তুমি অনেক দিন গোপালবাবুর সঙ্গে মিশেছ, তাঁহাকে বেশ জান শোন, তাঁর কাজ কর্ম্ম ব্যবহার দেখেছ, তাঁকে পরীক্ষা করেছ, তবে বুঝছে তিনি খুব ভাল। এইরূপ সতীশ ছেলেটা কেমন জানতে হলে তার সঙ্গে মিশে তার কাজ কর্ম্ম ব্যবহার দেখা চাই, তাকে পবীক্ষা করা চাই তবে সে ভাল কি মন্দ, বোকা কি বুদ্ধিমান জানা যাবে। আম না চেখে দেখলে ভাল কি মন্দ টের পাওয়া যায় না। পরীক্ষাই প্রায় সকল জ্ঞানের মূল। পরীক্ষা ভাল করিয়া করিতে পারিলেই সকলেরই গুণ টের পাওয়া যায় কেহই ফাঁকি দিয়া বড় রেহাই পাইতে পারেন না।

যারা অন্ধ তাদের কি কষ্ট। তাদের জীবনের অর্দ্ধেক সুখ অর্দ্ধেক আনন্দ চলে যায়। আমাদের চোখ আছে তাই বাহিরের কত সুন্দর সুন্দর শোভা দেখে কতই সুখ অনুভব করি। কিন্তু এই চোখ থেকেও আমরা অন্ধ হইতাম যদি আলো না থাকিত। অন্ধকারে চোখ থাক্‌লেই বা কি আর না থাক্‌লেই বা কি, সবই সমান, যদি আলো না থাকে।

আলো যখন এমন জিনিস, যা না থাক্‌লে চলে না, তার বিষয় কি কিছু জানা উচিত নয়?

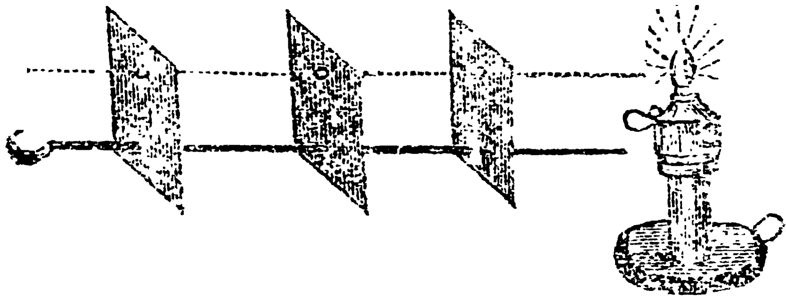
আলোর বিষয় অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে আমরা এই টের পাই যে, কতকগুলি বস্তু আলোককে বড় সম্মান ক'রে চলে, তাদের সামনে এলেই অমনি তারা যাবার পথ ছেড়ে দেয়, আলো তাদের ভিতর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলে যায়। আবার অনেক ভায়া আছেন তাঁরা বড় একটা কেয়ার করেন না, আলো যদি সামনে এসে পড়ে তবে তাঁরা যেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান, পথ ছেড়ে দেন না; বেচারা আলো সেইখানে থেকে যান, না হয় আবার ফিরে আসেন। কাচ, জল, বাতাস এরা প্রথম শ্রেণির মধ্যে; আর ইঁট, পাথর, কাঠ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণির। প্রদীপের সম্মুখে কাচ ধরিলে তার ভিতর দিয়া আলো আসে। তাই দেখ কাচের সেজ, কাচের চিম্‌নি, কাচের লণ্ঠন। জলের ভিতর দিয়া জলের তলায় কি আছে টের পাই। বাতাসের ত কথাই নাই। আমরা যখনই যা দেখি, সব বাতাসের ভিতর দিয়া। আবার দেয়ালের আড়ালে প্রদীপ

রাখ দেয়াল ভেদ করিয়া আলো আসিবে না। ধামা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে প্রদীপ আর দেখা যায় না। চোখের সামনে তোমার স্লেটখানি ধর স্লেটের ওপাশে সম্মুখের বস্তু কিছু দেখিতে পাইবে না; অর্থাৎ ইহারা আলোর পথ ছাড়িয়া দিল না। প্রথমগুলিকে স্বচ্ছ বলে, দ্বিতীয়গুলি অস্বচ্ছ।

আলোর প্রথমগুণ এই জানা যায় যে আলো সোজা পথে চলে। কোনও বাধা না পড়িলে কখনও বাঁকা পথে যায় না। ইহার প্রমাণ কি? পরীক্ষা কর।

(ক) সোজা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায়, বেঁকা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায় না। কাগজের সোজা একটি চোঙ্গার ভিতর দিয়া যদি দেখ তবে চোঙ্গার ওপাশে যা আছে তা দেখতে পাবে। যদি চোঙ্গ মাঝা মাঝি বেঁকাও তবে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

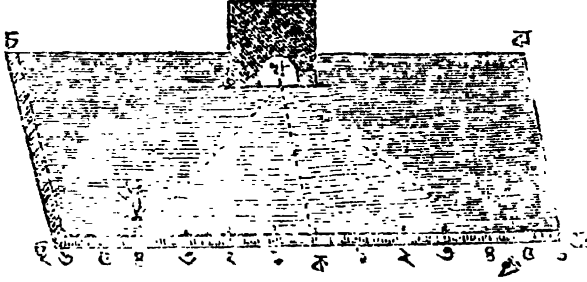
(খ) প্রদীপ ও চোখের মাঝে একখানি বই ধর প্রদীপটি দেখিতে পাইবে না। বই-এর পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তোমার চক্ষে আলো পড়িল না।



(গ) একটি ঝাঁটার কাটীতে বা সোজা একটী লৌহ সলাকায় তিনখানি তাস বা ব্যবহৃত পোস্টকার্ড ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া বিদ্ধ কর। আর একটি সলাকা এধার ওধার ফুঁড়িয়া তাস তিনটির উপরে এক একটি করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র তিনটীই এক সরল রেখায় হইবে। শেষের তাসের ছিদ্রের নিকট যদি একটী প্রদীপ রাখা যায় তবে সম্মুখের তাসের ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে প্রদীপ দেখা যাইবে। কিন্তু কোন একখানি তাসকে ডান কিম্বা বাম দিকে ঈষৎ হেলাইয়া সরল রেখা হইতে বিচ্যুত করিলে আর ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইবে না।

আলো সরল পথে যায় বলিয়া পদার্থের ছায়া পড়ে। বন্দুক বা তীর ছুঁড়িবার সময়ে লক্ষ্য বা নিশানা করিতে পারা যায়। এই গুণ থাকাতেই নাবিকেরা জাহাজ চালাইতে সক্ষম হয়। এই গুণ থাকাতেই জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই গুণ থাকাতে একটী বড় মজা হয় দেখ্‌বে। যে ঘরের একটী দিক্ বেশ খোলা সেই ঘরের

সমস্ত দরজা বন্ধ করে অন্ধকার হলে সেই খোলাদিগের দরজা বা জানালার কাছে গিয়া দেখ তাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, থাকেত ভালই, যদি না থাকে ত একটি ছিদ্র করে নাও। সেই ছিদ্রের কাছে যদি একখানি সাদা কাগজ ধর দেখবে যে সেই কাগজের উপর বাহিরের বস্তুর কেমন সুন্দর একটী উল্টা ছবি পড়িয়াছে। কাগজখানি যত সরাইবে ছবিটী তত বড় হইবে। হয়ত দেখিবে দেয়ালে একটী বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে। ছোট ছোট কাগজের বাক্সের পাশে একটি করিয়া যদি ছিদ্র করিয়া লও, তবে নানা জিনিসের ছবি সেই বাক্সের ভিতর দেখিতে পাবে। একটী দেশালাইয়ের বাক্সের খোলটীর উপরে যেদিকে লেখা থাকে সেই দিকের মাঝখান একটী ছিদ্র করিয়া যদি লও আর কোন বাড়ী ঘর কি গাছ পালার দিকে যদি সেই ছিদ্রটী ফিরাও তবে পাশ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে অপর দিকে কেমন ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর উল্টা ছবি পড়িয়াছে।



আলোর দ্বিতীয় গুণ এই টের পাবে যে, যখনই কোন মসৃণ পালিশ করা জিনিসের উপর আলো পড়ে তখনই সেখান হইতে ফিরিয়া যায়। নদী বা পুকুরের পারে দাঁড়াইলে জলে ওপারের গাছপালার ছায়া পড়েছে দেখ্‌তে পাবে। একখানি আর্শির সামনে যদি একটা প্রদীপ বা তোমার মুখখানি ধর তবে আর্শিতে প্রদীপের বা তোমার মুখের ছবি দেখিতে পাবে। গাছপালা থেকে যে আলো, কিম্বা প্রদীপ বা তোমার মুখ থেকে যে আলো জল বা আর্শীর উপর প'ড়ে ছিল সেগুলি চলে যাবার পথে বাধা পেয়ে সেখান থেকে তোমার দিকে ফিরে এসে তোমার চোখে পড়ল তাই তুমি জল ও আর্শির ভিতর ছবি দেখিতে পেলে। এই ফিরে আসারও একটী নিয়ম আছে। সেটি এই ঃ— আর্শির (বা যে কোন পালিশ করা জিনিস হউক) উপর আলো যত হেলে পড়ে সেই পড়িবার স্থান হইতে বিপরীত দিকে ফিরে যাবার সময়ে আর্শির দিকে ততটা হেলে যায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিক কথায় বলে "পতন কোন পরাবর্ত্তন কোনের সঙ্গে সমান হয়"। এটী সহজে পরীক্ষা করা যায়। বাজারে যে একপয়সা বা দুই পয়সা করে ছোট ছোট আর্শি পাওয়া যায় তাহারই একখানি আর্শি চছজঝ পুরু কার্ডবোর্ডের ঠিক মাঝখানে ছুরি দিয়া একটু চিরিয়া তাহার ভিতর বসাইয়া দাও। আর্শিখানির মাঝখানে (খ) একটু ফাঁক রাখিয়া আর সব একটুক্‌রা কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও।

ছজ-র ঠিক মাঝখানে (ক) একটি দাগ দাও। ক হইতে খ পর্য্যন্ত একটি সরলরেখা টান। রেখাটি যেন আর্শির উপর না হেলে থাকে, যেন সোজা হয়ে থাকে অর্থাৎ জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে তাই যেন হয়। ছক ও জক কে কয়েকটি সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দাগ দাও। ছক-র এক এক ভাগ যেন জক-র এক এক ভাগের সমান হয়। এখন দেখ যে ছক-র কোন একভাগ যথা ৪ চিহ্নের উপর যদি একটি ছোট বাতি বা অন্য কোন ক্ষুদ্র বস্তু রাখ তবে জক-র দিগের ৪ চিহ্নের নিকট চোখ রাখিয়া যদি খ-র দিকে তাকাও তবে আর্শির ভিতর তার ছবি দেখতে পাবে। কিন্তু চোখ যদি ২-এর কাছে বা ৬-এর কাছে আন তবে আর সে ছবি দেখ্‌তে পাবে না। আর ৪-এর কাছে যদি চোখ থাকে তবে বাতিটি যদি ৫, ৬, ৩ বা ১-এর কাছে আন, আর তার ছবি দেখতে পাবে না। এ ধারে যে চিহ্নের কাছে বাতি রাখিবে ওধারে ঠিক সেই চিহ্নের কাছে চোখ না লইয়া গেলে ছবি দেখা যাইবে না। তাহার কারণ কি বুঝিলে; এ ধারের ১, ৩ বা ৬ যে চিহ্ন হ'তে খ পর্য্যন্ত একটা সরলরেখা টানা যায় সে রেখাটি আর্শির উপর বা কখ-র সহিত যতটা হেলে বা ঝুঁকে থাকে ও ধারে খ হ'তে ১, ৩ বা ৬ চিহ্ন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা টানিলে সে রেখাটিও আর্শির উপর বা কখ-র সহিত ওধারে ততটাই হেলে বা ঝুঁকে থাক্‌বে। অন্য কোন রেখা তা হবে না। সেই জন্য অন্য চিহ্ন হ'তে দেখা যায় না।

আবার জিনিসটি আর্শির সামনে যত দূরে থাকে তার ছবিটি আর্শির পিছনে ঠিক তত্‌দূরে দেখায়।

দু-খানি আর্শি যদি সামনা সামনি কাত করিয়া লাগাইয়া রাখা যায়, আর তার মধ্যে যদি কোন জিনিস ধরা যায় তার অনেকগুলি ছবি পড়ে। যদি একটার উপর আর একটা ঠিক দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, তবে তিনটি ছবি পড়ে। আরও বেশি কাত করিলে আরও অধিক ছবি পড়ে। ইহার কারণ এই যে দু-খানি আর্শিতে ত দুটি ছবি পড়িবেই; তা ছাড়া ছবির ছবি তার ছবি এই দুইখানি আর্শিতে ক্রমাগত প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। বাজারে এক রকম খেলনা পাওয়া যায়, একটী কাগজের চোঙ্গার ভিতর দিয়া দেখিতে হয় আর চোঙ্গাটি ঘুরাইতে হয়, ইহাকে অনেক রকমরঙ করা ছক্‌কাটা ফুল দেখিতে পাওয়া যায়।

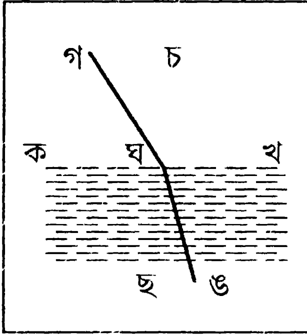
এই চোঙ্গার ভিতর তিনখানি লম্বা কাঁচের টুকরা পরস্পর কাত করিয়া বসান থাকে। চোঙ্গার তলাটা গোল কাঁচ দিয়া বন্ধ করা, তার ভিতর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রং করা কাচের টুকরা দেওয়া থাকে, সেইগুলি ঐ তিনখানি কাঁচ হইতে বারেবারে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া নানারকম ছক্ কাটা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

দর্পন যদি চেপটা না হইয়া গোল কিম্বা চোঙ্গার মত হয় তবে ছবিগুলি বড় মজার বিকৃত হইয়া পড়ে। শিশি বোতল বা চক্‌চকে কাঁসার গেলাসে বা ঝক্‌ঝকে ঘটি বা কলসির উপর তোমার মুখের ছবি দেখ। কেমন বিকৃত দেখাবে।

সখা। মে ১৮৮৮ । পৃ: ৬৭-৭০

আলোক-বিজ্ঞান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তোমরাও বেশ জান যে, জল, কাচ, অভ্র প্রভৃতি অনেকগুলি জিনিস আছে যার ভিতর দিয়া সব দেখা যায়। অর্থাৎ তাদের ভিতর দিয়া আলো সহজে গমনাগমন করিতে পারে। ইহারা স্বচ্ছ পদার্থ। আমরা বলিয়াছিলাম আলোর পথে বাধা পড়িলেই আলো অন্য পথে যায়। অনচ্ছ পদার্থ আলোর পথে যেমন বাধা দেয় স্বচ্ছ পদার্থ ততদূর না হউক কিয়ৎ পরিমাণে বাধা দেয়। কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর যখন আলোকরশ্মি ঠিক সোজা বা খাড়া হ'য়ে (জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে) না পড়ে যদি হেলে বা কাৎ হয়ে এসে পড়ে, তবে যে দিকে যাইতেছিল ঠিক সেই দিকে না গিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া সরিয়া অন্যদিকে যায়। ইহাকে আলোর গতির দিক্ পরিবর্তন বা বক্র-গতি বলে। যখন একই পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক গমন করে তখন সরল পথে যায়। কিন্তু যখন এক পদার্থের ভিতর হইতে অন্য প্রকার পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে যায় তখনই অন্য দিকে বাঁকিয়া যায়।

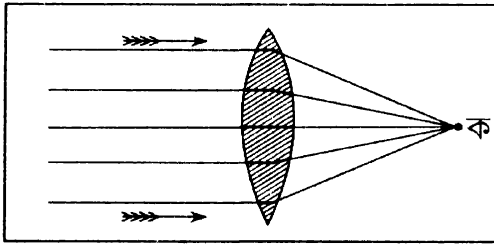


উপরের চিত্র দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। ক ঘ খ জলের উপরিভাগ; গ ঘ আলোক রশ্মি বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতর যাইতেছে। ঘ-র নিকট আসিয়া যে দিকে যাইতেছিল সেদিকে যাইতে না পারিয়া ঘ ড-র দিকে বাঁকিয়া গেল। ঠিক যেন বোধ হইতেছে গ ড-ঘর নিকট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গ-র নিকট হইতে আলো আসিয়া ঘ-এ পড়িলে যেমন ড-র দিকে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ চছ লম্বর দিকে আসে, কম কাত্ হয় বা খাড়া হইতে চেষ্টা করে সেইরূপ ঙ-র দিক হইতে আলো আসিয়া যদি ঘ-এ পড়ে তবে তাহা গ-র দিকে বাঁকিয়া যাইবে অর্থাৎ চ ছ লম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায় বা অধিকতর হেলিয়া পড়ে। এখন এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, জলের ভিতর হইতে বাতাসের ভিতর বা এক পদার্থের ভিতর বা এক পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা কম ঘন কোন পদার্থের ভিতরে যাইবার সময়ে অধিকতর কাত হইয়া যায়। আর বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতরে বা এক

পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা অধিকতর ঘন কোন পদার্থের ভিতর যাইবার সময়ে কম কাত হইয়া যায়। (কিন্তু তার্পিণ তেলের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তার্পিণ তৈল অপেক্ষা জল যদিও বেশি ঘন তথাপি জলের ভিতর হইতে তার্পিণ তেলের ভিতর আলো গমন কালে কম কাত্ হইয়া যায়)। সকল স্বচ্ছ পদার্থে আলোক সমান বাঁকে না। জলে যতটা বাঁকে কাঁচে তদপেক্ষা অধিক বাঁকে, হীরকে আরও অধিক বাঁকে, তেলে কম বাঁকে। এই গুণে কাচ ও হীরক বিলক্ষণ প্রভেদ করা যায়। কিন্তু একই পদার্থে বাঁকের পরিমাণ সমান থাকে।

এই আলোকের গতির-দিক পরিবর্তন অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। (১) একটা বড় বাটি লও; প্রদীপের নিকট এমন ভাবে বাটিটি রাখ যেন বাটির পার্শ্বের ছায়া বাটির ভিতরে তলায় ঠিক মাঝখানে পড়ে; এখন সেই বাটি জল পূর্ণ কর। দেখিবে পূর্ব্বে যেখানে ছায়া পড়িয়া ছিল এখন সেখানে নাই, পার্শ্বের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। (২) একটা বড় কাঁসার বা পাথরের বাটিতে একটা পয়সা বা সিকি রাখিয়া দাও। বাটিটি সরাইয়া সম্মুখে এমন স্থানে রাখ যেন পয়সা বা সিকিটি ঠিক বাটির কাঁনার আড়ালে পড়ে। এখন কাহাকেও বাটিতে জল পূরিতে বল। জলে বাটিপূর্ণ হইলে দেখিবে যে বাটির তলদেশ অনেক উপরে উঠিয়াছে এবং পয়সা বা সিকি দেখা যাইতেছে। (৩) জলের ভিতর যদি এক গাছা লাঠি ডুবাইয়া ধর দেখিতে পাইবে, বোধ হইতেছে যেন নিমগ্ন অংশটি জলের উপরিভাগ হইতে ভাঙ্গি য়া গিয়াছে আর ভাঙ্গা দিক্‌টা উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে।



এই বক্রগতির জন্য আমরা অনেক সময়ে ভুল দেখি। পুষ্করিণী ও নদী যতটা গভীর আমরা তদপেক্ষা কম গভীর দেখি। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র বাস্তবিক যেখানে থাকে (ঠিক মাথার উপর ছাড়া) ঠিক সেখানে দেখি না। চন্দ্র সূর্য্য বাস্তবিক অস্ত যাওয়ার পরও আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। আবার বাস্তবিক উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেও আমরা সূর্য্যোদয় দেখি। আমরা যখন জানালা বা দরজার কাচের ভিতর ভিতর দিয়া দেখি তখন বোধ হয় দূরের জিনিসগুলি ঠিক স্থানেই দেখিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। যাহারা চসমা চোখে দেয় তাহারা কোন বস্তু স্বস্থানে দেখে না।

তোমাদের একটা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আলোক রশ্মি অধিকতর ঘন পদার্থ হইতে কম ঘন পদার্থের ভিতরে আসিবার সময়ে যদি বড় বেশি কাত্ হইয়া আসে

তবে আর কম ঘন পদার্থে প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ঘন পদার্থের শেষ ভাগে আসিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায় অর্থাৎ সেই রশ্মি পরাবর্তিত হয়। এ বিষয় বারান্তরে বলিব।

পয়সার মত গোল এক খণ্ড কাঁচ যদি চেপ্‌টা না হইয়া কচুরীর মত হয় তবে তার ভিতর দিয়া যখন আলো যায় তখন অনেক মজার মজার ঘটনা হয়। এই রকম কাচকে তোমরা বোধ হয় আতুসী কাচ বলিয়া থাক। এই কাচ সহজেই পাইতে পার। এইরূপ একখানি কাচ যদি কোথাও খুজিয়া না পাও তবে বুড়োদের (পণ্ডিত মহাশয়ের বা গুরুমহাশয়ের বা ঠাকুরদাদার) চসমা জোড়া চাহিয়া লইবে। এই চসমার একটা কাচ যদি সূর্য্যের দিকে ধর, আর তার নীচে একটু দূরে যদি একখণ্ড কাগজ ধর, তবে দেখিবে সেই কাগজে ছোট গোল আলো পড়িয়াছে। কাগজ খানি যদি কাচের নিকট হইতে ক্রমে ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক, এমন এক স্থান আসিবে যেখানে গোল আলোটি খুব উজ্জ্বল এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। সেই আলোক-বিন্দু যদি কাগজের উপর কিয়ৎকাল ধর তবে কাগজের সেই স্থান পুড়িয়া যাইবে। ঐ বিন্দুতে যদি হাত দাও তবে আগুনের মত গরম লাগিবে। এইরকম কাচে টীকে ধরান যায়।

উপরের চিত্র দেখ, একখানি চারিপাশ সরু মাঝখানটা মোটা একটা কাচ সূর্য্যের কিরণে ধরা হইয়াছে। কাচের উপর যত কিরণ পড়িয়াছে সব বাঁকিয়া গিয়া এক বিন্দুতে জড় হইয়াছে। এই বিন্দুকে অধিশ্রয়ণ বিন্দু বা কিরণ-সমাহার বিন্দু বলে। রাত্রে দেয়ালের নিকট যদি এই কাচ ধর তবে দেয়ালে সম্মুখের প্রদীপের একটি সুন্দর উল্টা ছবি পড়িবে আবার কাচ খানি প্রদীপের খুব কাছে আনিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক দেখিবে সম্মুখের দেয়ালে একটা খুব বড় উল্টা প্রদীপের ছবি পড়িয়াছে। দেখ ওরকম কাচ যদি নিতান্তই না পাও তবে একটা গোল কাচের বোতল লইয়া জলপূর্ণ কর তাহা হইলেও এই সব পরীক্ষা করিতে পারিবে। অপর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ কেমন একটা গোল বোতলে জল পুরিয়া প্রদীপের কাছে ধরা হইয়াছে আর দেয়ালে কেমন বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে।

কোন ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে একটা দরজা বা জানালার যদি ছোট একটা ছিদ্র করিয়া লও আর সেই ছিদ্রে যদি ঐ রকম একখানি চশমার কাচ কোন রকমে বসাইয়া দাও, আর ঘরের ভিতর কাচের সামনে যদি একখানি কাগজ ধর তবে বাহিরের সমুদয় বস্তুর কেমন যথাযথ ছবি পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে। ছবিগুলি কিন্তু উল্টা হইয়া পড়িবে। দিনের বেলায় যদি ঘরের বারান্দায় কিম্বা ঘরের ভিতরেই দরজা বা জানালার নিকট আসিয়া একখানি সাদা কাগজের নিকট যদি বুড়োদের চসমা ধর তবে সম্মুখে দূরের সকল বস্তুরই ছোট উল্টা ছবি কাগজখানির উপর পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে।

ঐ রকম একখানি কাঁচ চোখের কাছে যদি ধর আর কাঁচের ওপাশে যদি তোমার

বইখানি ধর তবে বই এবং অক্ষরগুলি খুব বড় বড় দেখিতে পাইবে। একটা গোল বোতলে জল পূরিয়া বোতলের ওপাশে যদি হাত দাও তবে এপাশ হইতে হাতের আঙ্গুলগুলি খুব মোটা মোটা দেখিতে পাইবে। এইরূপ কাঁচে অণুবীক্ষণ তৈয়ার হয়। এই কাঁচের সাহায্যে ফোটোগ্রাফও তৈয়ার হয়।

সখা । জুলাই ১৮৮৮ । পৃ. ৯৯-১০২

আর্কিয়প্টেরিক্‌স্‌

আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে মামথের কথা বলিয়াছি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কত অদ্ভুত জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত তাহাদের অস্থি কঙ্কালে টের পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব জন্তু পৃথিবীতে বাস করিত। এখন কেবল তাহাদের চিহ্নাবশিষ্ট রহিয়াছে। ভারতবর্ষেই নর্ম্মদাতীরে এত প্রকাণ্ড এক হস্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছে যে অত বড় জীব পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল কিনা আজও বলা যায় না।



তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এখন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আমরা যত জাতের জীব দেখিতে পাই সেই সব গুলিই যে এইরূপ হইয়াই সৃজিত হইয়াছে এবং বরাবরই এইরূপ থাকে তাহা নহে। এক জাতীয় জীব কালক্রমে বংশ পরম্পরায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ও পরবংশীয়দের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং তখন ইহারা যে এক জাতীয় তাহা আর বলা যায় না। এইরূপে এক জাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়।

পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ সরীসৃপ। পাখিরা টিকটিকি গিরগিটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে টিকটিকির ডিম ফুটিয়া একটা পাখী বাহির

হইয়াছিল বা হইতে পারে। হঠাৎ এরূপ রূপান্তর হয় নাই; অল্পে অল্পে অদৃশ্য রূপে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। এবং এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতে কত যুগ লাগিয়াছে কে বলিতে পারে? সরীসৃপ রূপান্তরিত হইয়াই যদি পাখী হইল তবে পাখী আর সরীসৃপের মাঝামাঝি কোন এক প্রকার জীব অবশ্য জন্মিয়াছিল। সেটা কি? এবং তাহার কি কোন চিহ্ন পাওয়া যায়? এই অদ্ভুত সরীসৃপ-পক্ষীর দেহের অল্পাংশ মাত্রই ১৮৬১ খ্রিঃ অব্দে বাভেরিয়া দেশের কোন গিরি প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার প্রায় বারো বৎসর পরে বোধ হয় সেই প্রদেশেই এই জীবের একটা সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়। এই পক্ষীর একটী প্রকাণ্ড লেজ আছে। লেজে কুড়িটী গাঁইট আছে এবং প্রত্যেক গাঁইটের দুই ধার হইতে দুইটী পালক বাহির হইয়াছে। পা দু'খানি ঠিক পাখীর পা। ডানা দু'খানিতে যে দুইটা পা আছে, তাহা ঠিক যেন সরীসৃপের পা। কোন পাখীরই দাঁত হয় না; কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি দাঁত আছে। মস্তিষ্ক পক্ষীর ন্যায়। ডানায় পায়রার পালকের মত পালক এবং পায়ে পাখীর লোমের মত লোম আছে। শরীর সরীসৃপের ন্যায়। শরীরের আর কোন অংশে পালক নাই। শরীর টিকটিকির ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। পালকগুলি বোধহয় অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত। চক্ষু সরীসৃপের চক্ষুর ন্যায়। এই পাখী কাকের মত বড় হইবে। ইহার নাম আর্কিয়প্টেরিক্স্ রাখা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বতন জীবেরা কিরূপ ছিল, কেনই বা ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইল কে বলিতে পারে? ইহা ত বহুদিনের কথা। এক শত বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা যে দুই একটি অদ্ভুত জীব দেখিয়া তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই জীব আর আমরা দেখিতে পাই না। তাহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কত প্রকারের জীব এই পৃথিবীতে জন্মিল আর কতই লোপ পাইল। আরও কত নূতন প্রকারের জীব জন্মিবে কে বলিতে পারে?

সখা । অক্টোবর ১৮৮৮ । পৃ. ১৪৮-১৪৯

গায়ক পাখি

থ্রস

পাখিরা গান গায়। সব পাখি আবার গান গায় না। কাক গান গায় না। কোকিল গায়। কাকও ডাকে, কোকিলও ডাকে, তবে কাকের শুধুই ডাক, কোকিলের ডাক ডাক নয়, গান। যে পাখির স্বর শুনিতে ভাল লাগে তাহারাই গান করে। আমাদের দেশে অনেক পাখি আছে যেমন শ্যামা, বুলবুল, চোকগেল, বউ কথাকও প্রভৃতি, যাদের স্বর বেশ মিষ্টি অথচ এদের এত নাম নাই। আমাদের দেশে কোকিলের বড় নাম। এমন কবি



নাই যিনি কোকিল সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখেছেন। সেই সে কালের সংস্কৃত কবি হইতে এই আমাদের আধুনিক বাঙ্গালি কবি পর্য্যন্ত সকলেই কোকিলের ডাকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে আর কোন পাখির এত গুণ-গান শুনিতে পাওয়া যায় না।

আরব্য ও পারস্য কবিরা তাহাদের কবিতায় বুলবুলকে...করিয়া রাখিয়াছেন, বুলবুলের গুণ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বুলবুলের মত কোন পাখিই নাই। এমনি বুলবুলের গান।

বিলাতী কবিদের কাছে শুন "নাইটিংগেল" আর 'কুকু'। এই দুইটীই পাখিদের মধ্যে তানসান। এমন কবি নাই যিনি ইহাদের হইয়া দু কথা না বলিয়াছেন।

এবার আমরা একজাতীয় গায়ক পাখির ছবি দিলাম। ইহাদের ইংরাজিতে থ্রস বলে। ইহাদের গানও বেশ সুমিষ্ট। কবিদের পুস্তকের মধ্যে ইহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাইটিংগেল ও বুলবুল জাতীয়। দেখিতে অনেকটা ছাতারিয়া পাখির মত। এক জন ইংরাজি লেখক এই থ্রস সম্বন্ধে মনের আবেগে কটমট ইংরাজিতে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ— 'সন্ধ্যার সময়ে যখন দূরস্থ জল প্রবাহের অস্ফুট কুল কুল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, যখন সান্ধ্য সমীরণ বিকশিত কুসুমের সৌগন্ধি অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া দেয়, তখন কোন বৃক্ষশাখা বা গিরিপার্শ্ব হইতে থ্রসের সঙ্গীত রব নির্গত হইয়া বন ও গিরিগাত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অন্যান্য পাখির আরও কত চমৎকার গান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহাই যথেষ্ট। ইহার গীতধ্বনি আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, প্রাণকে কোমল করিয়া দ্রব করিয়া দেয়, মনে পবিত্র শান্তি বিস্তার করে, পৃথিবীর শান্তিকে স্বর্গের অনির্বচনীয় আনন্দের সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহার মোহিনী শক্তি মানব মনের দুঃখ-সমুদ্রের আন্দোলিত বারিকে প্রশান্ত করিয়া দেয়।" ইত্যাদি অনেক। ইহাদের গানটা কিরূপ শুন—কুই, কুই, কুই কুঈন, কুইপ্—টিউরু টিউরু, চিপ্উই—টু-টী, টু-টী, চিউ চু—চির্রি চির্রি, চুঈ—কুই, কুই, কুই।

ইহারা প্রায়ই নদী বা পুকুরের ধারে বনের মধ্যে থাকে। ফড়িং প্রভৃতি ছোট ছোট পোকা আরও সামুক গুগ্লি ইহাদের খাদ্য। সামুক মুখে লইয়া পাথর, ইঁট বা গাছের গুঁড়িতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া খায়। ছোট ছোট ফল ও শস্যাদিও ভক্ষণ করে। ইহাদের বাসার ভিতরের দিকটা কচি পাতা, ঘাস, খড় প্রভৃতি কোমল দ্রব্যের। বাইরের দিকটা গাছের শিকড় কাঠের টুকরা, দড়ি, সূতা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের গায়ের রং ধূসর অথচ একটু সবুজের আভাযুক্ত, ডানার উপর হল্দে রঙ্গের ফুট ফুট আছে। পেটের দিকটা সাদা তাতে কাল ফুট ফুট। পা একটু লাল্চে রঙ্গের।

সখা । নভেম্বর ১৮৮৮ । পৃ. ১৭১-১৭২

প্রকৃতির ছদ্মবেশ

মানুষে ছদ্মবেশ ধারণ করে। দেবতারাও ছদ্মবেশে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। বহুরূপীরা গায়ে রং লেপিয়া ছাই মাখিয়া কালী, দুর্গা ও শিব সাজে। অনেক জুয়াচোরও সাধুবেশ ধারণ করে। দেবতারা বরাহ, মৎস্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করিতেন। বলিরাজার দানশীলতার পরীক্ষার জন্য বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হনুমান রাবণের গৃহ হইতে মহাদেবের ধনুক অপহরণের জন্য গণক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিল।

মানুষ দেবতার কথা ছাড়িয়া দি। ভান করা ও ঠকান'র প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট জীবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। আবার শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, উদ্ভিদেরও এ প্রকৃতিটি আছে। শৃগালকে ফাঁদে ফেলিয়া যদি খুব প্রহার করা যায়, তবে সে মড়ার মত স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া থাকে; মনে করে মৃতের ভান করিলে মড়া ভাবিয়া কেহ তাহাকে আর প্রহার করিবে না। ভেককে প্রহার কর সে হাত পা ছড়াইয়া পেট ফুলাইয়া চিৎ হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে; একটু সরিয়া দাঁড়াও দেখিবে অমনি দশ হাত করিয়া লাফ মারিতেছে। কেন্দ্রাইকে স্পর্শ করিলেই গুঁড়ি বাঁধিয়া পয়সার মত গোল হইয়া থাকে, নড়ে চড়ে না।

এই গেল প্রকৃত জুয়াচুরির কথা। এখন আমরা অন্য প্রকার জুয়াচুরির কথা বলিব।

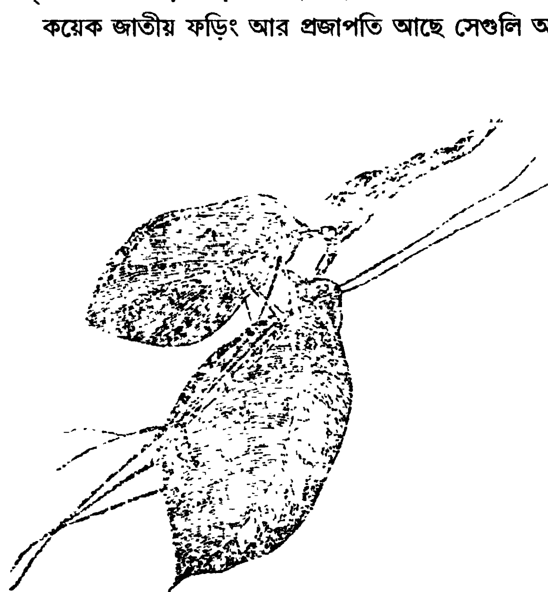
অর্কিড নামক পরগাছা ফুল তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। এই পরগাছা অন্য গাছের উপর জন্মায়। আম, কদম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছেই অধিক দেখা যায়। ইহাদের ফুলগুলি বড় সুন্দর, দেখিতে ঠিক প্রজাপতি বোলতা বা অন্যান্য সুন্দর কীটের ন্যায়। দূর হইতে কীট বলিয়া ভ্রম হয়। এই জাতীয় এক প্রকার কয়েকটি ফুল লইয়া একটি ছোট বাক্সে তুলার মধ্যে রাখিয়া কোন বিশাল উদ্ভিদবেত্তা তাঁহার কয়জন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেইগুলির সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ওরূপ সুন্দর পোকা তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। আম ও কদম গাছের ডালে যখন পাঁচ ছটা এই ফুল সরু এক ডাঁটে সার সার হইয়া ফুটিয়া বাতাসে দুলিতে থাকে তখন বোধহয় যেন একদল প্রজাপতি উড়িতেছে।

আবার অনেক প্রজাপতি এবং অনেক পোকা আছে যাহারা দেখিতে ঠিক এই সব ফুলের মত। এই এক থোপ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে যদি ঐরূপ একটা প্রজাপতি বসিয়া থাকে, তবে আব চিনিবার যো থাকে না।

এক জাতীয় ফড়িং আছে, সেগুলি খুব সরু ও লম্বা লম্বা হয়, গায়ের রং শুষ্ক

ঘাসের মত। এই ফড়িং যখন নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, তখন বোধ হয় যেন একটা শুক্‌ন ঘাস বা খড় পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েক জাতীয় ফড়িং আর প্রজাপতি আছে সেগুলি আবার দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মত। তাহারা যখন পাখা দুটি একত্র করিয়া একটা পাতার কাছে বসে, কার সাধ্য তাহাদের উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারে। এই যে ছবি দিলাম,—একটা পাতার পাশে একটা প্রজাপতি বসিয়া আছে;—দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় যেন দুটা গাছের পাতা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস্‌ সাহেব একবার দেখেন একটা ছোট গাছে একটা সুন্দর প্রজাপতি বসিয়া আছে। তাদের গায়ে হল্‌দের উপর বেগুনি রং-এর কাজ করা, দেখিতে বড় সুন্দর। তাঁহার বড় লোভ হইল, তিনি প্রজাপতিটিকে ধরিবার জন্য আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যেই নিকটে গিয়াছেন অমনি প্রজাপতিটী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। খানিক পরে আবার প্রজাপতিটিকে সেইখানে দেখিতে পাইলেন; আবার ধরিতে গেলেন, আবার প্রজাপতি অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি এই রূপে চারিবার বিফল হইয়া প্রজাপতিটী যে স্থানে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল সেই স্থানটীতে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক তাকাইয়া রহিলেন; কিছু ক্ষণ পরে দেখিলেন প্রজাপতিটী তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই রহিয়াছে, এতক্ষণ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রজাপতিটীকে তিনি একটি পাতা মনে করিতেছিলেন। গাছের পাতায় আর প্রজাপতিতে কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় নাই। এই প্রজাপতির পাখার উপর দিক্‌টার রং হল্‌দে আর বেগুনে কিন্তু তলার দিক্‌টা পাতার মত সবুজ এবং দেখিতেও ঠিক পাতার ন্যায়। যখন পাখা দু'খানি একত্রিত করিয়া বসে, তখনই পাতার মত হইয়া যায় আর চেনা যায় না। পাখা দু'খানি ছড়াইলেই প্রজাপতির মত দেখায়। সাহেব যেই নিকটে যাইতেছিলেন প্রজাপতি অমনি পাখা



গুটাইয়া পাতার মত হইয়া সাহেবের ভ্রম জন্মাইতে ছিল, কাজেই সাহেব কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বসিবার সময়ে, যে সকল পাতার রং এবং আকৃতি ইহাদের মত, ইহারা বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল পাতার কাছে বসে। এই ছদ্মবেশের জন্য ইহাদের শত্রু পাখিরা হঠাৎ ইহাদিগের চিনিতে পারে না, চিনিতে পারিলেই খাইয়া ফেলে।



ফুল পোকার ভান করে। আবার পোকাও ফুল এবং পাতার নকল করে। জলে অনেক প্রকার কীট থাকে তাহারা দেখিতে গাছের মত। প্রবাল আর স্পঞ্জ দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায় কিন্তু তাহারা কীট। অনেক পোকা আবার দেখিতে শেওলার মত।

উদ্ভিদ, প্রাণীর রূপ ধারণ করে, প্রাণী রূপ ধারণ করে। আবার এক প্রাণী অপর প্রাণীর রূপ ধারণ করে।

হামিংবার্ড্ পাখিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমাদের টুনি পাখি আর মধুচুষ্‌কি হামিংবার্ড্ জাতীয়। হামিংবার্ড্ নানা জাতীয় এবং নানা রকমের আছে। ইহারা দেখিতে অতি মনোহর, যেমন ছোট তেমনি সুন্দর। উপরের ছবিটির দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে একটি ফুলের গোছায় দুটি পাখি মধু খাইতে বসিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার ডান্ দিকেরটা পাখি এবং বাম দিকেরটা প্রজাপতি। পাখির যেখানে দুটি চোখ প্রজাপতিরও সেইখানে দুটি চোখ। মস্তকের গঠনও উভয়ের দেখিতে এক। পাখির ডানায় পালক আছে, প্রজাপতির তাহা নাই, কিন্তু একের ডানা দেখিতে অপরের ডানার মত। প্রজাপতির



লেজের সোঁয়া এত বড় ও এরূপে সাজান যেন ঠিক পাখির লেজের মত। প্রজাপতির শুঁড় ঠিক পাখির ঠোঁটের মত লম্বা। এই প্রজাপতিকে ঠিক হামিংবার্ড় বলিয়া ভ্রম হয়। বেট্‌স্‌ সাহেব বলেন তিনি অনেকবার এই প্রজাপতিকে হামিংবার্ড্‌ ভাবিয়া গুলি করিয়াছেন।

এক জাতীয় হামিংবার্ড্‌ আছে তাদের খুব লম্বা দুটা লেজ থাকে। এক রকম প্রজাপতি আছে তাদেরও ঐ রকম লম্বা লেজের মত আছে; দেখিতে অনেকটা এই পাখির মত। শরীরের বর্ণে ও আকৃতিতে এত সাদৃশ্য আছে যে, একটু দূর হইতে এককে অপর বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের উভয়েরই বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকায়। তথাকার আদিম আদিবাসীরা বলে, ইহারা (প্রজাপতি আর পাখি) উভয়ই এক জাতীয়। তাহারা বলে ইহাদের চোখ দেখ, লেজ দেখ, পালক দেখ, সবই এক প্রকারের। এই প্রজাপতি আর ঐ জাতীয় পাখি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহাদের কিছুতেই তাহা বুঝান যায় না। আমেরিকার আদিমবাসীদের বিশ্বাস এই যে, প্রজাপতিই সময়ে সময়ে ঐ পাখি হইয়া যায়; একই জীব কখন প্রজাপতি, কখন বা পাখি হইতেছে। তাহারা বলে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। যদি শুয়ো পোকা থেকে প্রজাপতি হইতে পারে, তবে প্রজাপতি পাখি হইবে আর আশ্চর্য্য কি!

সখা । ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ । পৃ. ২৫-২৮

আকাশ-ভ্রমণ ও মেঘ হইতে লম্ফপ্রদান

বেলুন

চতুর্থ ভাগ সখায় বেলুন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা লেখা হইয়াছে। তাহা পড়িলে তোমরা জানিতে পারিবে, বেলুনটা কি জিনিস, আর বেলুনে করিয়া কিরূপে লোক মাঝে মাঝে আকাশে উঠিয়া থাকে।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেব হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। তৎকালীন এডিনবরা নগরের ডাক্তার ব্লাক পাত্‌লা চামড়ার ব্যাগে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া উড়াইতে আরম্ভ করেন, সেই অবধি গ্যাসের বেলুনের সৃষ্টি হয়। ডাক্তার ব্লাক যখন তাঁহার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ব্যাগ আপনা আপনি উড়িয়া ছাতের কড়িকাঠে গিয়া লাগে এই তামাসা দেখান, তখন তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, ব্যাগে কাল সূতা বাঁধা আছে, তাহা ধরিয়া ছাতের উপরের কোন ছিদ্র দিয়া লোকেরা টানিয়া লইতেছে। বেলুন যে আপনা আপনি উঠিতেছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

একটা ভেঁড়া, একটা মুরগী আর একটা হাঁস বেলুনে চড়িয়া আকাশে সর্ব্ব প্রথমে ভ্রমণ করে। ইহারা তিন জনাই অনেকক্ষণ আকাশে ভ্রমণের পর নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিলে পয় পিলেটর ডি-রোজিয়ার নামক জনৈক ফরাসি সর্ব্ব প্রথমে বেলুনে উঠিয়া আকাশ পথ ভ্রমণ করা যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়া দেন।

তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের নানা স্থান হইতে সাহসী পুরুষেরা বেলুনে করিয়া আকাশে বেড়াইতে আরম্ভ করেন। তদবধি যুদ্ধ সময়ে এবং অনেক উপরে আকাশের অবস্থা জানিবার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বেলুন ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্রীড়া-বেলুনে ও আকাশে বেড়াইবার বেলুনে একটু প্রভেদ আছে। মানুষ যে বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠে, তাহা খুব বড় করিয়া তৈয়ার করা হয় মাত্র। রেসমের কাপড় কাটিয়া এরূপ ভাবে সেলাই করা হয় যে, একটা প্রকাণ্ড ফাঁপা গোল বল তৈয়ার হয়। ইহার চারি দিকই বন্ধ থাকে, কেবল গ্যাস পুরিবার জন্য একদিকে একটী মুখ খোলা থাকে। কাপড়ের ফাঁক দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া না যাইতে পারে, এই জন্য

(১৮৮৬-র ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'বেলুন' সম্পর্কে লিখেছিলেন)

মোম এবং অন্যান্য পদার্থ গলাইয়া বার্ণিসের মত করিয়া সমস্ত বেলুনের উপর মাখাইয়া দেওয়া হয়। তারপর সমস্ত বেলুনটিকে সরু দড়ির জাল দিয়া ঘেরিয়া মজবুত করা হয়। ইহাকে হাইড্রোজেন কিম্বা কোন গ্যাস পুরিয়া একটা ধামা, ডালা বা ছোট নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে কাহাকেও বসাইয়া বেলুন ছাড়িয়া দিলে সব শুদ্ধ হুস করিয়া আকাশে উঠিতে থাকিবে, এবং যে দিকে বাতাস বহিতে থাকিবে, সেই দিকে উড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে।

আকাশে ভ্রমণের জন্য যে সকল বেলুন তৈয়ার হয়, তাহার উপরদিকে মাথায় "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ" অর্থাৎ এমন দরজা থাকে যে, তাহা ইচ্ছামত খুলিয়া বেলুনের গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়া যায়। বেলুনের উপরদিকে একটা বড় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মুখে মুখে ঠিক্ আঁটিয়া বসিয়া যায় এমন একটা কপাট করা হয়, সেই কপাট স্প্রিং-এর জোরে চাপিয়া ছিদ্রের মুখে আঁটিয়া থাকে। সেই কপাটের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে, বেলুনের নীচে যে লোক থাকে সে সেই দড়ি ধরিয়া থাকে। যখন বেলুনের গ্যাস বাহির করিয়া দিবার আবশ্যক হয়, তখন সে ঐ দড়ি ধরিয়া টানে। টানিলেই উপরের ভ্যাল্‌ভ অর্থাৎ কপাট ফাঁক হইয়া যায়, আর অমনি খানিকটা গ্যাস বাহির হইয়া যায়। বন্ধ করিবার সময় দড়ি ঢিল দিলেই হইল, স্প্রিং-এর জোরে উপরের কবাট ছিদ্রের মুখে আঁটিয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলে।

আবার বেলুনে বালু পূর্ণ ছোট ছোট থলিয়া সঙ্গে করিয়া লইতে হয়, বালুর বস্তা একটা দুটা ফেলিয়া দিলে বেলুন হাল্কা হইয়া যায়। তখন আরও উপরে উঠিতে থাকে।

এই কপাট ও বালুর বস্তার সাহায্যে বেলুনকে অনেকটা নিজের অধীনে রাখিয়া উপরে উঠাইতে বা নীচে নামাইতে পারা যায়। বেলুনের উপরে উঠার একটা সীমা থাকে। নীচের বাতাস যত ঘন উপরের বাতাস তত নহে। যত উপরে উঠা যায় বাতাস ততই আরো পাতলা হইয়া আইসে। নীচের বাতাস গ্যাস অপেক্ষা যত ভারি উপরের বাতাস তত নহে। কাজেই বাতাসের বেলুনকে উপরে উঠাইয়া রাখার ক্ষমতা এবং বেলুনের সর্ব্বসুদ্ধ ওজন এই উভয়ই যখন সমান হইয়া পড়ে তখন আর উপরে উঠিতে পারে না।

উপরে উঠিলে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, এই জন্য যখন বেলুনে গ্যাস পূরা হয় তখন সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ করা হয় না। বেলুন যখন আকাশে চলিতেছে তখন যদি তাহাতে গরম বাতাস লাগে বা সূর্য্যের প্রখর কিরণ পড়ে তবে ভিতরের গ্যাসের আয়তন বাড়িয়া যায়, বেলুন খুব ফুলিয়া উঠে. তখন বেলুন আরও উপরে উঠিতে থাকে। এই সময়ে সেই কপাট খুলিয়া গ্যাস বাহির করিয়া দিলে বেলুন আর উপরে উঠে না। সময়ে সময়ে এমনও হয় যে গ্যাস বাহির করিয়া না দিলে বেলুন ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আবার গ্যাস কম হইয়া গেলে, অথবা বেলুনের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস

লাগিয়া গ্যাসের আয়তন কমিয়া গিয়া, অথবা মেঘের জলে ভিজিয়া ভারি হইয়া নামিতে থাকিলে, বেলুনের বালির বস্তা দু-চারটা ফেলিয়া দিলে বেলুন হাল্কা করিলেই আবার বেলুন উপরে উঠিতে থাকে।

বেলুনের ভারের প্রভেদ অতি অল্প হইলেও, গতির প্রভেদ অধিক হইয়া পড়ে। এক অঞ্জলি বালু ফেলিয়া দিলে বেলুন চার পাঁচ শত ফুট উপরে উঠিয়া যাইবে। একটা টাকা বেলুন হইতে ফেলিয়া দিলে ৬০ হাত উচ্চে বেলুন উঠিয়া যাইবে।

উপরের অবস্থা।

সচরাচর যাঁহারা বেলুনে উঠেন তাঁহারা দশহাজার হইতে চৌদ্দহাজার ফুট অর্থাৎ দুই মাইল হইতে তিন মাইলের মধ্যে উঠিয়া থাকেন। গেলুসাক ২২ হাজার ফুট অর্থাৎ প্রায় ৪৷৷০ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। তিনি উঠিবার সময়ে নীচের উত্তাপ ৮২ ডিগ্রি ছিল; ২২ হাজার ফুট উপরে ১৫ ডিগ্রি মাত্র উত্তাপ ছিল। যত উপরে উঠা যায় ততই বেশি ঠাণ্ডা, কিন্তু হয়ত ১৬ হাজার ফুট উপরে যতটা গরম (অর্থাৎ ঠাণ্ডা) ১৮ হাজার ফুট উপরে তাহা অপেক্ষা অধিক গরম হইতে পারে। এই তারতম্যের কোন স্থিরতা নাই। কারণ আকাশের কোন স্থানে গরম বাতাস বহে কোন স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস বহে। আবার মেঘ হইতেও সূর্য্যের উত্তাপ প্রতিঘাত হইয়া বেলুনে পড়িয়া তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি করে। তবে মোটামুটি এই বলা যায় যে প্রত্যেক তিনশত ফুট উপরে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপের হ্রাস হয়।

রবর্টসন এবং লোএষ্ট হ্যামবর্গ হইতে ২৫ হাজার ফুট অর্থাৎ পাঁচ ক্রোশ উপরে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ কক্সওয়েল ও গ্লেসিয়ারের মত অত উচ্চে উঠিতে পারেন নাই। ইহাঁরা ৩৭ হাজার ফুট অর্থাৎ সাত ক্রোশ উপরে; হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের বহু উপরে উঠিয়াছিলেন। এত উপরে উঠিয়া ইহাঁরা অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলিতে ছিলেন। একজন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর একজনের হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছিলেন। ৩৫ বা ৩৬ হাজার ফুট, প্রায় সাত মাইল, উপরে উঠা যাইতে পারে। ইহার উপরে বেশি দূর উঠিলে মানুষ আর বাঁচিতে পারে না।

অবতরণ উপায়—প্যারাসুট।

বেলুন হইতে অবতরণ করাই কষ্টকর এবং যাহা কিছু বিপজ্জনক। ছাতার সাহায্যে লোকে অনায়াসে মেঘের নিকট, ৩ হাজার হইতে ৬ হাজার ফুট উপরে, বেলুন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিয়াছে। এই ছাতা খুব শক্ত কাপড়ের তৈয়ার হয়। ইহার ডাঁট নাই। এবং যে যে স্থান হইতে ছাতার শীকের আগা বাহির

হইয়া থাকে সেই সেই সকল স্থান হইতে লম্বা লম্বা দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দাও এবং সেই সব দড়ির আগাগুলি একত্র করিয়া বাঁধ এবং এই একত্রিত দড়ির আগায় এমন কোন জিনিস বাঁধিয়া দাও যাহাতে দাঁড়ান কিম্বা বসা যায়। তাহা হইলেই বেলুন হইতে নামিবার ছাতা হইল। এই ছাতার মাথায় একটা বড় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র না থাকিলেও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। বেলুন উঠিবার সময়ে এই ছাতাটি বন্ধ করিয়া ইহার মাথা বেলুনে আটকাইয়া দিয়া, উপরে লইয়া যাইতে হয়। তৎপরে নামিবার সময়ে ছাতাকে বেলুন হইতে খুলিয়া লইয়া সেই একত্রিত রজ্জুগুলির আগা ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলে অথবা সেই বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বেলুনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেই হইল।

এইরূপ ছাতাকে প্যারাসূট বলে। প্যারাসূটের সাহায্যে উচ্চ হইতে লাফাইয়া নীচে অবতরণ করা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। মঙ্ক মেসন সাহেব বলেন যে কোন ফরাসী ধর্ম্ম প্রচারক ব্রহ্ম দেশের দক্ষিণে শায়াম বা শ্যাম রাজ্যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্যারাসূট বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে নর্মান্ড সাহেব তাঁহার খুব উচ্চ বাড়ির ছাতের উপর হইতে এই ছত্র অবলম্বন করিয়া লাফ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। একটি বালিকা ছাদ হইতে পড়িয়া তাহার ঘাঘরার জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল।

প্যারাসূট কি নিয়মে কার্য্য করে।

জল বা বায়ুর মধ্যে যদি সমান ওজনের অথচ ভিন্ন আয়তনের দুটি বস্তুকে নাড়া যায় অথবা বেগে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া যায় তবে যে জিনিসের আয়তন বেশি সেটা অধিক পরিমাণে জল বা বায়ু হইতে বাধা পাইবে। একখণ্ড বড় কাগজকে অনেকবার ভাঁজ করিয়া তাহার আকার ছোট করিয়া ফেলিয়া দিলে যত শীঘ্র পড়ে, ভাঁজ না করিয়া সেই কাগজ ফেলিয়া দিলে তত শীঘ্র পড়িবে না। ঝড়ের সময়ে ছাতা বন্ধ করিয়া ঝড়ের মুখে গেলে অনায়াসে যাওয়া যায়। কিন্তু ছাতা খুলিয়া ঝড়ের মুখে যাওয়া অতি কষ্টকর এবং সময়ে সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার কারণ খোলা ছাতার ওজন সমান হইলেও বন্ধ ছাতা অপেক্ষা আয়তন অধিক, সেই জন্য অধিক বাধা পায়। একটা বন্ধ ছাতা উপরে হইতে যত শীঘ্র পড়িবে খোলা ছাতা তত শীঘ্র পড়িবে না। প্যারাসূটও এই নিয়মে কার্য্য করে। প্যারাসূট গুটাইয়া (ছাতা বন্ধ করিয়া) উপরে উঠিতে হয়। পড়িবার সময়ে প্যারাসূট (ছাতা) খুলিয়া যায় তখন আর প্যারাসূট খুব বেগে পড়িতে পায় না। ধীরে ধীরে নামিয়া আইসে।

স্পেন্সার সাহেবের দুই হাজার ফুট উপর হইতে লম্ফ।

পার্সিভাল স্পেনসার অবিবাহিত ইংরাজ যুবক, বয়স অনুমান ২৬।২৭ বৎসর। ইহার

মধ্যেই ইনি ৯১ বার বেলুনে উঠিয়াছেন, কিন্তু ৮ বার ছাতার সাহায্যে বেলুন হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার পিতাও একজন প্রসিদ্ধ বেলুনবাজ। বেলুন তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা ইঁহাদের ব্যবসা। ইনি গত ২৭শে জানুয়ারি বোম্বাই নগরে, তাঁহার "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" নামক বেলুনে উঠিয়া প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ হইতে প্যারাসূট লইয়া লাফাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করেন। এরূপ কাণ্ড ভারতবর্ষে এই প্রথম। বোম্বাই নগরে বেলুনে উঠা ও ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার ছবি দিলাম।* ছবি দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবে। বেলুন ১৭৬০ ফুট উপরে উঠিলে তিনি প্যারাসূটের কড়া ধরিয়া লাফাইয়া পড়েন। ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত খুব প্রচণ্ড বেগে পতিত হইয়াছিলেন। তখনও ছাতা খুলিয়া যায় নাই। তার পরক্ষণেই ছাতা খুলিয়া গেল এবং তিনি ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন। ইঁহার প্যারাসূটের ব্যাস ২৫ ফুট। খুব শক্ত ও পুরু রেসমের কাপড়ে নির্ম্মিত। ইহার ওজন ১৪ সের মাত্র। ইহা বেলুনে একটা সরু দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। সে দড়িতে একমণ ভার পড়িলেই দড়ী ছিঁড়িয়া যায়। স্পেন্সার সাহেবের ভার দুই মণ হইবে। কাজেই তিনি যখন বেলুন ছাড়িয়া প্যারাসূট ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন, তখন বাঁধের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়া বেলুন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। বেলুন উড়িয়া যাইতে থাকে। এ বেলুনে "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ" অর্থাৎ গ্যাস বাহির করিয়া দিবার দ্বার নাই। কিন্তু বেলুনের উপর দিকটা ভারি; স্পেনসার সাহেব যেই বেলুন ছাড়িয়া নামিয়া যান অমনি উপর দিক্‌টা আপন ভারে নীচের দিকে হইয়া যায় ও বেলুনের মুখ ঘুরিয়া উপরদিকে উঠিয়া যায়। বেলুনের মুখ বাঁধা থাকে না। মুখ খোলা থাকিলেও যতক্ষণ নীচের দিকে থাকে ততক্ষণ গ্যাস বাহির হয় না, যেই মুখ উপরদিকে হইয়া যায় অমনি গ্যাস বাহির হইয়া যাইতে থাকে। খানিক পরেই বেলুন মাটিতে পড়িয়া যায় তখন সেটা খুঁজিয়া কুড়াইয়া আনিতে হয়।

সেইখানে এই বাজী দেখাইয়া কলিকাতায় আইসেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে স্পেন্সার সাহেব কলিকাতার নিকটবর্তী বালীগঞ্জের মাঠে বেলুনে আরোহণ করিয়া প্যারাসূটের সাহায্যে ২,০০০ ফুট উচ্চ হইতে বেলুন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সেবার স্পেন্সার সাহেব উপযুক্ত গ্যাসের অভাবে বহু চেষ্টা করিয়াও বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিতে পারেন নাই। পার্শিভাল স্পেন্সার তারপর আবার এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, তিনি ১৯এ মার্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় গড়ের মাঠে বেলুনে চড়িয়া শূন্যে উঠিয়া মেঘান্তরাল হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবার পর, কলিকাতার সকল লোকেই এবার স্পেন্সার সাহেবের উদ্যমের ফলাফল জানিবার জন্য, অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েন। তাই কলিকাতায় মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫॥০

* ছবি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

টার সময় আকাশে উঠিবার কথা,—কিন্তু ১টার পূর্ব্ব হইতেই ঝাঁকে ঝাঁকে লোক গড়ের মাঠের জড় হইতে লাগিল। বড় রাস্তা সমুদায় লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া দুষ্কর হইল, ট্রামওয়ের গাড়ি লোকের ভারে ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। যাঁহারা গড়ের মাঠে যাইতে পারেন নাই তাঁহারা আপন আপন গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া বেলুন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলেন! জাহাজের মাস্তুলে কত লোক, কেল্লার উপর কত লোক, মনুমেন্টের উপর কত লোক, ঘরের চালে লোক, মাঠে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করিতেছে। গড়ের মাঠে এক লক্ষের উপর লোক ছিল। ৫টা ১৫ মিনিটের সময় বড়লাট, তাঁহার স্ত্রীও দলবলসহ ময়দানে উপস্থিত হন। ৫ টার সময়ে উঠিবার কথা ৫॥০টা হইয়া গেল তথাপি বেলুন উঠিল না দর্শকগণ অধীর হইয়া উঠিল। সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কত লোকে কত প্রকার উপহাস করিতে লাগিল। ৬টার সময় তিনি প্যারাসূট লইয়া বেলুনে উঠিলেন। স্পেন্সার বেলুনে চড়িয়াই তাহা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। বেলুন কয়েক হাত উপরে উঠিয়াই হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি সহকারীদিগকে দড়ি ধরিয়া বেলুন টানিয়া নামাইতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন ছাতার ভারে বেলুন উঠিতে পারিতেছে না। তৎক্ষণাৎ ছাতা ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু ছাতা ফেলিয়া আকাশে উঠা যে বড় বিপজ্জনক তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। ছাতা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ব্যোমযান ছাড়িয়া দেও।" দড়ি ছাড়িবামাত্র বেলুনটি খাড়া হইয়া প্রবলবেগে হাউইর মত হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া গেল। স্পেন্সার সাহেব নির্ভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে মাথার টুপি খুলিয়া তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সাধারণকে অভিবাদন করিতে করিতে বিদায় লইতে লাগিলেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। সমুদায় গড়ের মাঠের, কলিকাতা শহরের এক পার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের লোক হাততালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বেলুন প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উঠিতে ছিল, কিন্তু ঊর্দ্ধের বায়ুর গতি ভিন্ন দিকে হওয়ায় উত্তর পূর্ব্ব মুখে উঠিতে লাগিল। ৫।৬ মিনিটের মধ্যে বেলুনটি ৪।৫ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া একটা ক্ষুদ্র বলের মত দেখাইতে লাগিল। তারপর ক্রমে ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি ৬০০০ ফুট উপরে মেঘ ছাড়াইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। স্পেন্সার সাহেব আর নামিলেন না। তিনি যে জীবিত অবস্থায় কখনও আর নামিতে পারিবেন সে বিষয়ে সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল। সকলেই মনে করিল তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই।

আকাশে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই শীত ভীষণতর হইয়া উঠে। শীতেই হয়ত তিনি বাঁচিবেন না। যদিও বা শীতে বাঁচেন, অনাহারে প্রাণ বাহির হইবে। হয়ত পড়িয়াই মরিয়া যাইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সকলের মন বিষাদে পূর্ণ হইল। চারিদিকে

হাহাকার পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল, জীবিত বা মৃত, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে অবস্থায় যেখানে তাঁহাকে পাওয়া যায় অমনি সে সংবাদ যেন কলিকাতায় তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হয়। মঙ্গলবার সমস্ত রাত্রে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। বুধবার সমস্ত দিনেও কোন ঠিক খবর পাওয়া গেল না: যাহা পাওয়া যায় তাহাও মিথ্যা হইয়া যায়। বুধবার রাত্রেও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সকলেই মনে করিল তিনি আর জীবিত নহেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন ঠিক খবর নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন. সকলেই নিরাশ। সন্ধ্যার পর খবর আসিল যে তিনি হোসেনাবাদ নামক স্থানে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছেন। শুক্রবার প্রত্যুষে ৪।৷০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছোন।

আত্ম কাহিনী

স্পেন্সার বলেন "ছাতা না লইয়া উঠিলেও আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়াই ছাতা না লইয়া উঠিয়া ছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যোমযান আকাশে উঠিলে আমি উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। মনুমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছিবামাত্র বাতাসের গতি ফিরিল। আমি বালীগঞ্জের দিকে চলিলাম; ব্যোমযান তাড়িৎ বেগে উর্দ্ধদিকে যাইতে লাগিল। যখন বালীগঞ্জ যাই, তখন ৬ হাজার ফিট উপরে উঠিয়াছিলাম। বেলুন ক্রমেই আরও উঠিতেছিল। তখন ঘন মেঘের মধ্যে গিয়া পৌঁছিলাম। চারিদিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শীতে হাত পা অবসন্ন হইতে লাগিল। একবার দড়ীতে ভর করিয়া দাঁড়াইলাম, আবার বসিয়া দুই হাত ঘসিয়া গরম করিতে লাগিলাম। তার পর দেখিলাম বাঁ পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে পা ছুড়িতে লাগিলাম। তখনও উপরে যাইতেছি। তখন প্রায় ১৩ হাজার ফিট উপরে উঠিয়াছি। তখন দেখিলাম বেলুনের মুখ দিয়া গ্যাস বাহির হইতেছে। এবার বেলুন ক্রমাগত নিম্নদিকে যাইতেছে। তখন খুব অন্ধকার হইয়াছিল, কিন্তু জল ও স্থলে প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ৭।৷০ টার সময় আমি মাটির নিকট পৌঁছিলাম। তখন বেলুনের দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র মাটিতে দাঁড়াইলাম, ব্যোমযান অমনি আবার শূন্যে উঠিয়া গেল।

আমি ভূতলে নামিয়া দেখি, এক ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু শরীরে একটা আঁচড়ও লাগে নাই। দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম, সেই দিকে চলিলাম কিন্তু সম্মুখে জল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর একটা আলো দেখিয়া সেই দিকে চলিলাম—সে দিকেও জল রহিয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আবার একটা আলো দেখিয়া সেই দিকে চলিলাম। এদিকে জল ছিল না। এখানে এক বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সকলেই হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়াছিল। তাহারা আমাকে দুধ-চিড়া

খাইতে দিল আমার তাহা ভাল লাগিল না। রাত্রে ঐখানে তাহাদের বাড়ির বারান্দায় নিদ্রা গেলাম। পরদিন (বুধবার) প্রাতঃকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময়ে হোসনাবাদ থানায় পৌঁছিলাম। সে রাত্রে থানায় নিদ্রা গিয়া বৃহস্পতিবার ১২টার সময়ে তথা হইতে রওনা হইয়া ৪টার সময়ে বসিরহাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটবাবুর বাসায় পৌঁছি। তিনি আমার অতি যত্ন করেন। রাত্র ৯টার সময়ে গাড়ি করিয়া বারাসত স্টেশনে আসিতেছিলাম। পথি মধ্যে স্টেটসম্যানের সংবাদ পত্রের লেখকের সহিত দেখা হয়। তৎপরে তাঁহাদের স্পেশাল ট্রেনে আসিলাম। দেড় ঘণ্টা মাত্র বেলুনে ছিলাম। খবর দিবার কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া খবর দিতে পারি নাই।"

বেলুনে উড়িয়া আকাশে ভ্রমণ করা লোকে যতটা বিপজ্জনক মনে করে বাস্তবিক তাহা নহে। আজ পর্য্যন্ত বেলুনে করিয়া যতবার যতলোক উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিপদ অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এমন কি সমুদ্রে জাহাজের ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ ঘটিয়া থাকে।

মার্কিনদেশের ওয়াইজ সাহেব আরও অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইতেন। তিনি ছাতা লইয়া উঠিতেন না। বেলুন ১৩ হাজার ফুট উপরে উঠিলেই বেলুনটিকে ফাটাইয়া দিতেন। ফাটিয়া যাইবা মাত্র আরোহী সমেত বেলুন অতি বেগে পড়িয়া যাইতে থাকে, পড়িতে পড়িতে বেলুনে বাতাস লাগিয়া বেলুন একটা খোলা ছাতার আকার ধারণ করে তখন বাতাসে বাধা পাইয়া আর বেগে নামিতে পারে না। ধীরে ধীরে নামিয়া আইসে। ওয়াইজ সাহেব এইরূপে অনেকবার নামিয়াছেন একবারও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইঁহার কাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত।

প্যারাসূট লইয়া যত উপর হইতে পড়া যায় ততই বিপদের কম আশঙ্কা, অতি নিকট হইতে পড়িলে ছাতা খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই হয়ত মাটিতে পড়িয়া শরীর চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

আমেরিকাদেশে বেলুন তৈয়ার হইতেছে তাহাতে চাকা, কল, পাইল প্রভৃতি থাকে তাহাকে জাহাজের মত যে দিক ইচ্ছা সে দিয়ে চালান যাইতে পারে।

সখা । মার্চ ১৮৮৯ । পৃ. ৪১-৪৮

পেচক

পেচা বাজ পাখির জাত। ইহাদের ঘাড় এত ছোট যে পাখায় পিঠে এক বোধ হয়। অন্যান্য পাখিরা কোন জিনিস দেখিবার সময়ে ঘাড় বাঁকাইতে দেখে, পেঁচারা বড় বড় চোখ দিয়া সোজা সম্মুখের দিকে তাকায়।

অসভ্য বা সভ্য পৃথিবীর কোন দেশের লোকেরই পেঁচার প্রতি অনুরোধ নাই। পেঁচা সর্ব্বত্রই ঘৃণার বস্তু। অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দি, ইহার চেহারার প্রতিও লোকের দয়া নাই। "পেঁচা-মুখো" বা "পেঁচা-মুখী" আমাদের দেশের গালির কথা।

প্রাচীন গ্রীস ও ইটালি এবং অধুনাতন ইংলণ্ডেও পেঁচার ডাক দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। পেঁচার প্রতি এরূপ অযথা আক্রোশ শুদ্ধ ইউরোপে সীমাবদ্ধ নহে, ভারতবর্ষে, এশিযার অন্যান্য প্রদেশে, আফ্রিকায় ও আমেরিকারও পেঁচাটা ভয়ের জিনিস।

সেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ইংরাজ কবিদিগের গ্রন্থে পেচকের অনেক মারাত্মক গুণের বিষয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার গভীর রাত্রে পেঁচা ডাকিলে নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনার লক্ষণ। দিনের বেলাও পেঁচা দেখা বড় দুর্লক্ষণ। সন্তানের জন্ম কালে পেঁচা দেখা দিলে সন্তানের অমঙ্গল ঘটে। অন্যান্য সময়েও পেঁচার ডাক মৃত্যু বা বিশেষ কোন দুর্ঘটনার বিষয় জানাইয়া দেয়। বাঙ্গলা দেশেও অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস এক প্রকার পেঁচার ছুট্ ছুট্ ছুট্ ডাক, গৃহের কাহারও শীঘ্র অত্যন্ত পীড়া হইবে তাহারই পরিচায়ক।

আফ্রিকা এবং বোর্ণিও প্রদেশের লোকের বিশ্বাস পেঁচা শয়তান বা মারের সহচর। ইহুদিদিগের বিশ্বাস পেঁচা ডাকিলে সন্তানাদির মৃত্যু ঘটে। এই জন্য যখনই তাহাদের বাড়ির নিকটে, পেঁচা ডাকে বা বাড়ির উপর দিয়া পেঁচা উড়িয়া যায় তখনই তাহারা উঠানে এক কলসী জল ঢালিয়া দেয়। এইরূপ করিলে পেঁচার ভিতর যে শয়তান আছে তাহার দৃষ্টি বা মন সেই জলের দিকেই আকর্ষিত হয়, সন্তানের কথা ভুলিয়া যায়।

আরবদিগের বিশ্বাস পেঁচারা বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সকলেরই অনিষ্ট করিতে পারে। এই অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সহজ। ইহারা যখনই পেঁচার ডাক শুনে তখনই পেঁচাকে অভিসম্পাত করে। পেঁচারা যখন ডাকে তখন তাহারা কেবল নিজ পেচক ভাষায় লোক বিশেষকে অভিসম্পাত করে। যাহার অনিষ্ট করিবে পেচক যদি তাহার

নাম না জানে অথবা তাহার দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতে পারে তবে সে লোকের আর কিছুই করিতে পারে না। শয়তানের নিদ্রা নাই কেবল লোকের অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যস্ত, পেচক তাহার সহচর, প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই তাহার রীতি, পেচককে যদি গালি দেওয়া যায় ও অভিসম্পাত করা যায় তবে শয়তান আর কিছুই করিতে পারে না; আরবদিগের এই বিশ্বাস।

পেচক সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী আছে।

অন্যান্য পেঁচা অপেক্ষা হুতুম পেঁচা খুব যত্ন হয়। ইহারা নদী, পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়ে ও ধান্য ক্ষেতের ধারে থাকিতে ভালবাসে। দিনের বেলায় ইহাদের দৃষ্টি তত প্রখর নহে, তথাপি অন্ধ নহে। গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসিয়া থাকে, বা কোটরে নিদ্রা যায়; মানুষের পদ শব্দ শুনিলেই কান খাড়া করিয়া মাথা হেঁট করিয়া স্থির দৃষ্টে আগমনকারীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে থাকে। দূরভিসন্ধি একবার বুঝিতে পারিলে বাহির হইয়া আইসে, তখন কাহার সাধ্য আর এক পদ অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার সময়ে ইহারা আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ কোন বড় গাছে বসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে।

পেঁচাদের আকার নানা প্রকার হয়। কয়েক প্রকার পেঁচা আছে তাহার চড়াই পাখির অপেক্ষা বড় হয় না। আর এক প্রকার পেঁচা আছে তাহারা খুব বড় বড় হয় ইহাদিগকে ইংরাজিতে ঈগল্ আউল্ বলে। ইহারা আমেরিকা, সাইরিরিয়া ও হিমালয় পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা হরিণের ছানা, ছাগলের ছানা, ইন্দুর, ছুঁচা, সাপ, ব্যাং ও ইহাদের শক্ত দাঁড়কাক ও কাক ধরিয়া খায়। ইহাদের শব্দ পুহু পুহুর ন্যায়। ইহারা এবং অন্যান্য জাতীয় পেঁচারা গাছে বাসা করে না। পর্ব্বতের ফাটলে বা ভগ্ন প্রাচীরে বাসা করে।

আর এক জাতীয় পেঁচা আছে, তাহাদের ডানা খুব লম্বা লম্বা হয়। দেশী কুকুরের কানের মত মাথার দুই ধারে খাড়া হইয়া থাকে।

ইউরোপে পেঁচা বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। তাহার কারণ বোধ হয়, এথিনী বা মিনার্ভা গ্রীকদিগের বুদ্ধির দেবী আমাদের সরস্বতীর অনুরূপা, পেচক তাঁহারই প্রিয় পাখি। আমাদের দেশে পেঁচা লক্ষ্মীর সঙ্গে থাকে।

পেঁচাকে লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, পেঁচা যে মানুষের অত্যন্ত হিতকারী তাহা নিঃসন্দেহ। ইহারা ইন্দুর প্রভৃতি মারিয়া গৃহস্থের শস্য রক্ষা করে। ইহাদিগকে গোলাঘর বা শূন্য ক্ষেত্রের নিকট হইতে তাড়ান উচিত নহে। বরং ভাঙা বাক্স, পিপে ইত্যাদি রাখিয়া ইহাদের বাস করিবার জন্য প্রলোভন দেখান উচিত। ইহাতে গৃহস্থের উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

সখা। ডিসেম্বর ১৮৮৯। পৃ ১৮৭-১৮৮

ইতর জন্তু ও মানুষ

ইতর প্রাণীরা দিক্ নির্ণয় করিতে পারে ও বহুকালের পূর্ব্বের বাসস্থান স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জন্তুর কথা ছাড়িয়া দি, পিপীলিকা মৌমাছি পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত আহারান্বেষণে গিয়া পথ হারা হয় না।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে কুকুরেরা কখন কখন ট্রেনে চড়ে এবং গন্তব্য স্টেশনে নামিয়া যায়। যদি কোন কারণে সে স্টেশনে নামিতে না পারে তবে তার পরের কোন স্টেশনে নামে এবং সেখানে অপেক্ষা করিয়া ফেরত ট্রেনে ফিরিয়া আইসে।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা (reasoning) সমবেদিতা ও অন্যান্য কোমলতর প্রবৃত্তি প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইয়া, ইহারা যে মনুষ্য অপেক্ষা, নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহা বলা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন যে বর্ব্বর মানুষ আর ইতর প্রাণীতে প্রভেদ অতি অল্প। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ইতর প্রাণীর ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পরিবর্তন ঘটিয়া শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ হইয়াছে। মানব সমাজের যেরূপ শ্রেণী বিভাগ আছে, যে সকল সামাজিক ও গার্হস্থ্য কর্ম্মের চলন আছে, পশুদের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। পিপীলিকার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন গৃহ, আহার্য্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার, আবর্জ্জনা ময়লা ফেলিবার ঘর, শয়ন গৃহ ও সমাধি স্থান সকলই আছে। মৌমাছি ও পিপীলিকাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্যবসায় অনুসারে শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট আছে। দণ্ড, পুরস্কার, পীড়িতের সেবা, বৃদ্ধের পেন্সন, দাস রক্ষা ও পশুপালন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

একটি পিপীলিকার সোঁ কাটিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার সঙ্গীরা আসিয়া ক্ষত স্থানে মৃত্তিকা লেপন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছে। পিপীলিকারা আহতদিগকে বহন করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে। মৌমাছির রাণী পীড়িত হইলে দাসেরা সেবা করিয়া থাকে। একটা শালিক পীড়িত হইয়া আহারান্বেষণে অক্ষম হইলে আর একটা আসিয়া তাহার মুখে আহার তুলিয়া দিতে দেখা গিয়াছে। একটা কুকুরের পা কোন ক্রমে কাটিয়া যায়, তাহার বন্ধু আর একটি কুকুর তাহাকে কিংস্ কলেজ হাসপাতালে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় ও সেখানকার লোকদিগের নিকট বন্ধুর চিকিৎসার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে থাকে। বন্ধুর পা বাঁধিয়া দিলে আনন্দ প্রকাশ করে।

সন্তান স্নেহ ও সমবেদিতা মনুষ্যের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবদের মধ্যে কোন অংশেই

কম নাই। বানরেরা সন্তানের মুখ ধোয়াইয়া দেয় ও সন্তানের গায়ে মাছিটী পর্য্যন্ত বসিতে দেয় না। সন্তান শোকে কোন কোন বানরীকে, প্রভুর শোকে কুকুর বিড়ালকে ও বন্ধু শোকে কোন কোন পাখিকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দেখা গিয়াছে। বানর ও কুকুরেরা আহতের সেবা করে এবং কিছু খাইতে পাইলে আগে তাহাকে খাইতে দেয়। মানুষের মত বানরেরা সন্তানদিগকে শাসন করিবার জন্য প্রহার করে।

মৃত্যুর জ্ঞান অনেক প্রাণীর আছে। প্যারিসের পশ্বালয়ে একটি সিংহীর সহিত একটি কুকুরের অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সিংহী মরিয়া গেলে কুকুরটি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। একটি পিপড়ার মৃত্যু হইলে অন্য পিপড়া তাহার কবর দেয়।

কাহারও মার মৃত্যু হইলে, অনাথ অপালিত শিশুকে অন্যেরা প্রতিপালন করে। এক জনার দুইটি হস্তিনী ছিল। তার একটির ছানা ছিল। একটি হস্তিনী সেই ছানার প্রহরী ছিল, রক্ষণাবেক্ষণ করিত, আহার দিত এবং কাহাকেও তাহার নিকট আসিতে দিত না। এক দিন কোন ভদ্রলোক মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ হাতিটা বুঝি ছানাটার মা? মাহুত বলিল, "না, ওটা ওর মাসী"। অর্থাৎ ছানাটার মা—তার তত খোঁজখবর নেয় না, আর একটি হাতিনী আপন সঙ্গিনী সন্তানকে প্রতিপালন করে।

বিবরেরা এক সঙ্গে অনেকগুলি পরিবার বাস করে ইহাদের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। বায়ু সঞ্চালনের জন্য ইহারা কখন কখন বাস গৃহের চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া থাকে। বাসস্থানের গুণাগুণ অনুসারে ইহারা বাস গৃহ বিভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করে।

পশুদিগের পুরাতন ঘটনা স্মরণ সম্বন্ধে কুকুর ও হাতীর কত গল্প আছে। একজন একটি হাতীর সহিত তাহার শুঁড়ে ছুঁচ ফুটাইয়া তামাসা করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁহাকে নিকটে পাইয়া হাতিটি তাহার সমস্ত শরীর পচা জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

কোন ভদ্রলোকের একটি বিড়ালী ছিল তার অনেক ছানা হইয়াছিল। সেই ছানাগুলি দোষ করিলে তিনি বিড়ালীর কান মলিয়া দিতেন। কানমলা হইতে এড়াইবার জন্য তারপর হইতে ছানারা কোন দোষ করিলে নিজেই তাহাদের কান মলিয়া দিত ও অন্য শাস্তি দিত।

কুকুরদের অহঙ্কার আছে, মান অপমান জ্ঞান আছে। ভাল কুকুরকে একটু ভ্রূকুটি করিলে বা ধমক দিলে সমস্ত দিন দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকে। আমাদের একটা কুকুর ছিল, রাস্তায় ছোঁড়ারা ঝগড়া মারামারি করিলে সে তাহাদের কাপড় ধরিয়া টানিয়া নিবৃত্ত করিত। দুইটি কুকুরে ঝগড়া হইলে একজন ক্ষমা চাহিয়া ঝগড়া মিটায়। ইহারা ছবি চিনিতে পারে। প্রভুর অনুপস্থিতি কালে প্রভুর ছবির পার্শ্বে কত কুকুরকে দিন কাটাইতে দেখা গিয়াছে। শিকারী গুলি করিয়া পাখী মারিলে, কুকুর আগে আহতটীকে আনে তারপর হতটীকে আনে। আবার দুইটি আহত থাকিলে একটাকে হত্যা করিয়া রাখিয়া আইসে। মানুষ হাজারই কেন নিকৃষ্ট হউক না, পশু পক্ষী হইতে ঊর্দ্ধতন এবং

উৎকৃষ্ট। তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মানুষে যতটা পার্থক্য দৃষ্ট হয় বর্ব্বর মানুষে ও বানরে ততটা দৃষ্ট হয় না। সভ্য ও বর্ব্বর মানুষে যে প্রভেদ, বর্ব্বর ও ইতরজন্তুর মধ্যে সেই প্রভেদ; মাত্রায় কম বেশি মাত্র, প্রকারগত নহে। অনেক দেশের অসভ্য জাতিরা আগুনের ব্যবহার জানে না। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা কিরূপে আগুন রাখিতে হয় তাহা জানে না, একবার নিবিয়া গেলে আবার কি করিয়া আগুন করিতে হয় তাহাও জানে না। তাসমানিয়া ও অন্যান্য স্থানের অসভ্যেরা কৃষিকার্য্য জানে না। ফুয়েজি স্ত্রীলোক ও বালকেরা কুকুরের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া শীল মাছের কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। তুরস্কের মোগলেরা ও তিব্বতবাসী অনেক জাতি কাঁচা মাংস খাইয়া থাকে। আবিসিনিয়ার লোকেরা জীবন্ত গরুর গা হইতে যতটুকু আবশ্যক ততটুকু মাংস কাটিয়া লইয়া কাঁচা খায়।

আমাদের দেশে যেমন ছাগল দিয়া বাঘ ধরে, আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি তেমন সন্তান খাইতে দিয়া সিংহ ধরে।

আমেরিকা ও কামস্কট্‌কার এস্কুইমো জাতি পীড়িত ও দুর্ব্বল শিশুকে মারিয়া ফেলে। জীবন্ত সন্তানকে মার মৃত দেহের সহিত কবর দেয়। কামস্কট্‌কার লোকেরা পিতা মাতাকে বধ করিয়া কুকুরদিগকে খাইতে দেয়। অন্য কোন খাবার না পাইলে ফুয়েজি জাতি বৃদ্ধাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। পিতা মাতা অকর্ম্মণ্য হইতে না হইতেই ফিজিবাসীরা তাহাদিগকে হত্যা করে। ইহারা জ্ঞাতি, বন্ধু সকলকে ডাকিয়া উৎসব করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ফাঁসী দেয়।

সখা । জানুয়ারি ১৮৯০ । পৃ. ৬-৮

সাপ

(গোখুরা)

ভারতবর্ষে যত প্রকার সাপ আছে তাহার মধ্যে গোখুরাই ভয়ানক। কেউটে ও গোখুরা একই জাতীয়। অন্যান্য সাপে ও গোখুরা সাপে শারীরিক গঠনে এই প্রভেদ যে ইহাদের মাথার নিকটে গলার কাছে প্রায় গোটা কুড়ি পাঁজর খুব লম্বা, এবং সেই পাঁজরের আবরণ মাংস ও চর্ম্ম খুব বিস্তৃত। এই বিস্তৃত চ্যাটাল অংশকে ফণা বলা হয়। গোখুরা ইচ্ছামত এই ফণা কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। এই ফণার উপর দিকে গোরুর ঘুরের মত বা একজোড়া বড় চসমার মত দাগ আছে, এই দাগ হইতে ইহার নাম গোখুরা হইয়াছে।

বিখ্যাত ডাক্তার স্যার জোসেফ বলেন, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ২০,০০০ লোক সাপ, কুম্ভীর ও বন্য জন্তুর হাতে মারা যায়, ইহার মধ্যে কেবল সর্পাঘাতেই ১৭,০০০ লোক মারা যায়। ইহার অর্দ্ধেক আবার শুদ্ধ গোখুরা সাপের কামড়েই মরে।

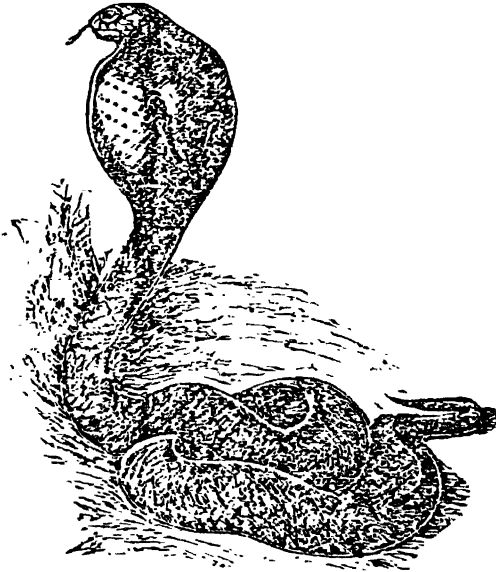
হিমালয় হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক স্থানে এত অধিক পরিমাণে থাকে, যে লোকের বিছানার লেপের মধ্যে, জুতার ভিতরে, এমন কি ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও পাওয়া যায়।

গোখুরাকে সকলেই ভয় করে। ঘোড়া স্বভাবতঃই গোখুরা হইতে দূরে থাকে। একটা গোখুরা দেখিলে দলকে দল গোরু বা মহিষ উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে থাকিবে। এমন কি ব্যাঘ্রও ইহার ভয়ে ভীত। কোন ভদ্রলোক খাঁচার ভিতর একটা বড় বাঘ পুষিয়াছিলেন, সেই বাঘটা মাঝে মাঝে এমন চীৎকার ও লম্ফ-ঝম্ফ করিত যে, সময়ে সময়ে তাহাকে খুব প্রহারের আবশ্যক হইত। একদিন কেহ একটা মৃত গোখুরা বাঘের খাঁচার ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলে। সাপটা খাঁচার শিকে বাধিয়া ঝুলিতে থাকে। বাঘটা ভয়ে আপাদমস্তক কাঁপিতে থাকে। তখন সে এক কোণে জড়সড় হইয়া কপালের উপর একখানি পা তুলিয়া যেন মাথাটা রক্ষা করিতেছে এইরূপ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যতক্ষণ সেই মরা সাপটা ঝুলিতেছিল ততক্ষণ বাঘের সব প্রতাপ ও বীরত্ব ঘুরিয়া গিয়াছিল।

একবার এক সাহেব তাঁহার পালিত বাঁদরের গলায় একটা মরা গোখুরা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতেই বাঁদরটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

সকল সময়েই গোখুরার জিত হয় না। এক জন ইঁদুর ও গোখুরার যুদ্ধ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঘরের জানালা হইতে এক যুদ্ধ দেখিতে পান। সাপটা

বড় আস্তে আস্তে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। ইঁদুরটা খুব চালাক চতুর চট্‌পটে। ইঁদুরটা যেখানে সেখানে সাপটাকে কামড়াইতেছিল। সাপটার ঘুরিতে ফিরিতেই যেন ছয় মাস যায়। সাপ যেই কামড়াইতে আইসে ইঁদুরটা অমনি লাফ দিয়া অপর দিকে পড়িয়াই সাপের গায়ে কামড় মারে। অনেকক্ষণ পরে সাপটা একটা ছোঁ মারিতে পারিয়াছিল। তখন ইঁদুরটা যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিল তাহার মৃত্যু নিকটে, অমনি নির্ভয়ে সাপের কাছে গিয়া তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিল আর ছাড়িল না, সাপটা কত ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল ইঁদুর কিছুতেই ছাড়িল না। অবশেষে উভয় যোদ্ধাই মরিয়া রহিল।



গোখুরা এত ভয়ানক সত্ত্বেও অথবা এত ভয়ানক বলিয়া আমাদের দেশের সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখাইবার জন্য গোখুরা সাপই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য অন্য কোন সাপের "বাজি" করিবার ক্ষমতা নাই। গোখুরা কেমন ফণা ধরিয়া বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতে থাকে, অন্য কোন সাপ এরূপ করে না। সাপুড়েরা সাপকে মন্ত্র দ্বারা বশীভূত না করুক সাপের বিষ যেখানে থাকে সেই দাঁত ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে।

সব বিষধর সর্পের বিষ উপরের চোয়ালে বড় বড় দুইটা দাঁতের গোড়ায় থলিয়ার ভিতর থাকে। এই থলিয়ার ভিতর বিষ জন্মায়। দাঁতে লম্বালম্বি এপার ওপার সরু ছিদ্র আছে আর সেই ছিদ্র বিষের থলিয়ার সহিত সংযুক্ত, সাপ যখনই ক্রুদ্ধ হইয়া কামড়ায়, তখনই থলিয়ার মধ্য হইতে বিষ দাঁতের ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে।

সকল সাপের বিষ সমান তীব্র নহে। গোখুরা সাপের বিষ ভয়ানক তীব্র। ইহার কামড়ে ইঁদুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ৫।৬ সেকেণ্ডের মধ্যেই মরিয়া যায়। মানুষ ৫

মিনিট হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। ইহার বিষ ছুঁচের মাথায় করিয়া গায়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেই মানুষ অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে।

বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ফ্র্যাঙ্ক বক্‌লাণ্ড সাহেব বলেন—"আমি এক দিবস জুলজিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া দেখি একটা ইঁদুরে ও গোখুরায় খাঁচার ভিতর যুদ্ধ হইতেছে। সাপ ইঁদুরকে কামড়াইতে আসিলেই ইঁদুরটা সাপকে ডিঙ্গাইয়া অপর পার্শ্বে গিয়া পড়ে ও সাপকে দুই এক কামড়ও দেয়। খানিক পরে দেখিলাম ইঁদুরটা এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অল্পক্ষণ পরে মরিয়া গেল। ইঁদুর এরূপ হঠাৎ কেন মরিল, সাপটা ইঁদুরকে কোথায় কামড়াইয়াছে দেখিবার জন্য খাঁচা হইতে ইঁদুরটাকে একটা কাটি দিয়া টানিয়া বাহির করিলাম। চারিদিক নাড়িয়া চাড়িয়া কোথাও কামড়ের দাগ দেখিতে পাইলাম না। তৎপর উহার শরীরের ভিতরের অবস্থা কিরূপ হইয়া গিয়াছে, দেখিবার জন্য পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া উহার দেহ ছেদ করিতে লাগিলাম, সমস্ত চামড়া ছাড়াইলে দেখিতে পাইলাম উহার উরুর নিকট ছুঁচে ফুটানোর ন্যায় কাল দুইটি কামড়ের দাগ আছে। তখন বুঝিলাম এই কামড়েই ইঁদুর মরিয়াছে, সাপটা কিন্তু ভাল করিয়া কামড়াইতে পারে নাই। ইঁদুরের শরীর শক্ত হইয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইঁদুরের পেট চিরিবার সময়ে ছুরির দ্বারা আমার নখের আগা একটু ছড়িয়া যায়, তখন সে বিষয়ে অত মনোযোগ করি নাই কিছুক্ষণ পরে আমার আঙ্গুলটা বড় ব্যথা করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল মাতালের মত টলিয়া পড়িতে লাগিলাম, আমার সঙ্গে আমার একজন বন্ধু ছিলেন তাঁহাকে বলিলাম আমাকে শীঘ্র নিকটস্থ কোন ঔষধালয়ে লইয়া চল, আমায় ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইলে, আমি যাইতে অসম্মত হইলে বা টলিয়া পড়িলে, বা বসিতে বলিলে কোন মতেই ছাড়িবে না আমাকে দাঁড় করাইয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইবে, যাহাতে আমি চলি তাহাই করিবে। ক্রমেই আমি চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম, আমার মাথা টলিয়া পড়িতে লাগিল, আমার বন্ধুকে বলিলাম আর চলিতে পারিতেছি না। আমার বন্ধু অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং আমার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণা হইতে লাগিল, আমাকে টানিয়া হেঁছরিয়া লইতে তাঁহার দয়া হইতে লাগিল, তবে তাঁহার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে বসিতে না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঠেলিতে ঠেলিতে নিকটস্থ এক ঔষধালয়ে লইয়া গেলেন. সেখানকার ঔষধ বিক্রেতা আমাকে শোয়াইয়া কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, সেরূপ করিলে আমার মৃত্যু নিশ্চয় হইত। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার ঔষধের আলমারি হইতে কোন তীব্র ঔষধ বাহির করিয়া তাহার এক গেলাস আমি খাইতে না পারিলেও বল পূর্ব্বক খাওয়াইতে বলিলাম আমার বন্ধু তাহাই করিলেন ও সেই ঘরে আমায় হাঁটাইতে লাগিলেন। সেই ঔষধ আরও দুই তিন বার খাওয়ার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। পর দিবস সমস্ত হাতখানি ফুলিয়া উঠে তারপর তিন সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করি।

এই বিষ কি ভয়ঙ্কর! সামান্য মাত্র বিষ ইঁদুরের দেহে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আমার ছুরির দ্বারা আঙ্গুলে একটু ছড় যাওয়ায় ইঁদুরের রক্ত এক অনুমাত্র আমার শরীরের সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাতেই যমের দুয়ার দেখিয়া আসিলাম।

ইহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র হইলেও অনায়াসে খাইয়া ফেলা যায়। সাপের বিষ গিলিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতিই হয় না। তবে রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইলেই মারাত্মক হয়। সাপ যখনই কামড়ায় তখনই সেই স্থান নির্ভয়ে চুষিয়া ফেলিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। তবে মুখে বা দাঁতের গোড়ার ঘা কিম্বা অন্য কোন ক্ষত থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। ডাক্তার ফেরার মুরগী ও অন্যান্য পক্ষীর শরীরে সাপের বিষ সঞ্চারিত করিয়া বিষের তীব্রতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন সেই বিষে মৃত মুরগীগুলি লইয়া তাঁহার খানসামারা আহার করিত, তাহাদের কিছুই হয় নাই।

সাপকে আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে। কোন সাহেব আমেরিকার "র‍্যাটেল স্নেক্" নামক বিষধর সর্পের পৃষ্ঠে লৌহ সলাকা বিদীর্ণ করিয়া মাটির সহিত গাঁথিয়া রাখেন। সাপ ক্রোধে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সলাকাকে বেষ্টন করিয়া নিজের শরীরে দন্ত প্রবেশ করাইয়া দিল। সেই স্থানটা আঠার ন্যায় বিষে চটচটে হইয়া গেল মুহূর্ত মধ্যে তাহার বেষ্টন শিথিল হইয়া গেল, নিস্পন্দ হইয়া দুই মিনিটের মধ্যে মরিয়া গেল। তাহার মৃত দেহ ছেদ করিয়া দেখা গেল যে, তাহার রক্ত জলের ন্যায় বর্ণ বিহীন হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলে সাপের নিশ্বাসে বিষ থাকে সেটা বড় ভুল কোন সাপের নিশ্বাসেই বিষ থাকে না। সাপের বিষ রক্তে সঞ্চালিত না হইলে কোন ক্ষতিই হয় না।

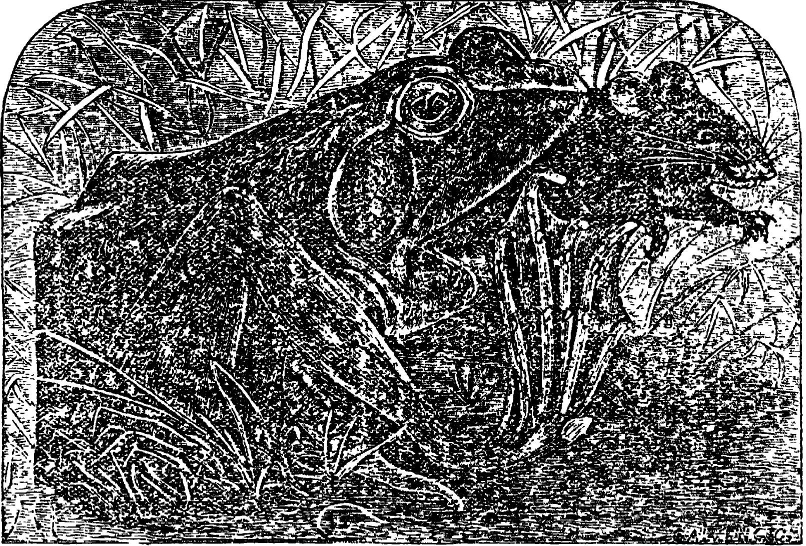
মানুষে সাপকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া নাচায়। সাপও সময়ে সময়ে মানুষকে ও পশুদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে সাপে গোরুর বাঁট হইতে দুধ চুরি করিয়া খায়। কোন বাবুর গোরু দুই বেলাই প্রচুর দুধ দিত। হঠাৎ একদিন বৈকালে দুহিয়া তাহার দুধ পাওয়া গেল না। তাঁহারা মনে করিলেন গোরু যখন মাঠে চরিতেছিল তখন কেহ তাহার দুধ দুহিয়া লইয়া থাকিবে। পর দিবসও বৈকালে দুধ পাওয়া গেল না। তখন চোর ধরিবার জন্য তাঁহারা সতর্ক রহিলেন। বাড়ির নিকটে যে মাঠে গোরু চরিত সেই খানে তাঁহারা লুকাইয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে দেখিতে পাইলেন, গোরুটা মাঠে এক ধারে হইতে অপর ধারে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড সাপ বাহির হইয়া গোরুর পিছনকার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁটে মুখ দিয়া দুধ পান করিতে লাগিল। সাপটা যতক্ষণ দুধ পান করিতেছিল, গোরুটা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল। বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া আসিয়া পরদিন গোরুকে বাঁধিয়া রাখিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোরুটা খুব ছট্ফট্ করিতে লাগিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা গোরুটাকে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া সেই মাঠে সাপকে দুধ খাওয়াইতে গেল।

আমেরিকার মিসূরি প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন কাউন্টি নামক স্থানে কোন গৃহস্থ সপরিবারে

বাস করিত। তাহাদের এক কন্যা ছিল, ক্রমেই তাহার শরীর শীর্ণ হইতেছিল, অবশেষে অস্থিচর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে বাড়িতে আহার করিত না, তাহার পিতা মাতাও কোন ক্রমে তাহাকে বাড়িতে আহার করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেন না। তাহার আহারের সামগ্রী রুটি মাখন বা যাহা কিছু হইত তাহা লইয়া নদীর তীরে যাইত ও তথায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিত। অবশেষে তাহার পিতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস সে নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া খাবার চাহিল। তাহাকে খাবার দেওয়া হইলে সে তাহা লইয়া পুনরায় নদীর ধারে গেল। তাহার পিতা গুপ্তভাবে তাহার পিছনে পিছনে গেলেন। অত্যন্ত শঙ্কার সহিত দেখিলেন একটি প্রকাণ্ড সর্প তাঁহার কন্যার ক্রোড়ে মুখ বাড়াইয়া তাহার হাত হইতে রুটি ও মাখন খাইতেছে। কন্যা নিজে খাইবার চেষ্টা করিলেই সাপটা ফোঁস ফোঁস করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে, আর কন্যা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ সাপকেই সব খাইতে দেয়। পিতা ভয়ে স্পন্দহীন হইয়া অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাপ সেই শব্দ শুনিয়া বনের মধ্যে পলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কন্যা পিতার কোন কথার উত্তর দিতে সম্মত হইল না অথবা উত্তর দিতে পারিল না। তৎপরে গৃহের সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ করিল যে, পর দিবস ও কন্যাকে নদীর ধারে যাইতে দেওয়া হইবে তাহা হইলে সাপ খাবার লোভে বাহির হইবে এবং সেই সুযোগে তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইবে। পরদিবস কন্যা খাবার লইয়া নদীর ধারে গেল, যেই সাপটা বাহির হইল অমনি কন্যার পিতা তাহার মাথায় গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। কন্যা তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও বারে বারে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, অবশেষে দুই দিবসের মধ্যে সেও মরিয়া গেল।

সখা । এপ্রিল ১৮৯০ । পৃ. ৫৩-৫৮

কোলা ব্যাঙ



উপরে যে ছবি দেখিতেছ ইহা একটী রাক্ষস বিশেষের ছবি। ওটা একপ্রকার গায়ক জাতীয়। ইহারা বর্ষার গায়ক। ইহাদের মধুর কণ্ঠস্বরে কোকিল লজ্জা পায় তাই ইহারা যখন গান করে তখন কোকিলেরা চুপ করিয়া থাকে, বড় একটা শব্দ করে না। ইহারা জলেও থাকে স্থলেও থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা রাক্ষস। জীবের প্রাণ সংহার করাই ইহাদের প্রকৃতি। এমন অসচ্চরিত্র হইলেও চিত্রকর ও প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহার সংসর্গ ভালবাসে। প্রাণিতত্ত্ববিদের মধ্যে একজন ইহাদের একটা পুষিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহাকে একটা কাঁচের বাক্সে ২১ দিন অনাহারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; তার পর ইহার ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া গোটা পঁচিশ বড় বড় মাছি ধরিয়া সেই বাক্সের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। পেটুক ছেলেরা যেমন টপা টপ্ রসগোল্লা গিলে ফেলে ব্যাংটাও জিব বাহির করিয়া একে একে টপা টপ্ সব গিলিয়া ফেলিল। তার পর দিন ১৫টা মাছি, ২টা গুবরে পোকা

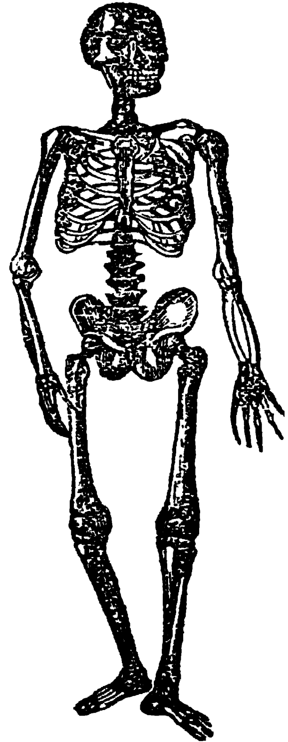
ও দুটা ছোট কাঁকড়া গিলিয়া ফেলিল। ইনি আবার মরা জিনিস খাইতেন না। মাংসের টুকরা প্রথমতঃ ছুঁইতও না, পরে সেগুলিকে পোকার মত সরু সরু লম্বা করিয়া কাটিয়া সূতায় বাঁধিয়া তার মুখের কাছে নাড়িলে জীবন্ত পোকা মনে করিয়া টপ্ করিয়া ধরিয়া গিলিয়া ফেলিত। মুখের হাঁ'টার মধ্যে যাহা আঁটে তাহাই খায় এমন কি নিজের বাচ্চাদের ধরিয়া খাইতেও বাধা নাই। একবার আমি একটা মরা ইঁদুর সূতায় বাঁধিয়া তাহার বাক্সের ভিতর নাড়িতেছিলাম ব্যাংটা খপ করিয়া ইঁদুরটাকে গিলিয়া ফেলিল। গিলিয়াই বুঝিল মরা ইঁদুর দ্বারা সে প্রতারিত হইয়াছে অমনি হাঁ করিয়া মুখের ভিতর সম্মুখের পা ঢুকাইয়া দিয়া ইঁদুরটাকে বাহির করিয়া ফেলিল। তার পর দিন হইতে তাহার বাক্সের ভিতর জীবন্ত ইঁদুর ছাড়িয়া দিতাম। সব সময়েই ইঁদুরের পিছন দিক্‌টা হইতে আরম্ভ করিয়া সবটা গিলিত। ইঁদুরের সহিত খুব যুদ্ধ করিতে হইত। ইঁদুরও মাঝে মাঝে খুব কামড়াইয়া দিত। অবশেষে পরাস্ত হইত। সেই বাক্সের নীচে একটু জল রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইঁদুরকে ধরিয়াই সেই জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিত। ইঁদুর নিশ্বাস না ফেলিতে পাইয়া মৃতপ্রায় হইত। ব্যাং এই অবসরে গিলিবার সুবিধা পাইত। এক দিবস আর জল দিলাম না। সে দিন যুদ্ধই কিছু ঘোরতর ও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। ব্যাং জলে চুবাইয়া মারিবার সুবিধা পায় নাই। ইঁদুরের পিছন দিকটা গিলিলেও ইঁদুর ব্যাং-এর হাতে খুব কামড়াইতেছিল। ব্যাং শেষে অন্য উপায় না পাইয়া দুই হাতে ইঁদুরের গলা খুব জোরে টিপিয়া ধরিল, সেই টিপনের চোটে ইঁদুরের চোখ বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাং তারপর সহজেই ইঁদুরটাকে গিলিয়া ফেলিল।

সখা । মে ১৮৯০ । পৃ. ৬০-৬৯

শরীর

মুখবন্ধ

আমাদের যে একটা রক্ত মাংস হাড়ের "শরীর" আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। অপর পক্ষে চিন্তা করে ও অনুভব করে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় না—এরূপ যে একটা "মন" আমাদের আছে, তাহাও কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। শরীরের কোন কোন অংশ, (যেমন বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি) আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া আপনা আপনি নড়িতে থাকিলেও 'মন' ইচ্ছা করিলেই শরীরের নানা অংশকে নড়াইতে পারে। ঠিক আমাদের মত শরীর-যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরও যে মন আছে, এবং তাহারা কি কি চিন্তা করিতেছে ও কি কি অনুভব করিতেছে, তাহা তাহাদের শব্দ ও অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের এই শরীর ও মন সম্বন্ধে যদি আমরা একটু বিশেষ ভাবে দেখি, তবে এই বুঝিতে পারি যে, মনটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বেসর্ব্বা।



এই যে আমরা—তা ত কেবল আমরা যা অনুভব করছি যা চিন্তা করছি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা দেখছি শুনছি, যুক্তি তর্ক করে যা সিদ্ধান্ত করছি যা জান্‌ছি ও যা ইচ্ছা করছি—এই সব নিয়েই ত 'আমরা' বলিতে পাচ্ছি। এ সব অর্থাৎ "মন" যদি না থাক্‌ত, তবে 'আমি' বা কোথায় থাকত আর 'তুমি'ই বা কোথায় থাকতে। আমরা যে কথা বলি, তা কি? তা তো কেবল আমরা যা চিন্তা করিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, 'মনটা সেইগুলিকে ভাষায় বা কতকগুলি শব্দে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই মুখফুটে উচ্চারণ

করিয়ে, প্রকাশ করে বই ত নয়? আর ইচ্ছাপূর্বক যা করি তা কি? 'মন' আগে থেকে যে একটা অভিসন্ধি এঁটে রেখেছিল, তাহাই সিদ্ধ বা সম্পন্ন করিল বই ত নয়।

মনটাই শ্রেষ্ঠ হউক আর সর্ব্বেসর্ব্বাই হউক, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি শরীরের অঙ্গ বা অবয়ব ভিন্ন আমরা কোন বিষয়ই জানিতে পারি না; আর শরীরের গতি বা অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মনের ইচ্ছা পূর্ণ বা অভিপ্রায় ব্যক্তও করিতে পারি না। তার পর, শারীরিক অঙ্গের মধ্যে 'মস্তিষ্ক' ব্যতিরেকে যে চিন্তা, তর্ক বা কল্পনা করিতে, আশা ও ভয়, সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না, তাহা বিশ্বাসেরও যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাতেও এই বুঝি যে, উন্মাদ প্রভৃতি মস্তিষ্ক রোগে, অথবা রক্তের দোষে মস্তিষ্কের সাময়িক অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় বুদ্ধি শুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। মদ্য পানে লোক যখন মাতাল হয়, তখন দূষিত রক্ত মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় বলিয়া, মনের বিকৃতি বা বিক্ষোভ জন্মে। জ্বর রোগে রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে।

শরীরের অসুস্থতাতে যেমন মনের বিকৃতি ঘটে, সেইরূপ আবার মনের অসুস্থতাতে শরীরের বিকৃতি ঘটে। দুঃসম্বাদ পাইয়া অনেকে মূর্চ্ছা যায়, কেহ কেহ মরিয়াও গিয়াছে। অনেক ভাবনা চিন্তায় সুনিদ্রার ব্যাঘাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

মনের সঙ্গে যখন শরীরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন মনটাকে ভাল রাখিবার জন্য শরীরটাকে কার্য্যক্ষম অর্থাৎ সুস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। আর নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত যদি আমাদের পরিচয় থাকে—তাহাদের গঠনপ্রণালী ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ,—কোন্ কোন্ জিনিস উপকারী ও কোন্ কোন্ জিনিস অপকারী, তাহা জানিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অনেকটা সহজ হয়। তা ছাড়া, একশত বৎসর না হউক, অন্ততঃ মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত যে শরীরটা বহিয়া বেড়াইতে হইবে বা যাহা লইয়া 'ঘর-কন্না' করিতে হইবে, তাহার বিষয় কি কিছুই জানা উচিত নয়? অর্থাৎ শরীরের ভূগোল-বিবরণটা একটু আধটু জানা বড়ই দরকার।

শরীরকে মোটামুটি দুই মহাভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ—শরীরের যে যে অংশ বা অবয়ব দ্বারা জ্ঞান লাভ ও গতিবিধি করা যায়, তাহাকে "জ্ঞান লাভ ও গতিবিধির যন্ত্র" বলা যায়; ইহারা মনের সহিত বাহিরের বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করে। দ্বিতীয়তঃ—আর অন্য যে যে অংশ শরীরকে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম করিয়া রাখে তাহাকে "সংস্কারক যন্ত্র" বলা যায়।

বল ব্যতীত কোন কার্য্যই করা যায় না। শরীরের দ্বারা যে সব কার্য্য করি, তাহা করিবার বল বা জোর কোথা হইতে আইসে? মন ইচ্ছাই করিতে পারে, শরীরে বল ত আর দিতে পারে না। কেহ যদি বহু দিবস রোগে শয্যাগত থাকে, গায়ে একটুও জোর না থাকে, তবে 'মন' সহস্র ইচ্ছা করিলেও কি সে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে?

কয়লা পুড়িয়া উত্তাপ হয়, সেই উত্তাপে যেমন বাষ্পীয় কলে বলের সঞ্চার হয়, তেমনি আমাদের শরীরের উপাদান সকল ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া (কয়লা পোড়ার মত) শরীরের উত্তাপ ও বল বিধান করে। কলের মত আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলিও সর্ব্বদা পরিচালনায় ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেগুলিকে কার্য্যকরী অবস্থায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা মেরামত করা চাই। শরীরেব যন্ত্রগুলির জীর্ণ সংস্কারের জন্য শরীরেই মেরামতের দোকান আছে। এই মেরামতের জন্য সর্ব্বদা শরীরের উপযোগী নূতন নূতন উপাদান সামগ্রীর আবশ্যক। এই সংস্কার সামগ্রী ও সংস্কার কার্য্যে যে 'কাঠ খড়ের' আবশ্যক, তাহা আমরা উদ্ভিদ হইতে গ্রহণ করি;— মাছ, মাংস, দুধ, ঘি ইত্যাদি যাহাই খাই সবই উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে— কারণ মাছ, ছাগ, গরু প্রভৃতিরা উদ্ভিদ আহার করিয়া সেই উদ্ভিদকে নিজ শরীরের রক্ত মাংস ও দুধে পরিণত করিয়াছিল, আমরা সেই দুধ ও মাংস খাই।

এইরূপে দেহের যে যে অংশ প্রত্যক্ষ ভাবে মনের কার্য্যের সহায়তা করে, তাহাকে 'মানসিক দেহের যন্ত্র' বলা যাইতে পারে। ইহার প্রধান অঙ্গ (১) 'স্নায়ুমণ্ডল' (যথা— মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডের মজ্জা; ও সূত্রবৎ স্নায়ু সকল)। (২) চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি— 'ইন্দ্রিয়' সকল। (৩) 'মাংসপেশী'—ইহাদের আকুঞ্চনে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের গতি উৎপন্ন হয়। (৪) 'কঙ্কাল' বা অস্থিপঞ্জর (শরীরের অস্থিসমূহ)—ইহা স্নায়ুমণ্ডলের প্রধান অঙ্গগুলিকে (মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডের মজ্জা) কঠিন আবরণে আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, এবং মাংসপেশীর কার্য্য করণের প্রধান অবলম্বন ও সহায়।

পক্ষান্তরে দেহের যে যে অংশের সাহায্যে আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাহাদিগকে "জৈব-শরীর" (জীবন সম্বন্ধীয় শরীর) বলা যাইতে পারে। ইহারা মধ্য শরীরের দুই গহ্বরে—বক্ষঃস্থল ও উদরে—সংস্থাপিত। ইহার অঙ্গগুলি—(১) 'গ্রহণী' ভুক্তদ্রব্য গ্রহণ করে বলিয়া (অন্ননালী, পাকস্থলী, অন্ত্র) খাদ্য দ্রব্য উদরসাৎ করিয়া পাকস্থলীতে জীর্ণ করিয়া শরীরে প্রবেশোপযোগী করিয়া দেয়। (২) খাদ্য 'পরিশোষক যন্ত্রে' পরিপক্ক বা জীর্ণ অন্ন শোষণ করিয়া লইয়া তাহাকে রক্তে পরিণত হইবার উপযোগী করিয়া দেয়। (৩) রক্ত 'পরিচালক' যন্ত্রে (হৃৎপিণ্ড, শিরা ও নাড়ী) সর্ব্বাঙ্গে রক্ত পরিচালিত করিয়া সংশোধন বা পরিষ্কার করিবার জন্য ফুসফুসেতে লইয়া আইসে। (৪) 'শ্বাস যন্ত্রে ফুসফুসেতে রক্তের সহিত নিশ্বাস বায়ু (অম্লজান) মিশ্রিত করিয়া রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। (৫) 'সংস্কার যন্ত্রে' (যকৃৎ, বৃক্ক, চর্ম্ম) শরীরে যে সকল দ্রব্য কোন কাজে লাগে না, অর্থাৎ শরীরের অসার ভাগ, মলা বা আবর্জ্জনা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সকল যন্ত্রের কার্য আপনা আপনিই হইতে থাকে, 'মনের' আদেশ বা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে না।

সখা। জুলাই ১৮৯১। পৃ. ৯৮-১০১

শরীরের গঠন ও অস্থি বিবরণ

শরীরকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— (১) মস্তক বা মুণ্ড, (২) মধ্যশরীর, (৩) শাখা—(হস্ত পদ)। মস্তকের দুই অংশ—একাংশ মূর্দ্ধা বা শিরোদেশ, অপরাংশ মুখ মণ্ডল। মধ্য শরীরের বক্ষঃস্থল ও উদর এই দুই বিভাগ। হস্ত ও পদ শরীরের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া থাকে।

সমস্ত শরীরটার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে শরীরটা লম্বার্দ্ধে অনুরূপ—অর্থাৎ যদি মাথার মাঝখান হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূদুটার মধ্য দিয়া নাকের উপর দিয়া, বুক ও পিঠের মাঝ দিয়া সমস্ত শরীরটাকে একটা বড় ছোরা দিয়া লম্বা লম্বি চিরিয়া দুই খণ্ড করা যায়, তবে এক অর্দ্ধ দেখিতে ঠিক অপর অর্দ্ধের অনুরূপ হইবে।

নরদেহের বিষয় শিখিবার সুবিধার জন্য, দেহের যন্ত্রগুলিকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা ঃ—

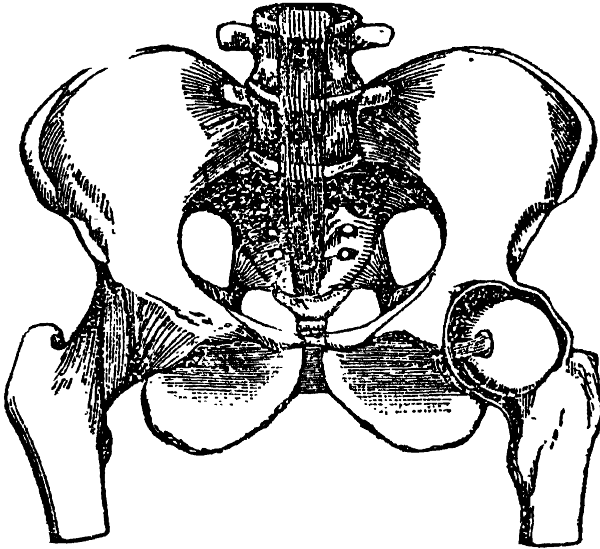
১। অস্থিমণ্ডল বা কঙ্কাল।
২। (মাংস) পেশী মণ্ডল।
৩। পরিপাক প্রণালী।
৪। (রস) শোধন প্রণালী।
৫। (রক্ত) সঞ্চালন প্রণালী।
৬। শ্বাস প্রণালী।
৭। সংস্কার বা শোধন প্রণালী।
৮। স্নায়ু মণ্ডল।

একে একে এই প্রত্যেক বিভাগের বিষয় কিছু কিছু শিখিলে আমরা দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

শরীরের অস্থিমণ্ডলে দুই শতেরও অধিক অস্থিখণ্ড আছে। এই অস্থি খণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে সংযুক্ত যে সংযোগ স্থলে অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত একেবারে মিশিয়া যায় নাই। সংযোগ স্থলে গ্রন্থি বা গাঁইট আছে। গাঁইটগুলি এরূপে গঠিত যে হাড়গুলিকে সন্ধি স্থলে কব্জার মত সহজেই এধারে ও ধারে ঘুরাণ ফিরান যায়। সন্ধিস্থলে অস্থিগুলি শ্বেত সূত্রময় পদার্থের রজ্জুর ন্যায় বন্ধনীর দ্বারা পরস্পরের সহিত এত দৃঢ় বদ্ধ যে খুব জোর করিয়া এই দড়ির মত শক্ত মাংসের বন্ধনী ছিঁড়িয়া ফেলিতে না পারিলে এক অস্থিখণ্ডকে অপর খণ্ড হইতে সহজে বিযুক্ত করা যায় না।

শরীরের নানা স্থানে অস্থির সন্ধি স্থলে কব্জা আছে। কুচ্‌কি বা উরুর কব্জা, হাতে কব্জা, পায়ে কব্জা, আঙ্গুলে কব্জা, পিঠের দাঁড়ার প্রত্যেক অস্থির মধ্যে কব্জা, মাথাও ঘাড়ের হাড়ের মধ্যে কব্জা—এই সকল কব্জা থাকাতেই হাত পা নাড়িতে পারি ও শরীরকে ইচ্ছামত নানা দিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি!

শরীরের যেখানে অস্থি কোমল ও স্থিতি স্থাপক হওয়া আবশ্যক তথায় অস্থির পরিবর্ত্তে উপাস্থি (কোমল অস্থি) আছে। যেমন কান, নাসিকার অগ্রভাগ ও শ্বাস নালী।



অস্থি খণ্ডগুলির একত্র সংযোগে শরীরের কোমলাংশের রক্ষণোপযোগী দৃঢ় কাঠাম বা ঠাট গঠিত। হাড়ের এই কাঠাম বা ফ্রেম'কে অস্থি পঞ্জর বা "কঙ্কাল" বলে।

কঙ্কালের প্রধান অংশ 'মেরুদণ্ড'. কশেরু বা পিঠের শিরদাঁড়া। ইহা ঘাড়ের উপর বা মাথার নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া পাছা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরুদণ্ড তেত্রিশটি (৩৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডের সংযোগে গঠিত বলিয়া উল্লিখিত হয়।

মাথার নিম্ন হইতে কোমরের শেষ পর্য্যন্ত এই অংশে চব্বিশখানি (২৪) বিভিন্ন অস্থিখণ্ড আছে ইহাদিগকে 'কশেরুকাস্থি' বা 'মেরুদণ্ডের অস্থি' বলে। এই অস্থিখণ্ডের সবগুলাই দেখিতে প্রায় একরূপ। ইহাদের আকৃতি—অর্দ্ধ বৃত্তাকার নিরেট অথচ চ্যাপ্‌টা দেহ; তাহার দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি ছোট হাড় বাহির হইয়া বক্রভাবে মিশিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় হইয়াছে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া 'কশেরুকাস্থি' বা 'মেরুদণ্ডের মজ্জা গমন করে। এই অঙ্গুরীর সম্মুখে একটা ও দুই পার্শ্বে দুইটা বাহু নির্গত হইয়াছে। এই দুই

বাহুর নিকট হইতে উপরের দিকে দুইটি ও নীচের দিকে দুইটি করিয়া ছোট ছোট চাক্‌তি বাহির হইয়া থাকে। এক কষেরুকাস্থির নীচের দিকের চাক্‌তি দু'টার সহিত অপর অস্থির উপরের দিকের চাক্‌তি দু'টার দৃঢ় যোগ; এইরূপ ভাবে উপর্য্যুপরি ২৪ খানি কশেরুকাস্থির সংযোগে 'মেরুদণ্ড' গঠিত। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে এক এক খানি ক্ষুদ্র উপাস্থি ও সূত্রবৎ বন্ধনী সকল আছে। এই উপাস্থিগুলি কোমল ও স্থিতিস্থাপক বলিয়া গাড়ির স্প্রিং-এর মত কায করে। অর্থাৎ লাফ ঝাঁপ করিলে বা জোরে মাটিতে পা ফেলিলেও সমস্ত শরীর ভয়ানক ঝাঁকি ও ঝাঁকড়ানি লাগে না। এই উপাস্থিগুলি না থাকিলে অত্যন্ত ঝাঁকি লাগিত। বন্ধনী দ্বারা অস্থিগুলি এত দৃঢ় সংবদ্ধ যে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। একটা অন্যটার সহিত দৃঢ় রূপে সংযুক্ত থাকিলেও অল্পপরিমাণে এধারে ওধারে বাঁকাইতে পারা যায়।

গ্রীবা বা ঘাড়ে ৭টী 'কষেরুকাস্থি' আছে। মেরুদণ্ডের অন্য অংশ অপেক্ষা এই অংশের অস্থিগুলিকে অধিক পরিমাণে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইহাদের প্রথম দুইটি একটু ভিন্ন ভাবে গঠিত; এই দুই অস্থির সহিত মাথাটা এক বিশেষ ধরণের কব্জায় আবদ্ধ। এই কব্জা এরূপ ভাবে গঠিত যে মাথাটাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে হেলান যায় এবং একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে মাথাটাকে ঘুরাণ যায়।

পৃষ্ঠদেশে ১২টি কষেরুকাস্থি আছে। ইহার প্রত্যেকটির সহিত এক এক যোড়া পাঁজরাব হাড় সংযুক্ত আছে। কষেরুকাস্থির পার্শ্বদেশের বাহুদ্বয়ের নিকট হইতে দুই ধার দিয়া দুইখানি সরু হাড় ধনুকের মত বাঁকিয়া আসিয়া সম্মুখে বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই বার যোড়া পাঁজরার হাড়ের শেষের বা নীচের দুই যোড়া বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত নহে। প্রথম সাত যোড়ার প্রত্যেকটাই পৃথকভাবে বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত। অষ্টম, নবম ও দশম যোড়া বুকের হাড়ের সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই তিন যোড়ার অগ্রভাগ একত্র মিশিয়া পরে বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ যোড়া বুকের হাড় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। এই পাঁজরার হাড়গুলি পিঠের ও বুকের হাড়ের সহিত মিশিয়া বুকের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করিবার সুন্দর আধার গঠিত করিয়াছে। পাঁজরার হাড়গুলি ঠিক সমভাবে না থাকিয়া নীচের দিকে একটু হেলান। এই হেলানের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে যখন পাঁজরার হাড়গুলি উঠে নামে তখন বুকের আয়তনও বাড়ে কমে।

পাঁজরার প্রথম হাড়ের উপর ও বুকের হাড়ের সহিত কাঁধের হাড় সংযুক্ত। স্কন্ধদেশে উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া হাড় আছে। একটি সম্মুখদিকের 'কণ্ঠাস্থি'। গলার নীচে হাত দিয়া বুকের খোলের যে প্রথম হাড়টা ধরিতে পাই সেটাই কণ্ঠাস্থি। কাঁধের পিছন দিকের চ্যাপ্‌টা বড় হাড়কে 'অংশফলক' বলে। 'অংশফলক' এবং 'কণ্ঠাস্থি'র সহিত বাহুর সংযোগে 'কক্ষসন্ধি' গঠিত হইয়াছে।

কোমর বা 'কটিশীর্ষে' ৫টি বিভিন্ন 'কষেরুকাস্থি' আছে! মেরুদণ্ডের শেষভাগের অর্থাৎ কোমরের নীচে পাছার মাঝখানের হাড়কে 'ত্রিকাস্থি' কহে। পাঁচটি 'কশেরুকাস্থি' পরস্পরের সহিত দৃঢ় সংযোগে একীভূত হইয়া যাওয়ায় ত্রিভুজের আকারে এই 'ত্রিকাস্থি' গঠিত। ত্রিকাস্থির কষেরুকাস্থিগুলিকে পৃথক করা যায় না। 'ত্রিকাস্থির' দুই পার্শ্বে দুই খানি অস্থিফলক দৃঢ়রূপে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাদিগকে পাছার হাড়, কটিপার্শ্বের অস্থি বা 'কটিফলক' বলা যায়। বাহুদ্বয় যেমন স্কন্ধফলকের সহিত কব্জায় আবদ্ধ, পদদ্বয় ও সেইরূপ 'কটিফলকের' সহিত কব্জার আবদ্ধ। 'ত্রিকাস্থির' সহিত 'কটিফলক' দ্বয়ের সংযোগে তলপেট বা 'বস্তিগহ্বর' গঠিত হইয়াছে। 'বস্তিগহ্বরে' তলপেটের যন্ত্রগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে। নিম্নে বস্থিগহ্বরের চিত্র দেখ। মধ্যে 'ত্রিকাস্থি' দুই পার্শ্বে 'কটিফলক' ও তাহার সহিত উরুর হাড় সংযুক্ত রহিয়াছে। ত্রিকাস্থির নীচে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কশেরুকাস্থির ঐরূপ সংমিশ্রণে আর একটি ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড আছে তাহাকে 'শিফা, (শিকড়) বা লেজ বলা যাইতে পারে। ঐ অস্থির উপাদানগুলি সংখ্যায় অধিক এবং বৃহৎ ও পৃথক ভাবে থাকিয়া পশুদিগের লেজ গঠিত হয়। মানুষের লেজ নাই। লেজের চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে।

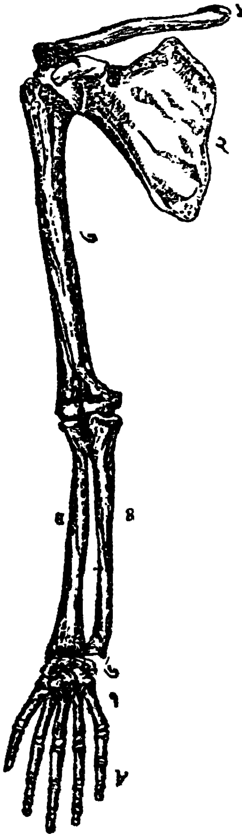
মস্তক মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত। মস্তকের তলদেশে বড় গোল ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র দিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত মজ্জার সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মস্তকের দুই বিভাগ শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল। শিরোদেশ মস্তিষ্ক রক্ষার আধার। শিরোস্থির মুখ প্রদেশে দুইটি গহ্বর আছে ইহাদিগকে 'অক্ষিকোটর' বলে। এই দুই গহ্বরের মধ্যে নাসিকাবিবর রহিয়াছে। ইহার এক ছিদ্র সম্মুখে অপর ছিদ্র মুখের ভিতর গলার কাছে। 'মুখ বিবর' তালু ও নীচের চোয়ালের মধ্যে। মুখ বিবরে জিহ্বা স্থাপিত। শিরোদেশের দুই পার্শ্বের হাড়ের ভিতরের ছিদ্রকে 'কর্ণকুহর' বলে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে মস্তিষ্ক এবং শ্বাসনালী ও অন্ননালীর মধ্যস্থলে মুখ মণ্ডলেই ইন্দ্রিয় সকলের আড্ডা।

মাথায় অনেকগুলি হাড় আছে, সে হাড়গুলিতে করাতের আগার মত খাঁজ কাটা আছে। হাড়গুলি সব খাঁজে খাঁজে বসান, কাজেই নাড়া চাড়া যায় না। মাথার হাড়ের যোড়গুলি এত কঠিন যে লাঠি মারিয়া হয়ত হাড় ফাটাইয়া দিতে পারা যায় তবুও যোড় খসান বড় কঠিন। মুণ্ডটা যেন গোলাকার একটি হাড়, তাহার সহিত নীচের চোয়াল কানের কাছে কব্জায় আবদ্ধ। এই কব্জার জন্য নীচের চোয়াল বা থুত্নি নামাইয়া মুখব্যাদন বা 'হা' করিতে পারি। শিরোদেশে অনেক হাড় আছে তন্মধ্যে, কপালের হাড় একটি, মুর্দ্ধার দুই পাশে দুইটি হাড়, কানের উপর দুই পাশে দুইটি হাড়। এই হাড়কে ইংরাজিতে কালাস্থি বা জরাস্থি বলে। কারণ কাল বা জরা এই খানেই প্রথমে নিজের প্রভুত্ব দেখায়, অর্থাৎ কানের পার্শ্বের চুলগুলি সর্ব্বাগ্রে পাকে বা সাদা হয়। চোখের নীচে উঁচু উঁচু গালের দুটা হাড়। ইহাদিগকে 'হনু' বলে। নাকের নীচে উপরের চোয়ালের একটি হাড়। ইহাতে উপরের দাঁতের পাটি বসান। নীচের দাঁতের পাটি বসান আছে। মস্তকের এই প্রধান প্রধান অস্থিখণ্ড।

সখা । সেপ্টেম্বর ১৮৯১ । পৃ. ১৩৫-১৩৯

শাখা—হস্ত ও পদ

শরীরের শাখা—হস্ত ও পদ। ঊর্দ্ধশাখা—হস্তের পাঁচ বিভাগ, যথা—(১) স্কন্ধ; (২) প্রগণ্ড বা ঊর্দ্ধবাহু; (৩) প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহু; (৪) মণিবন্ধ (৫) হস্ততল। হস্তের অস্থিগুলি নিম্নরূপে বিভক্ত করা হয়।—

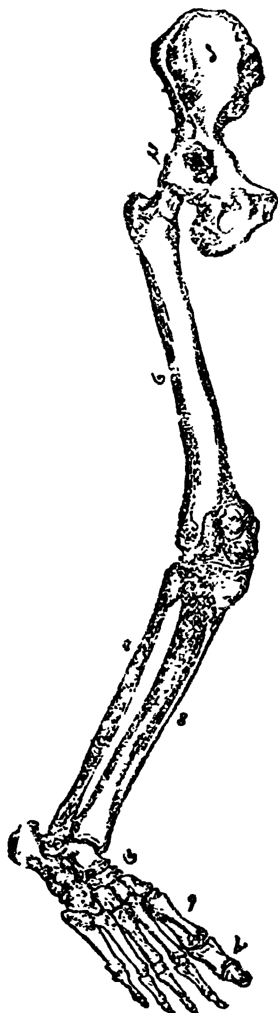


কণ্ঠাস্থি[১] ও অংশফলক[২] এই দুই-এর একত্রে স্কন্ধদেশ গঠিত। প্রগণ্ড[৩] বা ঊর্দ্ধবাহুতে একটি অস্থি। প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুতে দুইটি—'বৃদ্ধাঙ্গুলিরদিগের অস্থি[৫] ও 'কনিষ্ঠাঙ্গুলিরদিগের অস্থি[৪]। মণিবন্ধের[৬] ৮ খানি হাড়। হস্ততলের[৭] ৫ খানি হাড়। অঙ্গুলির[৮] হাড়।

কণ্ঠাস্থির একদিক বুকের হাড়ের উপরের দিকে এবং অপরদিক স্কন্ধফলকের সহিত কব্জায় আবদ্ধ। কণ্ঠাস্থি স্কন্ধদেশকে ঠেলিয়া রাখে। কুকুর ও বিড়ালের কণ্ঠাস্থি নাম মাত্র রহিয়াছে; বানর কাঠবিড়াল প্রভৃতি যে সকল জন্তুরা গাছে উঠে তাঁহাদের কণ্ঠাস্থি বড় হয়। অংসফলক ত্রিভুজাকার। সম্মুখের দিক মসৃণ ও গর্ত্ত এবং বুকের পশ্চাদ্দিকের গোলভাগের উপর খুব সহজেই সরিয়া বেড়ায়। অংসফলকের উপরদিকে বাটির ন্যায় একটা গর্ত্ত আছে। প্রগণ্ডের হাড়ের উপরের দিকের গোল মাথাটা বসিয়া যায়। এইরূপে কব্জায় হাড় অধিকদূর ও চারিদিকে ঘুরান ফিরান যায়।

প্রগণ্ডের হাড় খুব শক্ত। এই লম্বা হাড়ের দুইদিকের শেষভাগ বর্ত্তুলাকার। ইহার উপরের মাথাটা অংসফলকের গহ্বরে

প্রবিষ্ট। গহ্বর হইতে হাড়টা সহজে খসিয়া না আইসে এই জন্য অংসফলকের গহ্বরের নিকট হইতে দুইখানি সরু বক্র হাড় হাতের মাথার গোল অংশকে ধরিয়া রাখে। এই জন্য হাতে করিয়া খুব ভারি বস্তু টানিলে বা উঠাইলে স্কন্ধ হইতে হাত বিযুক্ত হইয়া যায় না।



প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুর দুই হাড়। কড়ে আঙ্গুলের দিগের হাড়ের উপরদিকটা স্থূল এবং প্রগণ্ডের হাড়ের সহিত কবাটের কব্জার মত কব্জায় আবদ্ধ অর্থাৎ এই কব্জা দরজার একদিকেই খুলে বা বন্ধ হয়, অপরদিকে বাঁকান যায় না। পশ্চাৎ বা উল্টাদিকে হাত বাঁকান যায় না। বুড় আঙ্গুলের দিগের হাড় উপরদিকে সরু এবং গর্ত্তযুক্ত—এই গর্ত্ত প্রগণ্ডের হাড়ের শেষভাগের গোল মাথাটাকে ধরিয়া রাখে। ইহার নীচের অংশ মণিবন্ধের হাড়ের সহিত সংযুক্ত। হাড়ের তলা উপরদিকে করিয়া যদি হাতটাকে একটা টেবিলের উপর রাখি তবে প্রকোষ্ঠের দুই হাড় পাশাপাশি থাকে। তারপর যদি হাতটা ঘুরাইয়া হাতের পিঠটা উপরদিকে আনি তবে দেখিতে পাইব যে কড়ে আঙ্গুলেরদিগের হাড়টা সরিয়া যায় নাই, কেবল বুড় আঙ্গুলেরদিগের হাড়ের শেষ অংশটা ঐ হাড়ের উপর দিয়া এড়োভাবে গিয়া হাতটাকে উল্টাইয়া দিয়াছে। মণিবন্ধে দুই সারিতে ৪ খানি করিয়া আটখানি ছোট ছোট হাড় আছে। এই হাড়গুলি পরস্পরের ও নিকটস্থ অন্যান্য হাড়ের সহিত বন্ধনির দ্বারা আবদ্ধ। হস্ততলে সরু সরু লম্বা লম্বা ৫টা হাড় আছে, হাতের তেলো টিপিলে এই হাড়গুলি টের পাওয়া যায়। অন্যান্য অঙ্গুলি অপেক্ষা বৃদ্ধাঙ্গুলি অধিক ঘুরাণ যায়। ঘুরাইয়া অন্যান্য অঙ্গুলির উপর আনা যায় বলিয়া আমরা মুষ্টিবন্ধ করিয়া ধরিতে এবং ক্ষুদ্র দ্রব্য খুঁটিয়া লইতে পারি। অঙ্গুলির হাড়গুলি 'হস্ততলের' হাড়গুলির সহিত সংযুক্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলির দুইটি ও

অন্যান্য অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া হাড় আছে। প্রত্যেক হাতে অঙ্গুলিতে চৌদ্দটি করিয়া হাড় আছে।

নিম্নশাখা বা পদের হস্তগুলি এইরূপে বিভক্ত ঃ—

বস্তির হাড়, উরুর হাড়, হাঁটুর (কব্জার) হাড়, জঙ্ঘার বড় ও ছোট দুই হাড়, গুল্‌ফ বা পায়ের কব্জার হাড়, পায়ের পাতার হাড়, আঙ্গুলের হাড়, পায়ের আঙ্গুলের হাড়। বস্তির দুই কটিপার্শ্বের হাড়ের[১] নীচেরদিকে বাটির মত গর্ত্ত[২] আছে। সেই গহ্বরে উরুর হাড়ের গোল অগ্রভাগ[২] প্রবিষ্ট থাকিয়া কব্জার মত কার্য করে। উরুর হাড়[৩] প্রগণ্ডের হাড়ের সদৃশ; দেখিতেও অনেকটা উহারই মত, তবে সমস্ত শরীরের ভার বহন করিতে হয় বলিয়া অধিকতর বড় ও দৃঢ়। উরুসন্ধির কব্জা ঠিক কক্ষসন্ধির অনুরূপ। তাতে সমস্ত হাতটা যতদূর পর্যন্ত ঘুরাণ ফিরান যায় পা ততদূর যায় না।

প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুর ন্যায় জঙ্ঘাতে দুইটি হাড়[৪, ৫] আছে। এই দুই হাড় প্রকোষ্ঠের হাড়ের সদৃশ কিন্তু কড়ে আঙ্গুলিরদিকের হাড়ের উপরে যেমন বুড় আঙ্গুলেরদিগের হাড় আনা যায়, জঙ্ঘায় সেরূপ কিছু করা যায় না। ছোট হাড়খানি খুব সরু এবং বড় হাড়খানির সহিত উপরে ও নীচে উভয়দিকে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত। উরুর হাড়ের সহিত জঙ্ঘার বড় হাড় কব্জায় আবদ্ধ। এ কব্জা উরু বা কুচ্‌কির কব্জাব মত নহে। দরজার কব্জার মত একইদিকে ভাঙ্গা যায়। হাঁটুর কব্জা কুনুই-এর কব্জার অনুরূপ। হাঁটুর সম্মুখে একটা ছোট চাক্‌তির মত হাড়[৯] আছে; কুনুইতে ওরূপ হাড় নাই।

গুল্‌ফ বা পায়ের কব্জায় ৭ খানি হাড় আছে। ইহাদের মধ্যে একখানি খুব বড় এবং পশ্চাৎদিকে বাহির হইয়া পড়িয়া পায়ের গোড়ালি গঠিত করিয়াছে। পায়ের পাতার হাড়[৪] হাতের পাতার হাড়ের অনুরূপ। ইহাদের সংখ্যা ৫টি ও প্রত্যেকটি এক একটি অঙ্গুলির হাড়ের সহিত সংযুক্ত।

পায়ের আঙ্গুলের হাড়[৮] ঠিক হাতের আঙ্গুলের হাড়ের অনুরূপ। হাতের বুড় আঙ্গুলের ন্যায় পায়ের বুড় আঙ্গুলে দুইখানি হাড় ও অন্যান্য অঙ্গুলিতে ঐরূপ তিনখানি করিয়া হাড় আছে।

সখা । অক্টোবর ১৮৯১ । পৃ. ১৫৩-১৫৫

বায়ু

বায়ু আমাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিষয় সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত। বায়ু আমরা চক্ষে দেখিতে পাইনা বটে, কিন্তু বায়ু যে আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যো নাই। নাক মুখ অল্পক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিলেই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। ফুঁ দিলে বা পাখা নাড়িলে বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। তারপর যখন প্রবল ঝড়ে, বাড়ী, ঘর, দুয়ার, গাছপালা ধরাশায়ী হয়, তখন বায়ুর অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরাক্রমও বিলক্ষণ অনুভব করি।

আকাশ শূন্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে যখন ছাতি বা বেলুনের 'প্যারাসুট বন্ধ করিয়া উপর হইতে ছাড়িয়া দিই তখন খুব শীঘ্র গিয়া মাটীতে পড়ে। কিন্তু ছাতি বা প্যারাসুট' যখন খুলিয়া অর্থাৎ বিস্তৃত করিয়া ছাড়িয়া দিই, তখন পড়িতে অনেক বিলম্ব হয়। ইহাতে বুঝা যায় আকাশে এমন কোন একটা জিনিস আছে, যাহা ইহাদিগকে নীচে পড়িবার সময় বাধা দেয়, এই জন্য ইহাদের আয়তন যত বিস্তীর্ণ হয় বাধাও তত বেশী পায়।

আমরা অনেক সময়ে "শূন্য কলস" "খালি ঘটি" "এই বোতলে কিছুই নাই" ইত্যাদি কথায় ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার অর্থ এ নয় যে—এই কলস, ঘটি বা বোতল বাস্তবিকই খাঁটি শূন্য—ইহার মধ্যে কোনও "পদার্থ" নাই। এ সব স্থলে "শূন্য" কথাটা আমরা বড় শিথিলভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের মনের ভাবটা এই যে, চক্ষে দেখা যায় এমন কোন বস্তু ইহার ভিতরে নাই।

যাহাকে আমরা সচরাচর 'শূন্য গেলাস' বলি তাহা একেবারে "শূন্য" নহে।

পরীক্ষা করিয়া দেখ ঃ—এক গামলা জলের উপর ছোট এক খণ্ড কাগজ, সোলা বা শিশির কাক ভাসাইয়া দিয়া তাহার উপর একটা "শূন্য" কাচের গেলাস উপুড় করিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধর। কি দেখিতেছ? গেলাসের বাহিরে জল অনেক উপরে রহিয়াছে—গেলাসের ভিতরে জল কেন প্রবেশ করিতে পারিল না বল দেখি? অবশ্য গেলাসের মধ্যে কিছু আছে যাহা জলকে বাধা দিতেছে ও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। আবার দেখ—গেলাসের অগ্রভাগ্ অল্প মাত্র ডুবাইয়া দাও, দেখিবে ভিতরে জল কতদূর উঠিয়াছে। এখন অনেকখানি ডুবাইয়া দাও দেখিবে ভিতরে জল এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর উঠিয়াছে।

তবে বুঝিলে যে "শূন্য" গেলাসের ভিতরের যে জিনিসটা গেলাস পূর্ণ করিয়াছিল ও জলকে উপরে উঠিতে বাধা দিতেছিল সে জিনিসটা আয়তনে বাড়ে ও কমে।

গেলাস চাপিয়া ডুবাইয়া দিলেই সেটা আকারে ছোট হয়, আবার গেলাস উপরে উঠাইতে থাকিলে আয়তন বাড়িয়া উঠে। অতএব সে জিনিসটা স্থিতিস্থাপক।

এই "শূন্য" জিনিসটা কি? অন্যান্য "শূন্য" পাত্রেও যা, এই ঘরের শূন্য স্থানেও যা, আকাশেও যা, ইহাও তাই;—অর্থাৎ বায়ু।

তবেই দেখিলে বায়ু স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে সহজে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় না, এবং ইহার আয়তন বাড়ে ও কমে।

পরীক্ষা করিয়া দেখ ঃ—আতরের শিশির মত একটা বড় ফুঁকা শিশি লও। তাহার মুখ গলা পর্য্যন্ত এক গেলাস জলে ডুবাইয়া দাও। শিশির পেটটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধর। হাতের উত্তাপে শিশির ভিতরের বাতাস আয়তনে বাড়িবে এবং খানিকটা বাতাস শিশির মুখ দিয়া বুদ্‌বুদ্ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এক খণ্ড কাগজ জ্বালাইয়া শিশির নিকট ধর দেখিবে শীঘ্র শীঘ্র কত বুদ্‌বুদ্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, উত্তাপে দ্রব্য মাত্রেরই আয়তন বাড়ে, সুতরাং বায়ুরও আয়তন বাড়ে। এখানে শিশির ভিতরের বায়ু উত্তাপে আয়তনে বাড়িয়া শিশির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে।

বায়ু একটি পদার্থ। অল্প পরিমাণ বায়ুর কোন বর্ণই দেখা যায় না। বিস্তৃত রাশি হইলে নীল বর্ণ বোধ হয়। সেই জন্য আকাশ মণ্ডল নীল বর্ণ দেখায়। যাঁহারা খুব উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়াছেন তাঁহারা বলেন, সেখান হইতে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বিস্তৃত বায়ু রাশিই এই প্রভেদের কারণ।

অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুরও ভার আছে। যেমন অল্প একটু তুলা হাতে করিলে কিছুই ভার বোধ হয় না, কিন্তু নিক্তিতে ওজন করিলে ভার জানিতে পারা যায়, সেইরূপ ওজন করিলে বাতাসেরও যে ভার আছে তাহা টের পাওয়া যায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখ ঃ বাজারে যে খেলিবাব রবাবের বেলুন কিনিতে পাওয়া যায়, তাহারই একটা আনিয়া সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া ফেলিয়া ওজন কর, এবং কত ওজন হইল মনে রাখ। তারপর তাহাতে বাতাস পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ওজন কর, দেখিবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারি হইয়াছে। অতএব ইহাকে বেশ বুঝিলে বাতাসের ভার আছে।

কঠিন পদার্থ মাত্রেরই কোন না কোন একটি বিশেষ আকার আছে এবং সহজে সে আকারের পরিবর্ত্তন করা যায় না। জল ও বায়ু বা উহাদের ন্যায় অন্যান্য পদার্থের সেরূপ কোন বিশেষ আকৃতি নাই। যখন যে আকারের পাত্রে রাখা যায় তখন তেমনই হইয়া থাকে। জল কলসীতে রাখ, ঘটীতে রাখ, বা বাটীতে রাখ, যে আকারের পাত্রে রাখ ঠিক সেই পাত্রের আকৃতি ধরিবে। বায়ু সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে জলীয় ও বায়বীয় পদার্থে এই প্রভেদ যে, জলীয় পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে, যে আকৃতির পাত্রেই রাখ ইহার উপরিভাগ সর্ব্বদা সমতল থাকে। বায়বীয় পদার্থের তাহা নাই। একটা কলসীর ভিতর যদি এক ঘটী জল ঢালিয়া দিই, তবে সেই জল কলসীর নীচে অল্প স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকিবে। কলসীর অন্য অংশ "শূন্য" রহিবে। কিন্তু মনে কর একটা কলসীর ভিতর হইতে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া লইয়া মুখ ভাল

করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। তার পর যদি কোনও উপায়ে এক শিশি পরিমাণ বায়ু ঐ প্রকৃত শূন্য কলসে প্রবেশ করাইয়া দিই, তবে এই বায়ু কি জলের মত কলসীর নীচে একস্থানে পড়িয়া থাকিবে? না কলসীর উপরে এক জায়গায় ভাসিতে থাকিবে? এই অল্প পরিমাণ বায়ু সমস্ত কলসীময় হইয়া ইহাকে পূর্ণ করিয়া থাকিবে।

বায়বীয় পদার্থ যতই কেন অল্প হউক না, সুবিধা পাইলেই যতই কেন বৃহৎ পাত্র হউক, তাহার সর্ব্ব স্থানে বিস্তৃত হইয়া থাকিতে পারে। তবে যতই বিস্তৃত হইতে থাকে ততই পাতলা হয়, পূর্ব্বের ন্যায় ঘন থাকে না। বায়বীয় পদার্থের গুণ এই, আবদ্ধ না থাকিলে বা বাধা না পাইলে ক্রমাগত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বায়বীয় পদার্থের এই গুণকে প্রসারণশক্তি বলা যায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখ ঃ—একটা বড় কাঁচের বোতল লও। ইহার মুখ ভাল করিযা আঁটে এরূপ একটা 'কাকে' একটা ছিদ্র কর। সেই ছিদ্রে একটা ছোট কাঁচের বা রবারের নল বসাইয়া দাও। নলের পাশে যদি ফাঁক থাকে তবে মোম দিয়া আঁটিয়া দাও। কাকের নীচের দিকে একটা আল্‌পিন ফুটাইয়া দাও। পূর্ব্ব-পরীক্ষায় যে রবারের বেলুন ব্যবহার করিয়াছিলে তাহা হইতে সমস্ত বাতাস চাপিয়া বাহির করিয়া দিয়া মুখটা সুতা জড়াইয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া দাও। এখন এই সমস্ত বাতাস চাপিয়া বাহির করিয়া মুখটা সুতা জড়াইয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া দাও। এখন এই আকুঞ্চিত রবারের বেলুনটা 'কাকের' আলপিনে বাঁধিয়া বোতলের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া 'কাক' আঁটিয়া দাও। কাকে যে নল লাগানো আছে তাহাতে মুখ দিয়া বোতলেব বাতাস খুব জোরে চুসিয়া লও। দেখ বেলুন কত ফুলিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে বোতলে যে বাতাস ছিল, তাহা প্রসার শক্তিতে জোর করিয়া বেলনকে চাপিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, বেলুনের মধ্যের বাতাস বিস্তৃত হইতে পারিতেছিল না। যেই তুমি বোতলের বাতাস টানিয়া লইলে, অমনি বেলনের ভিতরের বাতাস চতুর্দিকে প্রসারিত হইতে চেষ্টা পাইল।

পৃথিবীতে বেষ্টন করিয়া যে বায়ু মণ্ডল রহিয়াছে তাহা ঊর্দ্ধে ৫০/৬০ ক্রোশের অধিক বিস্তৃত হইবে। তবে যতই উপরে যাওয়া যায় বায়ু ততই পাতলা হয়। অল্প বায়ুর ভার খুব সামান্য হইলেও এই বিশাল বায়ু রাশির ভার বড় অল্প নহে। আমরা উপরিস্থিত ৫০।৬০ ক্রোশ ব্যাপী বায়ুরাশির ভার মস্তকে বহন করিতেছি, অথচ ভার টের পাই না। মাথার উপর এক কলস জল বহন করিতে কত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু নদী বা পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া ১০।১২ হাত জলের তলায় গেলেও কোন কষ্ট বোধ হয় না। ইহার কাবণ চাপ যদি চতুর্দ্দিকে সমান হয় তবে আর ব্যথা পাই না। তুমি বলিতে পার তবে কেন দুখানা প্রকাণ্ড পাথরের মাঝে হাত খানা চাপিয়া ধরিলে থেঁত হয়ে যায়? আচ্ছা,—উপরের পাথর খানা নীচের দিকে চাপিতেছে নীচের খানা উপরদিকে চাপিতেছে, এই দুই চাপের মাঝে পড়িয়া হাতের রক্ত মাংস দুই পাশে বাহির হইয়া যাইবার সুবিধা পায় বলিয়া, হাতের চাম্‌ড়া কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে অর্থাৎ থেঁত হইয়া যায়। কিন্তু আশে পাশে সব দিকেই যদি ঐরূপ সমান চাপ পড়ে, কোন দিকের চাপ যদি কম না হয়, তবে থেঁত হয় না।

বায়ুর চাপ শরীরের সকল দিকে যদি সমান না হইত তাহা হইলে আমরা বায়ুভারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতাম।

পরীক্ষা করিয়া দেখ ঃ—বাহুতে কোন এক স্থানে একটা ছোট নল বসাইয়া নলে মুখ দিয়া বাতাস টানিয়া লও। দেখিবে মাংস নলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে এবং থেঁত হওয়ার মত লাল হইয়া উঠিবে। শরীরের কোমল স্থানে চুষিলেও এই রূপ থেঁত হইয়া যায়।

একটা গেলাসের মধ্যে ছোট এক টুকরা কাগজ জ্বালাইয়া ফেলিয়া দিয়া গেলাসের মুখটা শরীরের কোন মাংসল স্থানে চাপিয়া ধর (যেন কোন দিকে ফাঁক না থাকে) দেখিবে আগুন নিভিয়া যাইবে, গেলাস শরীরে আঁটিয়া লাগিয়া থাকিবে ও শরীরের মাংস জোরে গেলাসের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া যাইবে।

আর একটা **পরীক্ষা** দেখ ঃ—একটী পাত্রে জল রাখিয়া একটুকরা কাগজ জ্বালাইয়া ভাসাইয়া দাও, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপর একটা গেলাস উপুড় করিয়া চাপিয়া ধর। দেখিবে জলের মধ্য দিয়া খানিকটা বাতাস বাহির হইয়া যাইবে, কাগজ নিভিয়া যাইবে ও খানিক পরেই গেলাসের মধ্যে অনেক উপর পর্য্যন্ত জল উঠিবে। ইহার কারণ এই যে আগুনের উত্তাপে গেলাসের বায়ুর আয়তন ও প্রসারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় খানিকটা বায়ু বাহির হইয়া গেল। পরে, যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা শীতল হইয়া আয়তনে কম হইল এবং ইহার প্রসারণ শক্তির চাপও তত রহিল না বলিয়া, বাহিরেব বায়ুর চাপে জল গেলাসের ভিতরে উঠিয়া পড়িল।

আবার দেখ ঃ—একটা ডিম সেদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া রাখ। একটা বোতলে ঐ রূপ একটু আগুন জ্বালিয়া দিয়া ডিমটা বোতলের মুখে কাকের মত কবিয়া বসাইয়া দাও। দেখিবে খানিক পরে আগুন নিভিয়া যাইবে ও ডিমটা আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকিবে, অবশেষে শব্দ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে। কেন বল দেখি?

তরল পদার্থ মাত্রেরই এক দিকে চাপ দিলে সে চাপ চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়। উপরেব সমস্ত বায়ু নীচের বায়ুকে যে পরিমাণে (নিজের ভরের দ্বারা) চাপে, নীচের বায়ুরও সেই পবিমাণ চাপ ঊর্দ্ধে ও চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চালিত করে। বায়ু যে ঊর্দ্ধদিকে চাপ সঞ্চারিত করে তাহা দেখ ঃ—

একটী গেলাস লইয়া সম্পূর্ণ রূপে জলপূর্ণ কর। একখানা পুরু কাগজ বা একখণ্ড সমতল কাচ দ্বারা সেই গেলাসের মুখ ঢাকিয়া দাও, গেলাসের ভিতর যেন একটুও বাতাস থাকে না। সেই কাগজ বা কাচ, হাত দিয়া গেলাসের উপর চাপিয়া ধরিয়া, সব সমেত উল্টাইয়া ঠিক সোজা ভাবে ধর। এখন হাত সরাইয়া লইলেও গেলাসের জল পড়িবে না। (একটু কাৎ করিলেই পড়িয়া যাইবে। কাগজ বা কাচ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, জলের উপরিভাগ সমতল থাকিবে। বায়ু ঊর্দ্ধদিকে জলকে ধরিয়া রহিল। এইরূপে গ্লাস জলপূর্ণ করিয়া যদি ঐ চেপ্‌টা সমান কাচের নীচে একখণ্ড পুরু ব্লটিং কাগজ বিছাইয়া, কাচ সুদ্ধ ঐ ব্লটিং কাগজ জলের উপর চাপিয়া গেলাসের মুখ ঢাকিয়া দেও তাহা হইলে ব্লটিং কাগজ গেলাসের জল খানিকটা শোষণ করিয়া লইবে। গেলাসের মধ্যে খানিকটা স্থান একেবারে শূন্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং বাহিরের বায়ুর চাপে কাচ গেলাসের মুখে এত জোরে আঁটিয়া ধরিবে যে, গেলাসকে কাৎ করিয়া ধরিলেও পড়িবে না।

সাথী । জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ । পৃ. ২৯-৩৩

চোখের ধাঁধা

চোখের উপর আমাদের বড়ই বিশ্বাস। তুমি কোনও একটা জিনিষ দেখে এস আর এক জনের কাছে তাহা বর্ণনা করিলে সে যদি বলে, "ওহে তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়, ওটা আর এক রকম"। তুমি অম্‌নি তার উপরে চটে উঠবে আর বলবে "বা" আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম আমার কথা ভুল হ'ল? তা তুমি যাই বল, আমি আমার চোখ্‌কে অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না"।

বাস্তবিকই চোখের দেখা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু অনেক সময় আমরা যা দেখি তা যে ঠিক্ নয় তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বর্ষাকালে গঙ্গার ধারে বা অন্য কোন প্রবল স্রোত-যুক্ত নদী ধারে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবে যে, নদীর মাঝখানের জল অতি বেগে নদীর মুখের দিকে বহিয়া যাইতেছে; আর তীরের জল বিপরীত দিকে অর্থাৎ উজান বহিতেছে। কিন্তু যদি একখণ্ড কাগজ বা একটা পাতা ভাসাইয়া দাও তবে দেখিবে যে, সেটাও আস্তে আস্তে নদীর মুখের দিকেই ভাসিয়া যাইতেছে। সুতরাং বুঝা গেল তীরের জলও উজান বহিতেছে না। মাঝখানের জল যতবেগে প্রবাহিত হয়, তীরের জল তত বেগে প্রবাহিত হয় না বলিয়া ঐ রকম ধাঁ ধাঁ লাগে, বোধ হয় যেন নদীর ধারের জল উজান বহিতেছে।

২ নিম্নের চিত্র দুটীর প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথমটীর মধ্যস্থলে প্রান্তভাগ অপেক্ষা অধিক চৌড়া বোধ হইতেছে। দ্বিতীয়টীর মধ্যস্থল, প্রান্তভাগ অপেক্ষা সরু বোধ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কখ, গঘ, সরল রেখা দুটী সমান অন্তর করিয়া টানা হইয়াছে কম্পাস দিয়া মাপিলেই বুঝা যাইবে। ইহাদের দুই পাশে বাঁকা করিয়া রেখা সকল টানা হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ ধাঁধাঁ লাগিতেছে। শ্লেটে পেন্সিল দিয়া সমান অন্তরালে দুটী রেখা টান। ইহাদের মধ্যে কোন স্থলই অপেক্ষাকৃত সরু বা মোটা দেখাইবে না। এখন উপরের চিত্রের মত করিয়া দুই প্রান্ত হইতে মধ্য স্থল পর্যন্ত বিপরীত ভাবে হেলাইয়া রেখা সকল টান, দেখিবে আর পূর্ব্বের ন্যায় রেখা দুটী সমান অন্তর বোধ হইতেছে না।

৩। দ্বিতীয় চিত্র দেখ। লম্বা লম্বা কাল রেখাগুলি যেন ইংরাজি Wর মত হেলিয়া রহিয়াছে বোধ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক উহারা লম্বাভাবে রহিয়াছে এবং সমান অন্তরাল। উহাদের দুই পাশে এড়ো ভাবে একটু ত্যার্‌ছা করিয়া রেখাগুলি টানা হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ হেলিয়া রহিয়াছে বোধ হইতেছে।

৪। একখণ্ড কাগজ দুভাঁজ করিয়া তাহার উপর ১ ও ২ চিহ্নিত চিত্রাংশের ন্যায় পেন্‌সিল দিয়া আঁকিয়া পরে কাঁচি দিয়া দাগে দাগে কাটিয়া লও। এই দুই কাগজ খণ্ড অবশ্যই পরস্পর

সমান। কিন্তু যদি উপরের চিত্রের ন্যায় একটীর উপর অপরটী রাখা যায়, তবে নীচেরটীকে উপরটার অপেক্ষা বড় দেখাইবে। চিত্রে ১ এবং ২ চিহ্নিত অংশ উভয়ই পরস্পর সমান হইলেও ১টীকে ২ অপেক্ষা ছোট দেখাইতেছে।

৫। "সাথী" খানিকে ভাঁজ করিয়া এই চিত্রের পৃষ্ঠা সম্মুখে রাখিয়া, কাগজের নীচের ডান কোনা ডান হাত দিয়া ধরিয়া, ঘুরাইবার মত করিয়া (অর্থাৎ কাগজ খানিকে উপর হইতে ডানদিকে সরাইয়া নিচের দিকে আনিয়া, আবার বাঁ দিক দিয়া উপরে উঠাইয়া শীঘ্র শীঘ্র নাড়িতে থাক। নাড়িবার সময়ে যদি চিত্রের দিকে তাকাও, তবে দেখিবে সমুদয় বৃত্তগুলি যেন মধ্যবিন্দুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে।

৬। তার পর আমাদের এমন চোখ, যাকে অবিশ্বাস করিতে চাহি না, সেও যে অন্ধ তাহা কাগজখানি দূরে ধরিয়া ডান চোখ বন্ধ করিয়া বাঁ চোখ দিয়া একদৃষ্টে গোল বিন্দুটীর দিকে তাকাইয়া থাক। দুইটী দাগই দেখিতে পাইবে। এখন ধীরে ধীরে কাগজটী মুখের কাছে আনিতে থাক, কিন্তু দৃষ্টি যেন কেবল গোল দাগটার দিকেই থাকে। খানিক পরে আর বাঁ দিকের + দাগটী দেখিতে পাইবে না। তারপর আরও নিকটে আনিলে আবার দেখিতে পাইবে। ঐ রূপ বাঁ চোখ বন্ধ করিয়া ডান চোখ দিয়া চিহ্নটী দেখ এবং পূর্ব্বের ন্যায় কাগজটা কাছে আন, এমন এক অবস্থা হইবে যখন আর গোল দাগটা দেখিতে পাইবে না। চক্ষের মধ্যের সকল স্থান দিয়াই দেখিতে পারা যায় না। একটা স্থান আছে যেখানে বাহিরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে দৃষ্টিশক্তি উত্তেজিত হয় না। যে বস্তুর প্রতিবিম্ব সেখানে পড়ে সেই বস্তু দেখিতে পাই না। সেই প্রতিবিম্ব যদি একটু সরিয়া অন্য স্থানে পড়ে, তবে সে স্থলের দর্শনের ক্ষমতা থাকায় সে বস্তু দেখিতে পাই।

সাথী । ভাদ্র ১৩০০। পৃ. ৯৫-৯৭

বিজ্ঞান কৌতুক

কাগজের ঠোঙ্গায় ভাত রাঁধা

কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা চৌকোনো ঠোঙ্গা তৈয়ার কর—তাহাতে জল রাখিলে যেন জল পড়িয়া না যায়। এই ঠোঙ্গায় জল দিয়া আগুনের উপর বসাইয়া দিলে ঠোঙ্গা পুড়িয়া যাইবে না বরং ইহাতে জল গরম করা যাইবে ও ভাত রাঁধা যাইতে পারিবে।

সাঁওতালেরা শালপাতার বড় বড় ঠোঙ্গা করিয়া তাহাতে ভাত রাঁধিয়া থাকে। ঠোঙ্গায় যতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ ঠোঙ্গাটা পুড়িয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে কাগজের ঠোঙ্গার গায়ে যে তাপ লাগে তাহা জলেতে সঞ্চালিত হয়। কাগজটা আর বেশী তাতিয়া উঠিতে পারে না। যতটা তপ্ত হইলে কাগজ পুড়ে ততটা উত্তপ্ত হইতে পারে না। কাগজের তাপ গ্রহণ করিয়া জল উত্তপ্ত হইতে থাকে, পরে ফুটিয়া বাষ্প হইতে থাকে, তখন আর তদপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয় না।

ঐরূপ আর একটা পরীক্ষা করিয়া দেখ। একটা পিত্তল বা কাঁসার গেলাস বা ঘটীর চারিদিকে একখণ্ড কাপড় বা কাগজ এক পুরু করিয়া বেশ আঁট করিয়া জড়াও। এখন এই গেলাস বা ঘটির জড়ান দিকটা যদি প্রদীপের শিখায় ধর তবে দেখিবে যে কাপড় বা কাগজ পুড়িয়া যাইতেছে না।

যে অংশে প্রদীপের তাপ লাগে সেই অংশের সহিত পিত্তল বা কাঁসা সংলগ্ন রহিয়াছে বলিয়া সেই স্থানের তাপ গেলাস ও ঘটির সর্ব্বত্র পরিচালিত হয় এবং দীপ শিখার উপরের কাপড় বা কাগজের উত্তাপ এত অধিক হইতে পায় না যে, উহা পুড়িয়া যাইবে। কিন্তু আগুনের উপর যদি এত অধিকক্ষণ রাখা যায় যে, সমস্ত গেলাস বা ঘটিটা বড় অধিক তাতিয়া উঠে—প্রায় লাল হইয়া আইসে—তাহা হইলে অবশ্যই কাপড় বা কাগজটা পুড়িয়া যাইবে।

জলের বেলায় আর সে আশঙ্কা নাই। লোহা বা পিত্তল যত অধিকক্ষণ আগুনে রাখা যায় ততই অধিক উত্তপ্ত হয় অবশেষে আগুনের মত তপ্ত হয়। জল সেরূপ হয় না। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে তাহার যে তাপ হয়, সে তাপ অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক উত্তপ্ত করা যায় না। সমস্ত দিন ধরিয়া আখায় দেদার কাঠ গুঁজিয়া খুব আগুন করিয়াও সে জলকে অধিকতর উত্তপ্ত করা যায় না।

রচনাটির যুগ্ম লেখক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও 'সাথী' সম্পাদক ভুবনমোহন রায়।

সাথী। শ্রাবণ ১৩০০ । পৃ. ৭৯-৮০

বিজ্ঞান কৌতুক।

একটি বোতলে চারিপ্রকার তরল পদার্থকে অমিশ্রিতভাবে রাখা।

প্রথমে একটি সরু লম্বা বোতলে কিঞ্চিৎ পারা ঢালিয়া, তারপর তাহাতে কিঞ্চিৎ পটাশ মিশ্রিত জল ঢালিবে; তাহার উপর কিঞ্চিৎ স্পিরিট অব ওয়াইনে একটু ম্যাজেন্টা মিশ্রিত করিয়া ঢালিয়া দিবে। তৎপরে কিঞ্চিৎ কেরাসিন তৈল তাহার উপর নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে বোতলটিকে নাড়িয়া (ঝাঁকিয়া) কিছুক্ষণ একস্থানে স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে চারিটি তরলপদার্থ মিশ্রিত না হইয়া আলাদা আলাদা থাকিবে। আর বোতলস্থ জলের রং উপর হইতে ক্রমান্বয়ে ঈষৎ নীল, ঘোর লাল, ঈষৎ লাল, ও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দেখাইবে।

ক্ষুদ্রমুখ বিশিষ্ট বোতলের মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ

সরুমুখযুক্ত একটি বোতলের মধ্যে একটি ডিম্ব প্রবিষ্ট করিতে হইলে, যে পর্যন্ত না ডিম্বের খোলা ভিজিয়া নরম হয়, ততক্ষণ ডিম্বটিকে তীব্র ভিনিগার বা ছিরকায় ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরে নরম হইয়া আসিলে, বোতলের সরুমুখের মধ্যে টিপিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এবং ডিম্বকে স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন করিতে হইলে, তাহাকে কিঞ্চিৎ জলে ডুবাইবে।

দস্তার কৃত্রিম বৃক্ষ

কিঞ্চিৎ জলে প্রায় অর্দ্ধ ঔন্স পরিমাণ সুগার অব্ লেড্ মিশ্রিত করিয়া একটি কাচের গেলাসে রাখিয়া দিবে। তারপর একখণ্ড দস্তাকে সুতায় বাঁধিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া রাখিবে ও ঐ সুতার উপর ভাগ একখণ্ড কাষ্ঠফলকে বাঁধিয়া ঐ গেলাসের মুখের উপর রাখিবে। এইরূপে আন্দাজ দুই ঘন্টা কাল একস্থানে স্থিরভাবে রাখিয়া দিবে। ঐ দস্তাখণ্ড জলের মধ্যে বিলাতী ঝাউ গাছের ন্যায় আকার ধারণ করিবে।

লাল জলকে শ্বেতবর্ণ করা

অল্প পরিমাণে ম্যাজেন্টা কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী গেলাসে রাখিবে। আর একটি গেলাসে অল্পপরিমাণে গন্ধকদ্রাবক (সল্‌ফিউরিক এসিড) একটু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। উভয় জল মিশ্রিত করিলে, জলের লালবর্ণ সাদা হইবে।

অদগ্ধনীয় কাগজ

কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি মিশ্রিত জলে এক খণ্ড কাগজকে ডুবাইবে ও শুষ্ক করিবে; এইরূপে পাঁচ ছয় বার করিয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে, ঐ কাগজ দগ্ধ হইবে না। বাজি দেখাইবার পূর্ব্বে ঐ কাগজ ঐ প্রকারে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে।

বোতলের ভিতর হইতে পায়রা বহির্গত করণ

প্রথমে একটি কাল বড় বোতল মধ্যস্থলে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিবে। বোতলের মধ্যস্থল কাটিবার নিয়ম এই;— বোতলটি আড়ভাবে দুইজনকে ধরিতে দাও, তাহাদিগকে খুব মজবুত করিয়া ধরিতে বলিবে, তারপর আর এক জন একটি মজবুত দড়ি বোতলের মধ্যদেশে ২।৩ ফের জড়াইয়া, দড়ির দুই প্রান্ত খুব মজবুত করিয়া ধরিয়া খুব জোরে পর্যায়ক্রমে এক একটি দড়ির প্রান্ত ধরিয়া টানিতে থাকিবে; যখন দেখিবে দড়ির ঘর্ষণে বোতলের মধ্যস্থলটি খুব গরম হইতেছে, তখন খানিকটা ঠাণ্ডা জল বোতলের সেইস্থানে ঢালিয়া দাও; বোতল ক্ষণকাল পরে ফাটিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইবে।

বোতল কাটা হইলে তাহার মধ্যে একটি পায়রা প্রবেশ করাইয়া বোতলের উপরের অর্দ্ধাংশ নীচের অর্দ্ধাংশের উপর সাবধানে বসাইবে। তারপর হাঁসের ডিমের শ্বেত অংশের সহিত সমান পরিমাণে কলিচুণ মিশাইয়া, বোতলের জোড়ের মুখে বেশ করিয়া লাগাইয়া বাতাসে রাখিয়া দিবে। বাতাসে আঠা শুকাইলে কাটা স্থান খুব আঁটিয়া যাইবে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছুদূরে বোতলটি রাখিয়া, বন্দুকে গুলি পুরিয়া বোতলটিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িবে। গুলির আঘাতে বোতল ভাঙ্গিয়া গেলেই পায়রাটি তাহা হইতে উড়িয়া বাহির হইবে। পায়রা পুরিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিও না।

রচনাটির যুগ্ম লেখক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও 'সাথী' সম্পাদক ভুবনমোহন রায়।
সাথী । অগ্রহায়ণ, ১৩০০ । পৃ. ১৫০-১৫১

মনের কথা বলা

যত বড়ই হউক না কেন যে কোন একটা সংখ্যা লেখ সেই সংখ্যাটা আবার উল্টাদিক্ হইতে লেখ। এই দুই সংখ্যার বিয়োগ ফল যাহা হইবে সেই সংখ্যা হইতে যে কোন অঙ্ক (০ ব্যতীত) মুছিয়া ফেল। বাকী যে অঙ্ক রহিল তাহাদের যোগ ফল যদি বলিয়া দাও, তবে কোন্ অঙ্কটা মুছিয়াছিলে তাহা বলিয়া দিতে পারা যায়।

ইহার সঙ্কেত এই; যে কোন সংখ্যা এবং তাহার বিপরীত সংখ্যা এই দুই এর বিয়োগ ফল ৯ অথবা ৯-এর কোন গুণিতক। আবার এই বিয়োগ ফলের সংখ্যার অঙ্কগুলির যোগ ফলও ৯ বা ৯ এর কোন গুণিতক। সুতরাং এই সংখ্যা হইতে যদি কোন অঙ্ক মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট অঙ্কের যোগ ফল ৯ বা ৯-এর গুণিতক হইতে সেই মোছা অঙ্কের পরিমাণে কম হইবে।

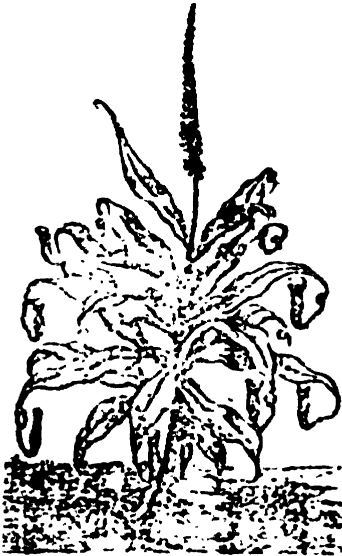
যেমন মনে কর তুমি ৭৩৫ এই সংখ্যা লিখিলে তারপর ইহার সংখ্যা ৫৩৭ লিখিলে। ইহাদের বিয়োগ ফল ৭৩৫-৫৩৭=১৯৮ হইল। ১৯৮ এর অঙ্কগুলির যোগ ফল ১+৯+৮=১৮, ইহা ৯ এর গুণিতক ৯x২=১৮ হয়। সুতরাং এখন ১৯৮ হইতে যদি কোন অঙ্ক ৮ মুছা যায় তবে অবশিষ্টের যোগফল ১০ হইল। ১০ এরপর ৯ এর গুনিতক ১৮, সুতরাং ৮ মুছা হইয়াছিল বুঝিলাম। যদি এক মুছা যায়, তবে যোগফল হয় ১৭। ৯ এর নামতায় ১৭র পর ৯ এর গুণিতক ১৮ সুতরাং ১ মুছা হইয়াছিল। মোছার পর যদি যোগ ফল ৯ বা ৯এর কোন গুণিতক হয়, তবে যদি কোন অঙ্ক মোছা হইয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্য ৯ হইবে।

সাথী । অগ্রহায়ণ ১৩০০ । পৃ. ১৫৯

শিকারী গাছ

তোমরা শিকারী জন্তুর কথা জান। শিকারী পাখীর কথাও জান। এবং পূর্ব্বে "সাথীতে" শিকারী মাকড়সার কথাও পড়িয়াছ। কিন্তু শিকারী গাছের কথা শুনিয়াছ কি?

শিকারী গাছের নাম শুনিয়াই মনে করিও না যে, যে কোন এক রকম প্রকাণ্ড গাছ আছে, যাহারা হাত পা নেড়ে লাফিয়ে তেড়ে এসে মানুষ বা অন্য কোন জন্তু খেতে আসে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তু যেমন দৌড়িয়া গিয়া, বা লাফ দিয়া শিকার ধরে, বাজপাখী যেমন ছোঁ মারিয়া ছোট ছোট পাখী ধরে, শিকারী গাছ তেমন করিয়া ধরে না। ব্যাধ যেমন ফাঁদ পাতিয়া প্রলোভন দেখাইয়া শিকার ধরে, মাকড়সা যেমন জাল পাতিয়া কৌশলে মাছি ধরে, শিকারী গাছও অনেকটা ঐ রকমে মাছি বা অন্যান্য ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খায়। শিকারী গাছ অনেক রকমের হয়। কিন্তু কোনটাই অশ্বত্থ বট বা আম কাঁঠাল গাছের মত বড় হয় না। ইহারা সব গুলিই ছোট ছোট গাছ, শাকের গাছের মত। এবার তোমাদের দুচার রকমের শিকারী গাছের কথা বলিব। দেখিবে শিকার ধরিবার কেমন আশ্চর্য্য কৌশল এই সকল গাছের আছে।

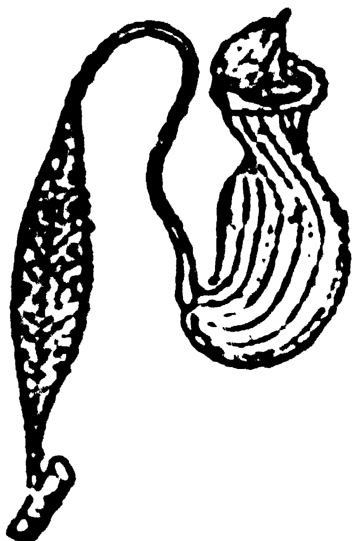


প্রথম যে শিকারী গাছের কথা বলিব তার নাম "ঘটীলতা"। উদ্ভিদ্‌বিদেরা ইহার নাম নেপেন্থিস্ রাখিয়াছেন। ঘটীলতা বোর্নিও, জাবা ও সিংহল দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ায়, মালয় উপদ্বীপে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। ঘটীলতার পাতাগুলি লম্বা হয় এবং পাতাগুলির সরু দড়ির মত লম্বা একটা শীষ বাহির হয়। সেই শীষের প্রান্তভাগ ফুলিয়া মোটা হইয়া ঠিক একটি ঘটীর মত হয়। এই জন্য ইহাকে ইংরাজিতে Pitcher plant বা ঘটীলতা বলে। ঘটীলতা নানা শ্রেণীর হয়। কোন কোন

শ্রেণীর গাছ খুব ছোট হয়, আবার কোন কোনটি ছয় সাত হাত হইয়া অন্যগাছে লতাইয়া উঠে। কোন কোনটার পাতার ঘটীগুলি পটলের মত খুব ছোট ছোট হয়, আবার কোন কোনটার এক একটা বড় গেলাস বা ছোট ঘটীর মত বড় হয়। ঘটীর মুখ সর্ব্বদা উপর দিকে থাকে। এই ঘটী ঐ গাছের ফুল বা ফল নহে, এটা পাতারই অঙ্গ, পাতার গঠনই ঐ রকম। ঐ ঘটীর মুখে একটা ছোট পাতার ঢাকনি আছে।

এই ঘটীর মধ্যে জল পূর্ণ থাকে। কোন কোন শ্রেণীর ঘটীলতার এক একটা ঘটীতে এক আধ গ্লাস জল পাওয়া যায়, আবার কোন কোনটাতে দু তিন গ্লাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

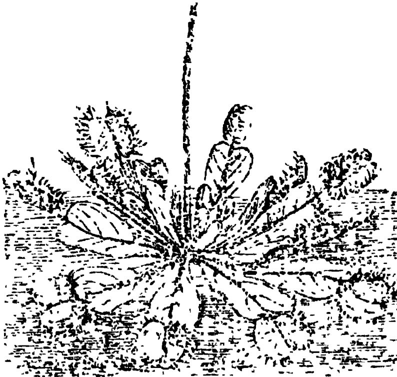
একজন ভ্রমণকারী বহুদিন বোর্নিও দ্বীপে কাটাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক পাহাড়ের গায়ে এই ঘটীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। মাটীতে লতাগুলি লুটাইতে থাকে, না হয় অন্যান্য গাছে লতাইয়া উঠে এবং ইহাদের সুন্দর ঘটীগুলি চতুর্দিকে ঝুলিতে থাকে। ঘটীগুলি সবুজ রঙ্গের, এবং গায়ে লাল বা গোলাপী ফোঁটা কাটা থাকে। এই ঘটীর জল যদি ঢালিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাতে অনেক মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ মরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব কীট পতঙ্গ কোথা হইতে আসে, কেনই বা তাহারা এমন ফাঁদে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারায়।



এই ঘটীর ভিতরের দিকে, ঢাকনির নীচে, মুখের চারিদিকে একটা শক্ত বেড় থাকে। এই বেড়টায় ঘটীর মুখটি বেশ মজবুত ও বিস্তৃত করিয়া রাখে। এই বেড়ের গা হইতে স্বভাবতই এক রকম মধু নিঃসৃত হয়। এই মধুর লোভে আকৃষ্ট হইয়া পিপীলিকা মাছি ও অন্যান্য কীট উহার ভিতর প্রবেশ করে। আবার এই বেড়ের নীচেই, ঘটীর ভিতরের গায়ে সারি সারি ক্ষুদ কাঁটার মত কেশ বা সূঁয়া থাকে। এই সূঁয়া গুলির মাথা সব ভিতর দিকে হেলান। এরূপ ভাবে সাজান যে, উপর হইতে নীচে সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু নীচে হইতে উপরে আর ফিরিয়া আসা যায় না, সূঁয়ায় বাধে। যে দুর্ভাগ্য পোকা একবার ভিতরে প্রবেশ করে, সে আর বাহিরে আসিতে পারে না, নীচের দিকেই ক্রমে নামিয়া যায়।

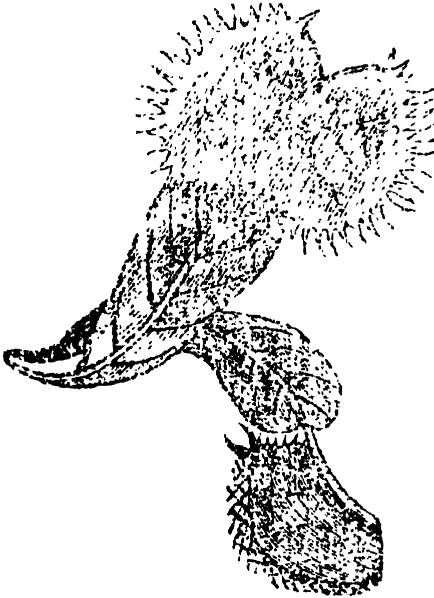
এই সূঁয়ার নীচে, ঘটীর গা খুব মসৃণ ও পিচ্ছিল। সেখানে গেলে পোকা একবারে নীচে গড়াইয়া ঘটীর জলে গিয়া পড়ে। এই সূঁয়া বা কেশগুলি এমন শক্ত যে, জল খাবার আশায় কোন ছোট পাখী যদি তাহার মাথাটা ঘটীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে তার মাথা এমনি আটকাইয়া যায় যে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও পাখী আর মাথা বাহির করিতে পারে না। মধু লোভে কীট পতঙ্গ ভিতরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ ঘটীমধ্যস্থ সঞ্চিত জলে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে ঘটীর ভিতরের গা দিয়া এক রকম হজমী রস নির্গত হয়। আমরা কিছু খাইলে, পাকস্থলি হইতে হজ্‌মী রস বাহির হইয়া যেমন ভুক্ত দ্রব্যকে গলাইয়া ফেলে এবং পরে ভুক্ত দ্রব্যের রস শোষিত হইয়া যেমন শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, সেই রূপ এই ঘটীর ভিতর কোন কীট পতঙ্গ পড়িলে, ঘটীর ভিতরের গা দিয়া যে হজ্‌মী রস নির্গত হয়, তাহাতেই কীট দেহ জীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার রসে ঘটীলতার শরীরের পুষ্টি সাধন করে।





আমরা যেরূপে আমাদের খাদ্য পরিপাক করি, ঘটীলতাও অনেকটা সেই রূপে খাদ্য পরিপাক করে। ইহারা অবশ্য শিকড়ের দ্বারা মাটী হইতেও রস শোষণ করিয়া শরীর পোষণ করিয়া থাকে। যাহারা পোকা মাকড় খাইতে পায় না তাহারা শীর্ণ হইয়া যায়; বোধ হয় যেন পোকা মাকড় না খাইতে পাইয়া অনাহারে তাহাদের এমন দশা হইয়াছে। আর যেগুলি খুব পোকা মাকড় খাইতে পায়, তাহারা খুব সতেজ হইয়া উঠে। উদ্ভিদবিদেরা এই ঘটীর ভিতর মাংসের টুকরা এবং সিদ্ধ ডিমের সাদা অংশ খানিকটা ফেলিয়া দিয়া দেখিয়াছেন যে, ডিম একদিনে অনেক খানি হজম হইয়া গিয়াছে, এবং মাংসের টুকরা দুদিনে একেবারে লোপ পাইয়াছে। মাছি, তেলাপোকা ও ফড়িঙ্গের দেহ দু তিন দিনে অদৃশ্য হইয়া যায়, কেবল তাহাদের পাখা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। সেগুলি ইহারা হজম করিতে পারে না।

ঘটীলতার ন্যায় আর এক জাতীয় ছোট গাছ আছে। উত্তর আমেরিকায়, মেক্‌সিকো প্রদেশে ইহার বাস। মাটী হইতে শিকড়ের চারি ধারে কয়েকটা লম্বা বা ভেরীর মত পাতা জন্মায়। এইজন্য ইহাকে ভেরী লতা বলে। উদ্ভিদ্‌বিদেরা ইহাকে Sarracenia বলেন। এই ভেরী, কোন কোন শ্রেণীর লতায় পাঁচ ছয় ইঞ্চ লম্বা ও এক ইঞ্চ চৌড়া হয়, আবার কোন কোন শ্রেণীর লতায় এক হাত পর্য্যন্ত লম্বাও হইয়া থাকে। ভেরী গুলি স্বচ্ছ জলে পূর্ণ থাকে, এই জল ভেরীর ভিতর হইতেই নির্গত হইয়া জড় হয়। ইহাদের ভিতরও ঘটীলতার ঘটীর কেশের মত কেশ বা সূঁয়া নীচের দিকে হেলান আছে। ভেরীর ভিতরের পানীয় দ্রব্যের লোভে পিপীলিকা, মাছি ও অন্যান্য পোকা অনেক ভিতরে প্রবেশ করে, তার পর আর বাহিরে আসিতে পারে না। রস পান করিয়া ইহাদের মত্ততা জন্মায় এবং টলিতে টলিতে জলে পড়িয়া যায়। এই রূপে হাজার হাজার পিপীলিকা ঐ জলে ডুবিয়া মরে। যে একবার প্রবেশ করে, সে আর নিষ্কৃতি পায় না। তারপর ঘটীলতার ভিতর পড়িয়া যে রূপে কীট দেহ দ্রবীভূত ও শোষিত হয়, এখানেও সেই রূপে দ্রবীভূত ও শোষিত হইয়া ভেরী লতার পুষ্টি সাধন করে।



২

এখন যে গাছের কথা বলিব তাহাদের পাতায় ঘটী জন্মেনা। কিন্তু অন্যরকম ফাঁদ জন্মে, যদ্বারা তাহারা সচ্ছন্দে মাছি ধরিয়া খায়। ইহাদের এক শ্রেণীর নাম মক্ষিকা পাশ অর্থাৎ মাছি মারা ফাঁদ। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Venus Fly-trap বলে। ইহারা ক্যারোলিনা প্রদেশে জন্মায়, শেওলা পূর্ণ জলা স্থানে ইহাদের বাস। এ গাছের ডাঁটা হয় না, কতকগুলি পাতা মাটির নিকট একই স্থান হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের পাতার বোঁটাগুলি খুব চওড়া হয়, দেখিলে সেই গুলিকেই

আসল পাতা বলিয়া ভ্রম হয়। এই ডাঁটার আগায় আসল পাতা জন্মায়, পাতাটি দুই অংশে বিভক্ত। আমাদের দুই হাতের পাতা বা তেলো, পাশাপাশি রাখিলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম দেখিতে হয়। আমাদের হাতে যেমন আঙ্গুল আছে বা ইন্দুর ধরা জাঁতিকলে যেমন খাঁজ কাটা দাঁত আছে, এই মক্ষিকা-পাশের পাতার চারিধারেও সেই রকম সরু সরু খাঁজ বা দাঁত আছে, এবং পাতার ভিতরে তিনটে করিয়া খুব ছোট সুয়া আছে। এই সুয়ার গায়ের খুব ছট্ চটে এক রকম আঠা জন্মায়। যখনই কোন মাছি বা অন্য কোন পোকা এই শুঁয়া স্পর্শ করে, তখনই তাহাতে আটকাইয়া যায় এবং পাতার দুই পুট বা অংশ নিমেষ মধ্যে ভাঁজ হইয়া তাহাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে। যতক্ষণ না পোকাটা মরিয়া যায় ও তাহার রস শোষিত হয়, ততক্ষণ পাতাটা আর খোলে না। আমাদের এক হাতের আঙুলের ভিতর অন্য হাতের আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া, দুই হাত বন্ধ করিলে যেমন হয়, এই পাতার দুই অংশ মাঝামাঝি ভাঁজ হইয়া বন্ধ হইলে ঠিক তেমনি হয়। অথবা জাতিকলের দাঁতগুলি যেমন খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বন্ধ হয়, ইহাদের পাতাও সেইরূপ খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বন্ধ হয়।

এই পাতাগুলি এই গাছের আহার ধরিবার কল। আর এমনই ইহার খাবার চিনিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। পাতার উপর এক টুকরা মাংস ফেলিয়া দাও, পাতা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে ও মাংস জীর্ণ হইয়া অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এক ফোঁটা জল ফেল, কিছুতেই পাতা বন্ধ হইবে না। খাদ্য দ্রব্য কিছু পড়িলেই বন্ধ হইবে নতুবা নয়; গাছেরা খুব সেয়ানা। যে শুঁয়ার কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহার গায়ে আঠা থাকিলেও সে আঠার তত জোর নাই, সুতরাং শুধু আঠার সাহায্যে পোকা ধরা চলে না। সেই জন্য পাতাটা এমনই ভাবে গঠিত যে, ছোট মাছির এক খানা ঠ্যাং ঐ শুঁয়ার একটাকে স্পর্শ করিলেই, নিমেষের মধ্যে কপাট বা জাঁতা কলের মত বেগে বন্ধ হইয়া, পত্রাংশ দুটি মাছিকে আবদ্ধ করিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলে, পলাইবার আর অবসর থাকে না। বন্ধটা খুব চট্ করিয়া হয় বটে, কিন্তু একবার বন্ধ হইলে খুলিতে প্রায় ছয়-সাত দিন লাগে। অথাৎ মাছিটি ছয় সাত দিনের কমে আর হজম করিয়া উঠিতে পারে না। একটা পাতা কতক্ষণ মুদ্রিত হইয়া খাবার হজম করিতে থাকে, ততক্ষণ অন্যান্য পাতা শিকার করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ইহারাও জীবন মারণের জন্য শুধু কীট পতঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। শিকড় দিয়া অন্যান্য গাছের মতও খাদ্য সংগ্রহ করে।

এই জাতীয় আর এক প্রকার খুব ছোট গাছ আছে, তাহাদিগকে সূর্য্যশিশির বলে। বৈজ্ঞানিক নাম Drosera ড্রসেরা। সূর্য্য শিশির অনেক রকমের হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই সূর্য্যশিশির জন্মায়। ভারতবর্ষে—আসাম, সিকিম, চট্টগ্রাম, বর্ম্মা, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার অনেক স্থলে এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বালুকাময় আর্দ্র স্থানে ও জলা ভূমিতে জন্মে। এই গাছ গুলি খুব ছোট, ঘাস

পাতার ভিতর হইতে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাদের শিকড় হইতে কতকগুলি ডাঁট বাহির হইয়া, চারিদিকে গোলাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এক একটা ডাঁটের মাথায় গোল গোল ছোট ছোট এক একটি পাতা জন্মে। পাতার উপরটা সমস্তই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশে ঢাকা থাকে। এই কেশ বা শুঁয়ার অগ্রভাগ অনেকটা আলপিনের মাথার মত গোলাকার হয় এবং শুঁয়ার মাথা গুলি রৌদ্রে চক্ চক্ করতে থাকে। বোধ হয় যেন শিশিরবিন্দু পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই ইংবাজিতে ইহাকে Sundew বা সূর্য্যশিশির বলে। শুঁয়ার মাথাগুলি একপ্রকার খুব আঠাযুক্ত চটচটে পদার্থে আবৃত থাকে। আঙুল দিয়া তাহা ছুঁইলেই আঙুলে আঙুলে আঁটিয়া যায়।

এই আঠার লোভে বা যে কোন কারণেই হউক, মাছি আসিয়া ইহার উপরে বসিলেই এমন কি ইহার একটি শুঁয়ার মাথা স্পর্শ করিলেই, আঠাতে জড়াইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এবং শুঁয়াগুলি ধীরে ধীরে একে একে বাঁকিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে; এইরূপ করিতে প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা লাগে, কিন্তু মাছির পলাইবার যো থাকে না। শুঁয়াগুলি সব বন্ধ হইয়া, মাছির উপর একে একে সকলে হজমী রস ঢালিয়া দিতে তাকে, তাহাতে মাছি গলিয়া যায় ও তাহার দেহের রস শোষিত হইয়া সূর্য্য-শিশিরের পুষ্টিসাধন করে। ভোজন ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, আবার শুঁয়াগুলি ক্রমে ক্রমে সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং পালক লোম ইত্যাদি যাহা অভুক্ত পড়িয়া থাকে, তাহা ঝরিয়া পুড়িয়া যায়। ইহার পর পাতাটি পুনরায় শিকার ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। বৃষ্টিতে বাতাসে বা অন্য কোন কারণে খুব আলোড়িত হইলেও শুঁয়ারা তাহা গ্রাহ্য করে না, বাঁকিয়া বন্ধ হইয়াও যায় না। খাবার পড়িলেই বন্ধ হইয়া থাকে। যদিও ইহার পাতার দ্বারা কীট সংহার কার্য্য খুব ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে। তথাপি ইহাদের দ্বারা অনেক কীটের প্রাণনাশ হয়। সূর্য্যশিশির প্রচুর পরিমাণে জন্মে; এক একটি গাছে সাত আটটি পাতা হয়। ইহার এক একটি পাতা যদি জন্মের মধ্যে মোটে ১০।১৫টি করিয়া পোকা মারিতে পাবে। তাহা হইলেও এক-একটি গাছে কত পোকা সংহার করে ভাবিয়া দেখ। ইহারা সিদ্ধ শাক-সবজী, আলু, কপি প্রভৃতিও খাইয়া থাকে।

তারপর আমাদের দেশে, খালে বিলে পুকুরে প্রচুর পরিমাণে এক রকম স্থালী উদ্ভিদ বা ঝাঁজি জন্মায়, তাহারাও ছোট ছোট কীটের রসে নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের পাতা খুব সরু সরু হয়। পাতার গায়ে কয়েকটি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁপা মটরের মত থলে জন্মে। তাহাতে গাছটাকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে। এই থলে অতি কৌশলে গঠিত। একদিকে একটু মুখ খোলা থাকে, সে মুখের ভিতর খুব ছোট ছোট জলের পোকা সহজে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে পারে না। তোমরা মাছধরা খাঁচা দেখিয়াছ, ইহার গঠন প্রণালীও সেইরূপ। যে পোকা একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ করে, সে আর বাহির হয় না। অন্যান্য শিকারী গাছের ন্যায় পাচক রসে ইহাদের খাদ্য পরিপাক হয় না। পোকা মরিয়া পঁচিয়া গেলে, সেই রস শরীরে শুষিয়া

লয়। খুব ক্ষুদ্র মাছের ছানা পর্য্যন্ত এই থলের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারায়। ইহাদের এই থলেই খাদ্য সংগ্রহের ফাঁদ।

৩

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'সখা ও সাথী'তে তোমরা কয়েকপ্রকার শিকারী গাছের কথা পড়িয়াছ এবং তাহাতে ঐ জাতীয় কয়েকটি চিত্রও দেখিয়াছ।

আজ তোমাদিগকে এই জাতীয় আর একটি বৃক্ষের কথা বলিব।

এই বৃক্ষ প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকাতে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সাত বৎসর পূর্ব্বে নবজীলণ্ডবাসী কোন ব্যক্তি, ঘটনাবশতঃ ইহার একটি স্বদেশে আনয়ন করে। তদবধি ইহার একটি বিশেষ গুণ থাকা হেতু, সেই দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। এই বৃক্ষের বিশেষ কি গুণ আছে তাহা বলি।

বৃক্ষগুলিতে বহুপরিমাণে সাদা এবং পাটল বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। এই ফুলগুলির গন্ধ বড়ই মনোহর। এই ফুলের গন্ধে উন্মত্ত হইয়া যত কীট পতঙ্গ, মধুর লোভে আসিয়া ফুলের উপর পড়ে। কিন্তু অন্যান্য ফুলের ন্যায় ইহার মধু পান করাটা তত সহজ ব্যাপার নহে। ফুলগুলির বাহিরের আবরণ খুব পুরু; এই আবরণের নীচে বোঁটার ধারে মধু সঞ্চিত থাকে। সুতবাং মধু পান করিতে হইলে এই বাহিরের আবরণ দন্ত দ্বারা ভেদ করিয়া তবে পান করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও আবার বিপদ। মধু এবং আবরণের মাঝ খানে বড় বড় দুটি সাঁড়াশির ন্যায় আছে। কীট পতঙ্গেরা মধু লোভে যেমন দন্ত দ্বারা সেই আবরণটি ভেদ করে, অমনি সাঁড়াশিতে আটকাইয়া যায় এবং কিয়ৎকাল ছট্ ফট্ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

ভগবানের নির্ম্মাণ কৌশল কি সুন্দর! ফুলের মধু রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই বড় বড় সাঁড়াশি দুটির সৃষ্টি। নবজীলণ্ডবাসীগণ কীট পতঙ্গাদির অত্যাচার হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বৃক্ষের চাষ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষে প্রত্যহ কত শত কীট পতঙ্গ যে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি, এক একটা ফুলের উপর চার পাঁচটা পোকাও মরিয়া থাকে।*

সখা ও সাথী । কার্ত্তিক ১৩০১ ।পৃ.১৩৫-১৩৮
সখা ও সাথী। অগ্রহায়ণ ১৩০১। পৃ. ১৫০-১৫৩
সখা ও সাথী। চৈত্র ১৩০১ । পৃ. ২৩২

*প্রবন্ধটির অন্যতম লেখক ছিলেন জনৈক রাসবিহারী সেন।

গিরগিটি

তোমরা অনেকেই গিরগিটি দেখিয়া থাকিবে। গিরগিটি সরীসৃপ জাতীয়। সরীসৃপ কাহাকে বলে জান?

পৃথিবীতে নানা প্রকারের জন্তু আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জন্তুর সহিত অন্য কতকগুলি জন্তুর কোনই সাদৃশ্য নাই, অথচ অপর কতকগুলি জন্তুর সহিত খুব সৌসাদৃশ্য আছে। সদৃশ জন্তুগুলিকে এক এক বিভাগের অন্তর্গত করা হয়। আবার সাদৃশ্যের পরিমাণ অনুসারে জন্তু সকল জাতি, শ্রেণী ও বর্গে বিভক্ত হয়। যেমন কতকগুলি জন্তু আছে, তাহাদের শরীরের ভিতর হাড় আছে, মেরুদণ্ড বা পিঠের দাঁড়া আছে, আবার কতগুলি জীব আছে, তাহাদের শরীরে হাড়ের লেশও নাই। যেমন একদিকে মানুষ, বাঘ, গরু, ইন্দুর, টিক্‌টিকি, সাপ. মাছ—আর এক দিকে শামুক, ফড়িঙ্গ, মাকড়ষা, বিছা,—প্রথমোক্ত জীবগুলিকে এক বৃহৎ বিভাগের অন্তর্গত করা হয়—ইহাদিগকে মেরুদণ্ডী বলা যায়। মানুষ, বাঘ, গরু, ইন্দুর, মেরুদণ্ডী বটে; কিন্তু ইহারা আবার টিক্‌টিকি, সাপ ও মাছি হইতে ভিন্ন আর এক শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের সন্তান মাতৃগর্ভ হইতেই ভূমিষ্ঠ হয়, ডিম হইতে ছানা বাহির হয় না। শৈশব অবস্থায় ইহারা মাতৃস্তন পান করে, সুতরাং ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী জাতি বলা যায়। আবার পক্ষীরা মেরুদণ্ডী, কিন্তু ভিন্নজাতি। টিক্‌টিকি, গিরগিটি, কাছিম, কুমীর ও সাপের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা ডিম পাড়ে, ইহাদের গায়ে লোম বা পালকের পরিবর্তে কঠিন ফলক বা শল্কে (আঁইশে) আবৃত থাকে। সেইজন্য ইহাদের দেহ মসৃণ হয় না, দেখিতে রুক্ষ ও বন্ধুর দেখায়। স্তন্যপায়ী জন্তু ও পক্ষীদিগের হৃৎপিণ্ডের গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহাদের রক্তও অপেক্ষাকৃত শীতল। এই জন্য ইহারা অপর এক জাতির অন্তর্গত। ইহাদিগকেই সরীসৃপ বলে।

এখন বুঝিলে, সরীসৃপ কাহাকে বলে? সরীসৃপজাতি আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম কচ্ছপ, ২য় কুম্ভীর, ৩য় গিরগিটি, ৪র্থ সর্প। ইহারা সকলে মাসতুত পিসতুত ভাই, সকলেই সরীসৃপ।

গিরগিটি ও টিক্‌টিকি খুড়তুত ভাই। ঘরের দেওয়ালে যত রকমের টিক্‌টিকি দেখা যায় বা বাগানের মধ্যে গাছে যত রকমের গিরগিটি দেখা যায়, সকলেই একই গিরগিটি শ্রেণীর অন্তর্গত।

গিরগিটিদের গা আঁইশে ঢাকা, সেইজন্য ইহাদের গা খস্‌খসে। ঘরের চালে যে

ভাবে একটা খাপ্‌রা আর একটা খাপ্‌রার উপরে সাজান থাকে, ইহাদের গায়ের শল্ক বা আঁইশও সেইভাবে সাজান থাকে।

গিরগিটি অনেক রকমের হয়। টিক্‌টিকির মত ছোট ছোটও হয়, আবার এক এক জাতীয় গিরগিটি তিন চারি হাত লম্বাও হয়। তোমাদের অনেকে হয়ত 'গুইসাপ' দেখিয়াছ, ইহারাও এক রকম গিরগিটি। ইহারা জলা যায়গায় থাকে, মাছ ব্যাঙ, সাপ, ইন্দুর প্রভৃতি ধরিয়া খায়।



যে ভীষণ জন্তুর ছবি দেখিতেছ, উহা এক প্রকারের গিরগিটি। অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইহাদের বাস। ইহাদের গলার চতুর্দ্দিকে একটা পুরু চামড়ার বন্ধনী বা ঝালর জন্মায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ঝালরটাও বাড়িতে থাকে। এই ঝালরের চারিধারে করাতের দাঁতের মত খাঁজকাটা। এই কাঁটাগুলি খুব শক্ত। গিরগিটি ইচ্ছা করিলে এই ঝালরটিকে গুটাইয়া রাখিতে বা প্রসারিত করিতে পারে। ছাতা বন্ধ করিলে কাপড়টা যেমন ভাঁজ ভাঁজ হইয়া বাঁটের চারিদিকে জড়াইয়া পড়ে, ইহাদের ঝালরও বন্ধ হইলে সেইরূপ ভাঁজ গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

এই ঝালরের সাহায্যে ইহারা এক গাছ হইতে অপর গাছে বা এক ডাল হইতে অনেক দূরের অপর এক ডালে সহজে লাফাইয়া যাইতে পারে। ইহারই সাহায্যে লাফ দিয়া ইহারা পোকা মাকড় বা খুব ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খায়। আকাশে বেলুন হইতে যেমন প্যারাসুটের সাহায্যে সহজে নীচে নামা যায়, ছাতার ন্যায় এই ঝালরের সাহায্যে. এই গিরগিটিও অনেক দুর সহজে লাফাইয়া যায়। যখন ইহারা লাফ দিয়া এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে যায়, তখন ইহাদের গলার ঝালরটা ছাতার মত বিস্তৃত হইয়া পড়ে

এবং বোধ হয় যেন গিরগিটিটা ডানার সাহায্যে উড়িয়া যাইতেছে। এইজন্যই ইহাদিগকে "উড্ডীয়মান কৃকলাস্" কহে।

ইহারা লেজশুদ্ধ দুই বা আড়াই হাত লম্বা হয়। ইহাদের গায়ের রং মেটে এবং সেজে কাল কাল ডোরা আছে।

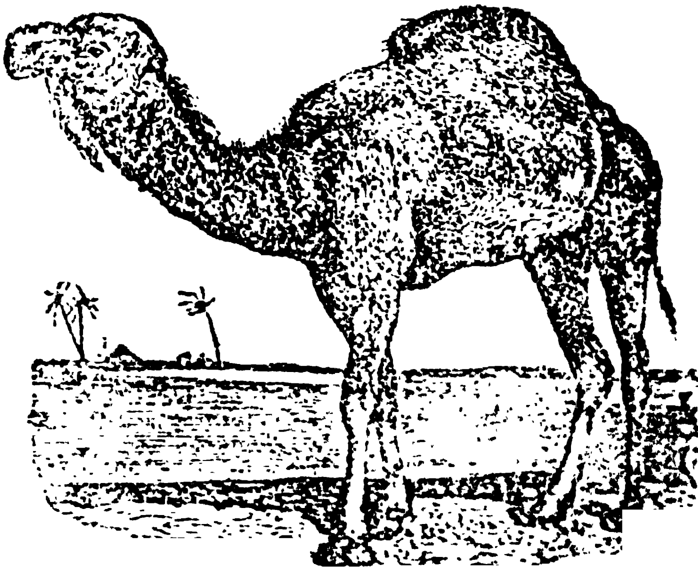
ইহারা যখন স্থিরভাবে থাকে, তখন এই ঝালর গুটান থাকে, লাফ মারিবার সময় বিস্তৃত হয়। ইহারা ভয় পাইলে বা রাগিলে, ঝালর ফুলাইয়া সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া, মাথা খুব উঁচু করিয়া দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়ায়। তখন দেখিলে সত্য সত্যই ভয় হয়। ইহাদের সাহসও খুব, রাগিলে বা বিপদে পড়িলে, মানুষ ও বড় বড় জন্তুদিগকেও তাড়া করিয়া কামড়াইতে যায়।

জাবা বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে আর এক প্রকারের উড্ডীয়মান কৃকলাস দৃষ্ট হয়। সেগুলি ইহাদের অপেক্ষা ছোট, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। তাহাদের উড়িবার যন্ত্রটা গলার চারিদিকে না হইয়া, গায়ের দুইপাশে সম্মুখের পা হইতে পিছনের পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সেই ঝালরে ছাতার সিকের মত সরু সরু হাড় থাকে। আমরা যে কৃকলাসের ছবি দিলাম, তাহাদের ঝালরে কোন হাড় নাই।

সখা ও সাথী । অগ্রহায়ণ ১৩০১ । পৃ. ১৪২-১৪৫

উট

আরব পারস্য ও আফ্রিকার উত্তরাংশে, এক স্থান হইতে অন্য কোন দূর স্থানে যাইতে হইলে মরুভূমি পার হইয়া যাইতে হয়। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ বালুরাশি, বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত চলিলে কোথাও বিন্দু মাত্র জল পাওয়া যায় না। এই সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার পরিবর্ত্তে উটের সাহায্যের দরকার হয়।



এক একটা উট ৬০ কিম্বা ৭০ মণ পর্য্যন্ত ভারি বোঝা পিঠে করিয়া, বহু দূর পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এত বোঝা লইয়া দ্রুত চলিতে পারে না, ধীরে ধীরে ঘণ্টায় দেড় ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পথ চলিয়া থাকে।

দুই জাতীয় উট দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় উটের পিঠে দুইটা কুঁজ থাকে। অপর এক জাতীয়ের পিঠে একটি মাত্র কুঁজ থাকে। এক কুঁজ বিশিষ্ট উট আবার দুই রকমের আছে। এক রকমের উট কিছু অলস প্রকৃতির হয়। তাহারা দ্রুত হাঁটিতে পারে না, ঘণ্টায় এক ক্রোশ বা দেড় ক্রোশের অধিক কিছুতেই চলিতে পারে না। অন্য প্রকারের উটগুলি বেশ পরিশ্রমী; ইহাবা বেশ দ্রুত চলে, ঘণ্টায় চার পাঁচ ক্রোশ হাঁটিতে পারে। ইহারাই চড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উটের পিঠে চড়িয়া চলাটা কিন্তু বড়ই কষ্টকর। ঘোড়ায় চড়াব মত আরাম ইহাতে নাই। চলিবার সময়ে ইহারা এক পার্শ্বের দু'টা পা'ই একসঙ্গে উঠাইয়া সম্মুখে ফেলে। সুতরাং একবার ডান্ দিকে ও একবার বাঁদিকে দুলিতে থাকে। এবং যখন দ্রুত চলিতে আরম্ভ করে, তখন আরোহীর পিঠে বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, প্রতি ক্ষণেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। এবং এত ঝাঁকুনি লাগে যে, হাড় গোড় সব ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া বোধ হয়।

উট ঘোড়ার মত শীঘ্র দৌড়িতে পারে না বটে; কিন্তু ঘোড়া অপেক্ষা অনেক কষ্ট সহিষ্ণু। অক্লেশে ক্রমাগত ১৮—২০ ঘণ্টার অধিক কাল চলিতে পারে, ইহার মধ্যে বিশ্রামের আবশ্যক হয় না। প্রয়োজন হইলে অবিশ্রান্ত দুইদিন ধরিয়া পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া চলিতে দেখা গিয়াছে।

ইহাদের শরীরের গঠন প্রণালী মরুভূমিতে চলিবার উপযোগী। ইহাদের পা ঘোড়ার বা গরুর পায়ের মত নহে। ইহাদের পায়ের তলা খুব বড় ও চেটাল এবং আঙ্গুলের তলাগুলি নরম মাংসপিণ্ডে পূর্ণ। সুতরাং শরীরের চাপে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বালুকার মধ্যে ডুবিয়া যায় না। গরু ও ঘোড়ায় যেখানে চলিতে ক্লেশ হয়, উট সেখানে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। উটের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইবার সময় উটকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িতে হয়। কারণ উট এত উঁচু যে তাহার পিঠে বোঝা তুলিয়া দেওয়া বড় সহজ নহে। কঠিন ঘর্ষণে হাঁটুর ছাল উঠিয়া না যায়, এই জন্য হাঁটু ও বুকেতে অত্যন্ত পুরু ও কঠিন চামড়া আছে।

ইহাদের নাকের ছিদ্র এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, মরুভূমির এককণা বালিও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে মরুভূমিতে প্রায়ই যে বালুকাময় ঝড় উঠে, তাহার ভিতরে পড়িয়া ইহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। কারণ এই সময় এত বালি আসিয়া নাকের ভিতর প্রবেশ করে যে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়।

উটের গলা খুব লম্বা এবং বক বা রাজহাঁসের গলার মত বাঁকান। উটের শরীরের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য পদার্থ—তার পিঠের কুঁজ। ঐ কুঁজ দেখিয়া তোমরা মনে করিতে পার যে, উটের পিঠের দাঁড়া বা মেরুদণ্ডটাই বুঝি ঐ রকম বাঁকা, তা নয়; মেরুদণ্ডটা ঠিক সোজাই আছে। কুঁজটি মাংস ও চর্ব্বির একটা পিণ্ড মাত্র।

উট যখন সুস্থ শরীরে থাকে তখন ঐ পিণ্ড বা কুঁজটি খুব বড়, শক্ত ও স্ফীত থাকে। শরীর অসুস্থ ও রুগ্ন হইলে ছোট ও নরম হইয়া পড়ে, মরুভূমিতে বহুদিনের পথ চলিবার সময়ে যখন ভাল করিয়া খাইতে পায় না, তখন উটের কুঁজ ক্রমেই ছোট হইয়া যাইতে থাকে, এমন কি একেবারে অদৃশ্য হইয়াও যাইতে দেখা গিয়াছে। পরে উত্তম আহার পাইলে ও শরীর সুস্থ হইলে এক মাসেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় বড় হইয়া উঠে।

উটের শরীরের ভিতর পানীয় জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কৌশল আছে, এইজন্যই তাহারা বিনা ক্লেশে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতে পারে। মরুভূমিতে বহুক্রোশের মধ্যেও জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, তরুলতা কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেখানে জল কোথায় পাওয়া যাইবে! মানুষেরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য পানীয় জল চামড়ার বড় বড় মসকে, পুরিয়া উটের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। উটের পাকস্থলীতে কতকগুলি খোপ আছে। জল পান করিবার সময় ইহারা পেটের ভিতরে ঐ খোপগুলি জলপূর্ণ করিয়া লয়। উট সেই খোপের মুখগুলি ইচ্ছা করিলে খুলিতে বা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। যখন তৃষ্ণা পায়, তখন সেই খোপগুলির মুখ খুলিয়া দিয়া খানিকটা জল পেটের ভিতর পাকস্থলীতে ঢালিয়া লইতে পারে। তাহাতেই ভুক্ত দ্রব্য তরল হয় ও শরীরে সে জল শোষিত হইয়া উটের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। এইজন্য ইহারা ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত জল পান না করিয়াও থাকিতে পারে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, মরুভূমি মধ্যে যাত্রীদিগের সহিত যে জল ছিল, তাহা সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তাহারা প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া নিষ্ঠুরের ন্যায় উট বধ করিয়া, তাহাদের উদরের ভিতরের সেই জলের থলি হইতে জল বাহির করিয়া পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য সে জল খাইতে ভাল নয় বরং অতিশয় বিস্বাদ, কিন্তু তৃষ্ণার যন্ত্রণায় যখন মরিতে পড়ে, তখন সেই জলই অমৃতস্বরূপ বোধ হয়।

আরবেরা উটের মাংস খায় ও উটের দুধ পান করে। দুধ টাট্‌কা খায় না। বাসি করিয়া টক-হইলে পর উপাদেয় মনে করিয়া পান করে। উটের মাংস খুব উপাদেয় মনে করে বটে, কিন্তু উট বহুমূল্য, সুতরাং সচরাচর সকলে উটের মাংস খাইতে পারে না।

উটের লোমে আরবীয়েরা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। ইহার লোমে চিত্রকরদিগের তুলিও নির্ম্মিত হয়।

উটের মেজাজ বড় খারাপ, বড়ই রুক্ষ স্বভাব। পৃষ্ঠে বোঝা লইবার সময় বড় জ্বালাতন করে। মাঝে মাঝে বড় হিংস্র স্বভাবের পরিচয় দেয়। মরুভূমি পার হইবার সময়ে বহুযাত্রী ও বহু উষ্ট্র দলবদ্ধ হইয়া গমন করে। উষ্ট্রগণ সৈন্যদলের ন্যায় তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। অনেক সময় মরুভূমিতে গমনকালে, অনেক লোক

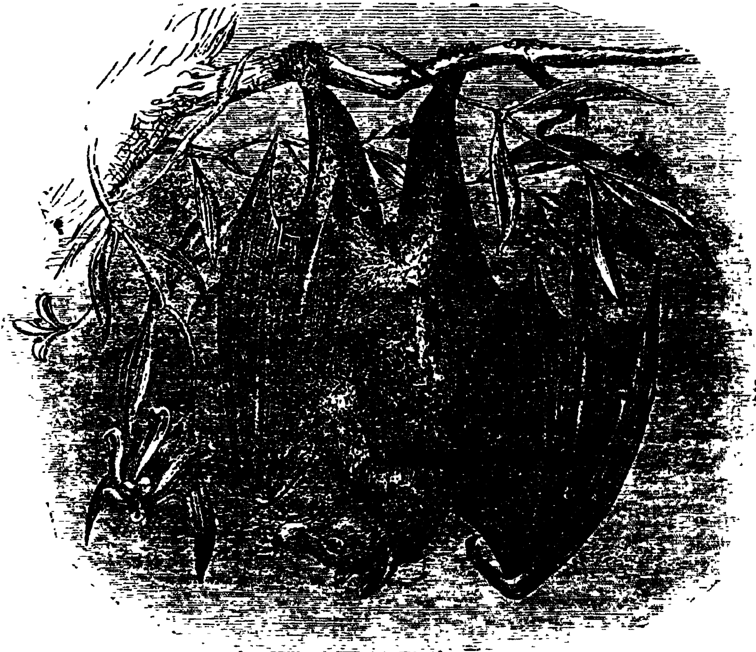
ও অনেক উট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উটের সাহায্য ব্যতীত মরুভূমি পার হওয়া যায় না বলিয়া, উটকে "মরুভূমির" জাহাজ বলে।

দুই কুঁজবিশিষ্ট উট, মধ্য আসিয়া, চীন ও তিব্বত দেশে পাওয়া যায়। ইহারা আরব দেশীয় এক কুঁজ বিশিষ্ট উটের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু নহে। ইহারা তিন দিবস অন্তর জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহারা ঠাণ্ডা দেশে বেশ থাকে, এবং খুব শীত সহ্য করিতে পারে। ইহারা পর্ব্বতে সহজে উঠিতে ও নামিতে পারে এবং তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের জন্য ইহারা বিশেষ উপযোগী। এই দুই কুঁজ বিশিষ্ট উট গাড়ি টানিবার জন্য ঐ সকল দেশে নিযুক্ত হয়। পারস্য দেশে ইহাদিগকে যুদ্ধের কামান টানিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহারা খুব শীঘ্র চলিতে পারে না, তবে প্রত্যহ ১৫ ক্রোশ ক্রমাগত এক মাস ধরিয়া চলিতে পারে।

সখা ও সাথী । মাঘ ১৩০১ । পৃ ১৮৯-১৯২

বাদুড়

সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রে চাঁদের আলোকে আকাশে অনেক বাদুড় উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা কেহ কেহ হয়ত বাদুড়কে পাখী মনে কর, কারণ ইহারাও পাখীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু বাদুড় পাখী নহে। পাখীদের সঙ্গে বাদুড়ের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। পাখীদের গায়ে পালক থাকে, বাদুড়ের গায়ে পালক নাই। পাখীদের মুখে ঠোঁট বা চঞ্চু থাকে, তাহারা ডিম পাড়ে, তাহাদের মুখে দাঁত নাই। বাদুড়ের দাঁত আছে, বাদুড় ডিম পাড়ে না। ইহাদের শাবক মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় ও মাতার স্তন পান করে।



ইহাদের হাতের আঙ্গুলগুলি খুব লম্বা। ইহাদের শরীর যত লম্বা, হাতের এক একটা আঙ্গুল তত লম্বা। এই আঙ্গুলগুলি হাতের কব্জা হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কাগজের মত পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ছাতার শিকগুলির সহিত ছাতার কাপড় যেমন সংযুক্ত থাকে, ইহাদের ডানা অনেকটা সেই কৌশলে গঠিত।

ইহারা ডানা বিস্তৃত করিয়া পাখীদের মত অক্লেশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। ইহাদের ডানার চামড়া স্কন্ধ, পার্শ্বদেশ, পা ও লেজের সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহারা অক্লেশে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু মাটির উপর দিয়া সহজে হাঁটিয়া যাইতে পারে না। যদি কখন মাটির উপর পড়িয়া যায়, তবে অতি কষ্টে কোনও প্রকারে গুড়ি মাড়িয়া কোন একটু উচ্চস্থানে উঠিয়া তথা হইতে ডানা প্রসারিত করিয়া বাতাসে ভর দিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়।

ইহারা যখন বিশ্রাম করে বা নিদ্রা যায় তখন কোন উচ্চ স্থানে সুবিধা মত ধরিবার কোন অবলম্বন পাইলে, পশ্চাতের পায়ের নখ দ্বারা তাহা ধরিয়া, ডানা গুটাইয়া শরীরটা ঢাকিয়া, মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহারা অন্যান্য জন্তুর মত বসিতে বা শুইতে পারে না, মাথা নীচু করিয়া ঝুলিলেই বসা শোয়ার কাজ হয়। এরূপ ভাবে ঝুলিয়া থাকা আমাদের নিকট বড় কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু ইহাদের নিকট তাহা বড়ই আরাম জনক। দিনের বেলা সমস্ত ক্ষণ অন্ধকার নির্জ্জন স্থানে, বৃক্ষের ডালে বা কোটরে, ঘরের ছাদে বা চালে এইরূপ ঝুলিয়া থাকে, পরে সন্ধ্যার সময়ে আহারের অন্বেষণে বাহির হইয়া উড়িয়া বেড়ায়।

বাদুড় বা চামচিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অধিক সংখ্যক এবং খুব বড় বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। বাদুড়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর বাদুড় কেবল ফল ভক্ষণ করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাদুড় কীট পতঙ্গ খায় এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য জীব জন্তুর রক্ত চুষিয়া খায়।

ফলাহারী বাদুড়েরা এশিয়া খণ্ডের উষ্ণ দেশ সমূহে বাস করে। রক্তপায়ী বাদুড়েরা সাধারণতঃ আমেরিকা দেশে বাস করে। এবং কীট পতঙ্গ-ভুক্ সাধারণ বাদুড়েরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বাস করে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে প্রায় চারিশত পঞ্চাশ প্রকারের বাদুড় আছে! এত গুলি জাতির বিবরণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং আমরা কয়েকটির বিষয় বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

সাধারণ ফলাহারী বাদুড় খুব বড় বড় হয়। ইহাদের মুখের আকার শৃগালের মুখের মত, গা-লোমে আবৃত। ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, সিংহল, মালয়, মাদাগাস্কার, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের

দেশে এই সকল বৃহৎ বাদুড়কে সন্ধ্যার সময়ে দলে দলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে নাড়িতে সোজা উড়িয়া যায়। ইহারা আপন নির্জ্জন আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া, দূরবর্ত্তী যে সকল ক্ষেত্রে ফলপূর্ণ বৃক্ষ থাকে, তথায় দলে দলে যাইয়া ফল খাইয়া ও নষ্ট করিয়া সেই বাগানের বড় অনিষ্ট করে। আহার সমাপ্ত হইলে প্রত্যূষে আপন আবাস বৃক্ষে আসিয়া বৃক্ষের ডালে মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে। এক এক ডালে কুড়ি পঁচিশটা ঝুলিয়া থাকে। যখন সকলে মিলিয়া এক ডালে আশ্রয় লয়, তখন পরস্পর ভারি মারামারি ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়, একে অপরকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। পরে অনেক ঝগড়া বিবাদের পর সকলে স্থির হইয়া ঝুলিতে থাকে।



ভারতবর্ষে ফলাহারী বাদুড় অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় ফলাহারী বাদুড় আছে তাহাদের মুখ লম্বা নহে, গোল। ইহারা গাছে বিশেষতঃ তালগাছে, পাহাড়ের ফাটলে ও পরিত্যক্ত গৃহে বাস করে। ইহারা গৃহস্থের বড় ক্ষতি করে। ইহাদের জন্য বাগানে কলা, আম ও পেয়ারা থাকিবার যো নাই। খাইবার সময়ে বাদুড়

গাছের ডালে এক পা বাধাইয়া ঝুলিতে থাকে, অপর পায়ে ফলটি ধরিয়া খাইতে থাকে। আর এক প্রকার ফলাহারী বাদুড় আছে তাহারা খুব ছোট হয়।

পতঙ্গভুক্ বাদুড় বা চামচিকা আকারে ফলাহারী বাদুড় অপেক্ষা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হয়। আমরা ঘরের চালে, অন্ধকার ঘরের দেয়ালে বা ছাদে, যে সকল চামচিকা ঝুলিয়া থাকিতে দেখি, অথবা সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রে যে সকল চামচিকাকে ঘরের ভিতর আসিয়া ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া বেড়াইতে দেখি, তাহারা প্রায় সকলেই পতঙ্গ ভুক্। আকাশে বা ঘরের ভিতর যে সকল মশা, মাছি বা অন্য কীট পতঙ্গ আমরা উড়িতে দেখি, ইহারা তাহাই ধরিয়া খায়। বাদুড় যে রকম করিয়া উড়িয়া থাকে, চামচিকা সে প্রকার করিয়া ওড়ে না। বাদুড় ধীরে ধীরে সোজা উড়িয়া যায়। চামচিকা এদিক্ ওদিক্ করিয়া নানা বক্রগতিতে খুব দ্রুত উড়িতে থাকে। বাদুড় অনেকটা চাতক বা তালচঞ্চু পাখীর ন্যায় উড়িয়া থাকে।

এক এক জাতীয় পতঙ্গভুক্ বাদুড়ের চেহারা বড় কিম্ভূত কিমাকার। নাকের উপরের গঠন কতকটা গাছের পাতার মত হয়। মুখখানা ঘোড়ার মুখের মত।

অনেক পতঙ্গভুক্ বাদুড় ছোট ছোট পাখী, ও ভেক প্রভৃতি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়াও খায়। প্রাচীন দেব মন্দির, পুরাতন পরিত্যক্ত গৃহ, অন্ধকার গুদামঘর বা গোলাঘর প্রভৃতি চামচিকার প্রিয় বাসস্থান। বাদুড় ও চামচিকা গ্রীষ্মকালে যত বাহিরে আইসে, শীতকালে তত নহে। শীতের সময়ে ইহারা দেওয়ালের ফাটলে বা অন্য কোন নিভৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে।

বাদুড় ও চামচিকা নানা বর্ণের হয়. কোন কোন জাতীয় বাদুড় রৌপ্য বর্ণের হয়; কোন কোন জাতীয় বাদুড়ের রং কমলা নেবুর রঙ্গের মত, কোন কোনটা আবার ঘোর কৃষ্ণ বর্ণেরও হয়। ইহাদের সাধারণ রং কিন্তু ধূসর।

রক্তপায়ী বাদুড় প্রায় সমুদয়ই আমেরিকা প্রদেশে বাস করে। ইহারা আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন জাতি পতঙ্গভুক্,তবে সন্দেশ রসগোল্লা বা চাট্নি প্রভৃতির দ্বারা আমরা যেমন রসনার তৃপ্তি সাধন করি ইহারাও তেমনি মধ্যে মধ্যে রক্ত পান করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া লয়। আবার কোন কোন জাতি কেবল ঘোড়া. গোরু, মানুষ প্রভৃতি অন্যান্য বৃহৎ প্রাণীর রক্ত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে।

মানুষ যখন অনাবৃত স্থানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, ইহারা সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া তাহার রক্ত চুষিয়া খায়। রক্ত চোষা শুনিলে ভয় হয়। মনে হয়, যাহার রক্ত ইহারা চুষিয়া খায় তাহার কতই না যন্ত্রণা হয়। কিন্তু তাহা নয়। ইহারা খুরের মত ধারাল তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র দন্ত দ্বারা, পায়ের আঙ্গুলের, হাতের বা অন্য কোন স্থানের অল্প একটু চামড়া কাটিয়া লয় ও সেই কাটা স্থানে মুখ দিয়া রক্ত চুষিয়া খায়, খাইয়া তৃপ্তি হইলে তবে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। নিদ্রিত ব্যক্তি সে সময়ে ইহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে

পারে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া কেবল মাত্র রক্ত হানি বশতঃ শরীর দুর্ব্বল বোধ করে, এবং ক্ষতস্থানে সামান্য বেদনা অনুভব করে, আর বিশেষ কোন জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে না। ইহারা গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ হইতে রক্ত চুষিয়া খায়। ঘোড়ার পিঠে এই জন্য মাঝে মাঝে ঘা হয় ও ফুলিয়া উঠে।

রক্তপায়ী বাদুড় বড় হয় না। ইহারা আমাদের চামচিকার মত ক্ষুদ্র জীব, ইহাদের শরীর তিন বা চারি ইঞ্চির অধিক বড় হয় না।

সখা ও সাথী । বৈশাখ ১৩০২ । পৃ. ১১-১৫

প্রাকৃতিক গহ্বর

জলে মাটি গলিয়া যায়। জলে যে পাথরও গলে তা তোমরা হয়ত অনেকে জান না। যাহারা প্রাকৃত ভূগোল পড়িয়াছ, তাহারা জান যে বৃষ্টির জল যখন পাহাড়ে জায়গার উপর দিয়া গড়াইয়া যায় তখন খানিকটা করিয়া পাথর গলিয়া সেই জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তাই বলিয়া চিনি বা লবণ যেমন সহজে জলে গলিয়া যায়, মাটি বা পাথর সে রকম সহজে গলে না। বাতাসে অঙ্গারক বাষ্প নামক এক পদার্থ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, বৃষ্টির সময়ে বায়ু হইতে সেই পদার্থ বৃষ্টির জলে মিশিয়া যায়। আবার সেই বৃষ্টির জল যখন মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, তখনও তাহাতে অনেক অঙ্গারক বাষ্প মিশিয়া যায়। কারণ মাটিতে সর্ব্বদাই গাছপালা বা জীবজন্তুর দেহ পচিয়া গলিয়া মাটির সহিত মিশিয়া থাকে। গাছপালা বা জীবজন্তু পচিলে তাহা হইতে অঙ্গারক অম্ল উৎপন্ন হয় ও তাহাও মাটিতে মিশিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ জল, পাথর ক্ষয় করিতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টির জলে বাতাস ও মৃত্তিকা হইতে অঙ্গারক অম্লমিশ্রিত হইলে, সেই জল পাথর প্রভৃতি কতক কতক গলিয়া যায়, জলের রং দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যেমন জলে চুন গুলিয়া পরে সেই জল স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, চুনের উপর স্বচ্ছ পরিষ্কার জল রহিয়াছে, অথচ কিন্তু সেই জলে প্রচুর পরিমাণে চুন মিশিয়া রহিয়াছে। যে দেশে চুনময় প্রস্তর (যে পাথর পোড়াইয়া চুন হয়) প্রচুর পরিমাণে থাকে, সে দেশের জমি স্থানে স্থানে জলে ক্ষয় হইয়া গর্ত্ত গহ্বর ও ছোটবড় নানা প্রকার সুড়ঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ যেখানে কেবল চুনো পাথর আছে, সেখানে মাটির তলায় এইরূপ জলে পাথর গলিয়া, আপনা আপনি কত সুন্দর সুন্দর গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার একটি গহ্বরের ছবিও দেখ।* জলে পাথর ক্ষয় হইয়া কত বড় প্রকাণ্ড এক গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে দেখ। এই গহ্বর ট্রাস্ট নগর হইতে এগারো ক্রোশ উত্তরে এডেল্‌সবর্গ নামক স্থানে আছে। কেবল পাথর ক্ষয় হইয়াই যে গহ্বরটি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নহে। এই গহ্বরের ছাদের উপর হইতে যে জল চুয়াইয়া পড়ে, তাহাতে পাথর গলিয়া মিশিয়া থাকে। বাতাস লাগিয়া জল খানিকটা বাষ্প হইয়া গেলে, এবং

*ছবি দেওয়া যায় নি।

সেই জল হইতে অঙ্গারক বাষ্প বা লবণ গোলা থাকিলে জল শুকাইলে আবার চিনি বা লবণ বাহির হইয়া পড়ে। মোমবাতীর গা বহিয়া মোম গড়াইয়া জমিয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ এই গহ্বরের ছাদ হইতে জলের সহিত পাথর গলিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আবার জমিয়া যায়। এইরূপে গলিত পাথর জমিয়া ঝাড়ের কলমের মত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। উপর হইতে নীচে যেখানে যেখানে আবার জল পড়িয়াছে সেখানেও পাথর জমিয়া জমিয়া উপর দিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে আবার উপর হইতে পাথর জমিয়া ক্রমে নীচে নামিয়া আসিয়া এবং নীচের পাথর জমিয়া জমে উপরে উঠিয়া, একত্র মিশিয়া প্রকাণ্ড পাথরের থাম তৈয়ার হইয়াছে।

আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশেও এইরূপ বহু ক্রোশ বিস্তৃত প্রকাণ্ড অনেক গহ্বর বা সুড়ঙ্গ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের ভিতর দিয়া দেখিতে বড়ই চমৎকার। ইংলণ্ডের ডিভনসায়ার প্রদেশেও অনেক প্রাকৃতিক গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষে কাটিয়া খুঁড়িয়া এই গহ্বর তৈয়ার করে নাই। প্রকৃতি আপনিই জলের দ্বারা খুদিয়া এইরূপ গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রাকৃতিক গহ্বর বলে। ভারতবর্ষের ও নানা স্থানে পাহাড়ে জায়গায় প্রাকৃতিক গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেন্টাকি প্রদেশের ও এডেলস্‌বর্গের গহ্বরের মত বড় ও সুন্দর কোনটাই নয়।

এই সকল প্রদেশের প্রস্তর নির্ম্মিত জলে কিছু পড়িয়া তাহা প্রস্তর মণ্ডিত হইয়া ঠিক যেন পাথরের জিনিস হইয়া যায়। গাছের ডাল, পাখীর বাসা, ধান, ছোলা, মটর এই জলে ডুবাইয়া রাখিলে, অনেক দিন পরে দেখিতে পাইবে, সেই সকল দ্রব্য পাথরের হইয়া রহিয়াছে। রাজমহল পাহাড়ের কাছে গঙ্গায় কোন কোন সময়ে পূর্ব্বে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে, তাহাতে যে শস্য ছিল, তাহা অনেক দিন জলের মধ্যে থাকায়, সেগুলি পাথরের মত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে।

সখা ও সাথী । আষাঢ় ১৩০২ । পৃ. ৫১-৫৩

ঈগল্ পাখী

ঈগল্ পাখী চিল ও বাজপাখীর জাত। এই জাতীয় পাখীরা ছোট ছোট জীবজন্তু মারিয়া খায় বলিয়া, ইহাদিগকে শিকারী পাখী বলে।



ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার পাহাড়ে জায়গায়, ঈগল্‌পাখীর বাস। ঈগল্ পাখী নানাপ্রকারের হয়। তাহার মধ্যে গোল্‌ডেন্ ঈগল্ সকলের অপেক্ষা বড়। ইহাদের শরীরের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ, মাথা, গলা ও বুকের রং সোণালী লাল। মাথা ও গলার পালকগুলি রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজিতে গোল্‌ডেন্ (সোণালী) ঈগল্ বলে। ইহারা দুই হাত লম্বা হয়। ইহাদের ডানা দুইখানি ছড়াইলে ছয় হাত বিস্তৃত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের সোণালী ঈগলপাখী গুলি বড় ও দেখিতে সুন্দর। ঈগল্‌পাখী খুব উঁচু পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ডাল পালা দিয়া আপন বাসা তৈয়ার করে। যেখানে একবার বাসা

নির্ম্মাণ করে, সেখান হইতে শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া যায় না, অনেক বৎসর ধরিয়া একই স্থানে বাস করে। ইহারা আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া থাকে। এত দূরে উঠে যে, ভূতল হইতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে উঠিবার সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে এবং এক এক পাকে অনেকটা উপরে উঠিয়া যায়। উড়িবার সময়ে ইহারা স্থির ভাবে উড়ে। প্রথমে দুই চার বার ডানা নাড়িয়া লয়, তার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডানা না নাড়িয়া উড়িতে পারে। তোমরা চিল উড়িতে দেখিয়াছ। চিল যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং উড়িবার সময়ে ডানা নাড়ে না, ঈগল পাখীও সেই রূপ করিয়া উড়ে। ইহারা এত বেগে উড়িয়া যাইতে পারে যে, ঘন্টায় ২৫ ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাদের দৃষ্টি শক্তি খুব তীক্ষ্ণ। আকাশের বহু উচ্চ স্থান হইতেও নীচে কোথায় ইহাদের খাইবার উপযুক্ত কোন্ প্রাণী আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। একবার দেখিতে পাইলে সোঁ করিয়া বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ছোঁ মারিয়া, তাহাকে নখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। অন্যান্য পাখী, ইঁদুর, খরগোস, ভেড়া ও ছাগলের ছানা ইহাদের খাদ্য। শিকার পায়ের দ্বারা ধরিয়া আনন্দে শব্দ করিতে করিতে আপন বাসায় উড়িয়া চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া ধারাল বাঁকা ও শক্ত ঠোঁট দিয়া তাহা ছিঁড়িয়া আপন ছানাগুলিকে খাবার ভাগ করিয়া দেয় এবং নিজে খায়। ইহাদিগকে কখন কখন বড় বড় ভেড়া ও ছাগল এবং বাছুর ও হরিণ পর্য্যন্ত মারিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে। সুযোগ পাইলে ইহারা ছোট ছোট ছেলে পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যায়! একবার স্কটলণ্ড দেশে কোন স্ত্রীলোক আপনার ছেলেটিকে মাটীতে শোয়াইয়া নিকটে ঘাস কাটিতেছিল। একটা ঈগল্‌পাখী কোথা হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া, বেগে আসিয়া চক্ষের পলকে তাহাকে নখে করিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। মাতা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। চারিদিকে সকলে হৈ চৈ করিতে লাগিল। একজন লোক সেই ঈগলের পিছনে ছুটিল। সেই স্ত্রীলোকটি ছেলের জন্য পাগলের মত হইয়া, এক খানি কাস্তে হাতে পর্ব্বতপানে ঈগলের বাসার দিকে ছুটিল। পাহাড়টা খুব খাড়া ও উঁচু, তাহার উপর উঠা বড় কঠিন। স্ত্রীলোকটি উঠিতে গিয়া কতবার পড়িয়া গেল, কত আঘাত পাইল, তাহার শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল তথাপি আপন জীবনের মায়া না করিয়া অতি কষ্টে পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিল। সেখানে দেখিল ঈগলের বাসায় তাহার শিশুটি পড়িয়া রহিয়াছে। মাঠে যেরূপ ভাবে তাহার শরীর কাপড়ে ঢাকা ছিল, তখনও সেইরূপই রহিয়াছে, এবং তাহার শরীরে কোন আঘাৎ বা আঁচড় লাগে নাই। ঈগল্ পাখী সেই স্ত্রীলোকটির চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাকে ডানা দ্বারা আঘাত করিতে ও নখের দ্বারা আঁচড়াইতে চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকটিও হাতের কাস্তের দ্বারা ঈগল্‌কে তাড়াইতে লাগিল। অবশেষে ছেলেটিকে কাপড় দিয়া বুকের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া, পাহাড় হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। সে অর্দ্ধেক পথ আসিয়া বন্ধুদিগকে দেখিতে

পাইল। সকলে মাতার বীরত্বের প্রশংসা করিল এবং ছেলেটির শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ফিরিয়া গেল।

আমেরিকায় হার্পি ঈগল্ নামে এক প্রকার খুব বড় শিকারী পাখী আছে। ইহারা গোরু ও মেষপালকের বড়ই ক্ষতি করে। গোরু ও ভেড়ার পালের ভিতর হইতে



হার্পি ঈগল।

বাছুর ও ভেড়া ধরিয়া লইয়া যায়। ইহারা বড় বড় হরিণ মারিয়াও খায়। হরিণ ধরিতে হইলে হরিণের মাথার কাছে আসিয়া ডানা দিয়া চোখে মুখে আঘাত করে, নখ দিয়া চোখ আঁচড়াইয়া অন্ধ করিয়া দেয়। হরিণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ করিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া হার্পি ঈগলের হাতে প্রাণ হারায়।

খরগোস ধরিবার সময়ে ঈগল্ পাখী একটু চালাকী করে। খরগোস প্রায়ই ঝোপের মাঝে লুকাইয়া থাকে। সেখান হইতে সহজে ধরা যায় না। তাই দুইটা ঈগল্ এক জোটে খরগোস ধরিতে যায়। একটা ঝোপ হইতে একটু দূরে আড়ালে বসিয়া থাকে। আর একটা ঝোপের নিকট গিয়া শব্দ করে ও উড়িয়া গিয়া সেই ঝোপে ডানার আঘাত করিতে থাকে। খরগোস ভয় পাইয়া যেমন সেখান হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, অমনি সেই ঈগল্টা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

একবার এক ঈগল্ শিকারের হাতে খুব জব্দ হইয়াছিল! ঈগল্ একটা বিড়াল ধরিয়া লইয়া যায়। বিড়ালটা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ঈগল্কে অস্থির করিয়া তোলে। ঈগল্ দেখিল বিড়াল ধরিয়া সে মহা বিপদে পড়িয়াছে। এখন তাহাকে ছাড়িতে পারিলে বাঁচে। বিড়ালকে ফেলিয়া দিতে সে কত চেষ্টা করিল; বিড়াল কিন্তু ঈগল্কে নখ দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল, কোনমতেই ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছিল, ঈগল্কে ছাড়িলেই, অত উপর হইতে নীচে পড়িয়া যে চূর্ণ হইয়া যাইবে। ঈগল্ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবশেষে মাটীতে আসিয়া পড়িল। তখন বিড়াল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইল।

সখা ও সাথী । শ্রাবণ ১৩০২ পৃ. ৬৪-৬৭

সাপ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে অনেক সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বিষ আছে, আর কতকগুলির বিষ নাই। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর অনেক লোক সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে সাপেরা পথের উপরে শুইয়া হাওয়া খায়। গরমের সময়ে রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গেলে, সাপেদের খুব আনন্দ হয় এবং এই সময়ে তাহারা ব্যাং ধরিয়া খাইবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সময়ে কোথাও যাইতে হইলে আলো ভিন্ন পথে চলিবে না। পায়ে জুতা বা খড়মের শব্দ করিয়া হাঁটিবে, অথবা হাতে লাঠি লইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিতে করিতে যাইবে।

সাপ নানা জাতীয় হয়। পৃথিবীতে এক হাজারেরও বেশী রকমের সাপ আছে। খুব শীতপ্রধান দেশে সাপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অনেক রকমের সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি সাপ আছে, তাহারা কেবল মাটিতেই বেড়ায়; কতকগুলি জলেই থাকে, কতকগুলি আবার গাছে গাছেই থাকে, আর কতকগুলি কেবল সমুদ্রেই থাকে। কতকগুলি খুব ছোট---আধ হাত মাত্র, কতকগুলি খুব বড়— কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই সকল সাপের মধ্যে ও কতকগুলির বিষ আছে, কতকগুলির বিষ নাই।

বাঙ্গালা দেশে গোখুরা, কেউটিয়া, কালাজ এবং কেরোতা সাপই খুব বিষাক্ত। এই সকল সাপের কামড়েই মানুষের মৃত্যু হয়।

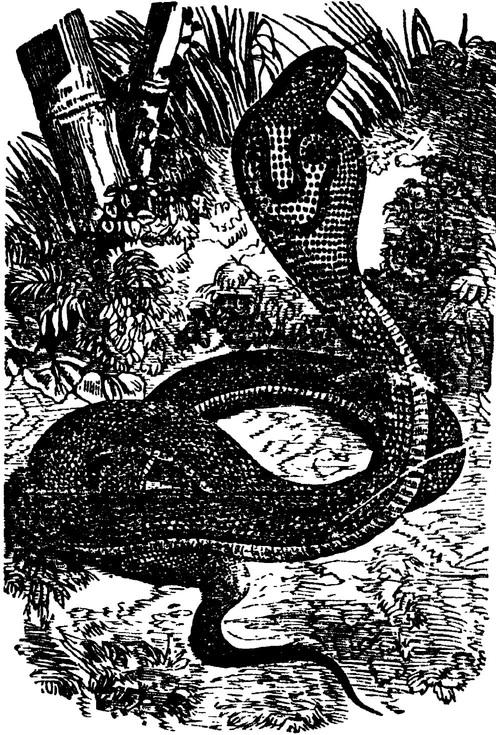
গোখুরাকে খরিষও বলে। গোখুরা ও কেউটা একই জাতীয় সাপ। কিন্তু ইহারা নানা প্রকারের হয়। সচরাচর চারি প্রকারের গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। 'খই'য়ে গোখুরা, শাঁখামুটী গোখুরা, কালী গোখুরা এবং পদ্ম গোখুরা। গোখুরা ও কেউটে সাপে ফণা ধরে, অন্য কোন বিষাক্ত সাপে ফণা ধরিতে পারে না। ইহাদের গলার কাছে প্রায় গোটা কুড়ি পাঁজর খুব লম্বা এবং এই পাঁজরের উপর যে মাংস ও চামড়া আছে, তাহাও খুব চওড়া।

এই বিস্তৃত চ্যাটাল অংশটাকে ফণা বলে। গোখুরা ইচ্ছা মত এই ফণা কমাইতে ও বাড়াইতে পারে। রাগিলেই মাথা উঁচু করিয়া লেজের ভরে সোজা হইয়া দাঁড়ায় ও খুব বড় ফণা ধরে। ফণার উপর গোরুর খুর, নূপুর বা চস্‌মার মত দাগ্ থাকে। ঐ বড় ছবিতে দেখ গোখুরা কেমন ফণা ধরিয়াছে।

'খই'য়ে গোখুরাব গায়ে সাদা সাদা খইয়ের মত দাগ আছে। ইহারা প্রায় তিন হাত লম্বা হয়।

সুন্দর বনে হল্‌দে শাঁখামুটী (শঙ্খচূড়?) গোখুরার রং হল্‌দে, দেখিতে ঢোঁড়া সাপের মত। ইহারা আকারে খুব বড় হয়। ইহারা চার পাঁচ হাত লম্বা হয়। ইহাদের রাগ অত্যন্ত বেশী। ফণাটি কুলার মত বড়। ইহারা লেজে ভর দিয়া মানুষের সমান উঁচু হইয়া উঠে ও তাড়া করিয়া কামড়াইতে যায়। ইহাদের বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। ইহারা অন্যান্য সাপ ধরিয়া খায়।

কালী গোখুরার রং কাল ইহারা খুব চঞ্চল ও রাগী। পদ্ম গোখুরা দেখিতে খুব সুশ্রী। গায়ের রং লাল্‌চে তার উপর কাল ছোট ছোট টোপ সাজান।



গোখুরা সাপ অনেকটা ধীর ও শান্ত, হঠাৎ রাগে না ও সহজে দংশন করে না। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, লোক বসিয়া আছে, গোখুরা সাপটি তাহার কোলের উপর দিয়া, পায়ের উপর দিয়া, সুড় সুড় করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দংশন করে নাই। কোন প্রকার শব্দ শুনিলে ইহারা পলাইয়া যায়, তবে যখন বড় ভয় পায় ও আপনাকে বিপদগ্রস্ত মনে করে, তখনই কামড়াইতে যায়। গোখুরা সাপ অনেক সময়ে লোকের বাড়ীতে গর্ত্তের ভিতরে বাস করে ও ইন্দুর ধরিয়া ধরিয়া খায়; কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দংশন করে না। সাপেরা প্রায়ই আপনাদের বাসস্থান ত্যাগ করে না।

কেউটিয়া সাপ দেখিতে প্রায় গোখুরার মত। দুইয়ে প্রভেদ খুব কম। কেউটে গোখুরার চেয়ে কাল। ইহার ফণার উপর যে দাগটা আছে, তাহাও তত পরিষ্কার নহে। ইঁটের পাঁজা ও পুরাতন ভাঙ্গা বাড়িতেই গোখুরা সাপ থাকিতে ভাল বাসে। লোকে বলে, গোখুরা সাপ মানুষের বাড়ির কাছে থাকিতে ভালবাসে আর কেউটে সাপ মাঠে, বিলে, খালে ও ধান ক্ষেতে বাস করে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক স্থানে এত অধিক যে, সাপ ঘরের চালে, বিছানার ভিতর, জুতার মধ্যে, ও ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও লুকাইয়া থাকে। ইহারা এক কালে ২০টা হইতে ৩০টা ডিম পাড়ে ও যতদিন না ডিম ফুটে, ততদিন ডিম গুলিকে জড়াইয়া বসিয়া থাকে। কেবল এক একবার বাহিরে গিয়া চরিয়া আসে। ইহারা পাখী, পাখীর ডিম, ইন্দুর, ব্যাং, মাছ, ও কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। ইউরোপ অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা দেশে গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোখুরা জাতীয় সাপ ছাড়া এ দেশে আরও অনেক বিষধর সাপ আছে। কিন্তু তাহারা ফণা ধরিতে পারে না। উলুবোড়া বা চন্দ্রবোড়া, লাউডগা, রাজসাপ বা শাঁখানি ও কোরোতাই প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কেরোতা সাপই অধিক মারাত্মক। ইহারা চৌকাটে দরজায়, জানালায়, আলমারিতে আসিয়া লুকাইয়া থাকে, এবং এই সকল স্থানে থাকে বলিয়া অনেক সময়ে অনেকে অন্ধকারে দরজা জানালা বা আলমারি খুলিতে গিয়া, ইহাদের কামড়ে প্রাণ হারায়। রাজসাপের মাথাটা তিনকোণা। গায়ে নীল ও হলদে দাগ আছে। এদেশের লোকে বলে, এই সাপের দুটো মুখ। কিন্তু সেটা কল্পনা মাত্র। লেজের আগাটা মাথার দিকের মত মোটা, তাহাতেই লেজটিকেও মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। চন্দ্রবোড়া তিন হাত হয়। গায়ের রং মেটে, তার উপর কাল ও সাদা ডোরা। ইহাদের বিষ দাঁত খুব বড়।

অষ্ট্রেলিয়া দেশেও অনেক বিষধর সর্প আছে। আমেরিকায় 'র‍্যাটেল স্নেক' নামে এক প্রকার বিষধর সর্প আছে, ইহাদের লেজের আগায় কতকগুলি ছোট ছোট বাটীর মত শক্ত পাত আছে। এই সাপ যখন রাগে, তখন কুণ্ডলি পাকাইয়া, মাথাটি নীচু করিয়া, লেজের আগা উঁচু করিয়া লেজ নাড়িতে থাকে; তাহাতে সেই বাটী গুলির পরস্পরের ঘর্ষণে শুক্না পাকা শিম নাড়িলে যে রূপ শব্দ হয় সেই রূপ শব্দ হইতে থাকে। এই জন্য ইহার নাম 'র‍্যাটেল স্নেক'। এই বাটী গুলি শুষ্ক থাকিলেই শব্দ হয়। জলে ভিজিলে আর শব্দ হয় না। ইহারা খরগোস, কাঠবিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ইহারা আমাদের দেশের উলুবোড়ার জাত। ইহারা কুণ্ডলি না করিলে কামড়াইতে পারে না, এবং সহজে কাহাকেও কামড়ায় না। ইহাদের দুই হাত দূর দিয়া লোক চলিয়া গেলেও কিছু বলে না, তবে কামড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন সাপের বিষই গোখুরার বিষের মত তীব্র নয়। সব বিষধর সাপের বিষ, উপরের চোয়ালে বড় বড় দুইটা দাঁতের গোড়ায়, পেঁয়াজের কোয়ার মত দুইটা থলের ভিতর থাকে। ঐ থলের ভিতর বিষ জন্মায়। দাঁতে লম্বালম্বি এপার ওপার ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র, বিষের থলের সহিত সংযুক্ত। সাপ রাগিয়া কামড়াইলে, থলের ভিতর হইতে বিষ আসিয়া দাঁতের ছিদ্র দিয়া, ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে।

সকল সাপের বিষ সমান তীব্র নয়। গোখুরার বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। ইহার কামড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, পাঁচ ছয় সেকেণ্ডেই মরিয়া যায়। মানুষ পাঁচ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মরে।

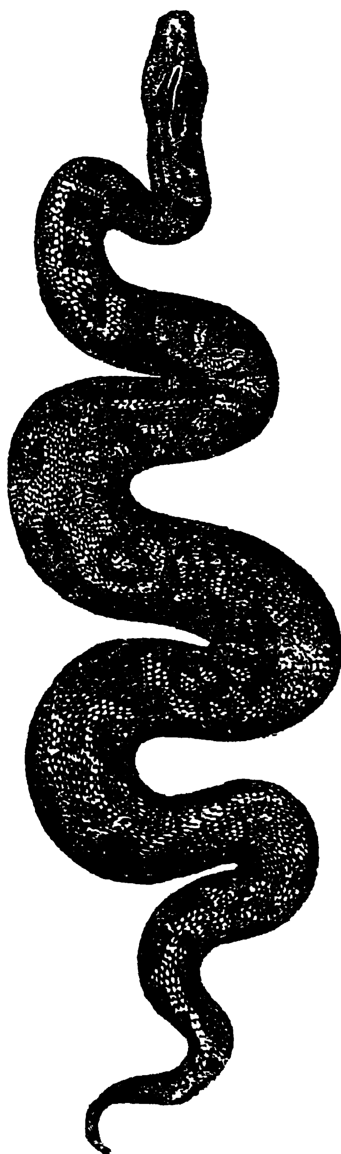
গোখুরা সাপের ছোঁ মারিতে বড় দেরি হয়। কুণ্ডলি করিয়া, ঘাড় উঁচু করিয়া মাথা একদিকে হেলাইয়া, পরে ছোঁ মারে। একবার মারিয়া আবার ছোঁ মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে অনেক সময় যায়। যাহারা সাপ নাচায় তাহারা জানে, সাপটা কখন কোন ভঙ্গী করিবে। তাহাতেই তাহারা সাবধান হইতে পারে। গোখুরা সাপের বিষের ভাল ঔষধ আজও বাহির হয় নাই। সাপুড়িয়ারা বোকা লোকদের অনেক রকমে ঠকায়। একটা পোষা সাপ নিজের কাছে লুকাইয়া রাখে, তাহার বিষের কোষ তুলিয়া ফেলে। পরে নূতন যায়গায় গিয়া মাটী খুঁড়িয়া সাপ বাহির করিবার ভাণ করিয়া পোষা সাপটা, গর্ত্ত হইতে বাহির করে ও সেটাকে দিয়া নিজের শরীরে দংশন করায়। পরে "আমায় সাপে কামড়াইয়াছে আমি মরিলাম" বলিয়া ঢলিয়া পড়ে। লোকে ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া যায়, তখন সে বলে 'আমার কোমরে মাদুলি আছে শীঘ্র সেটা ছিঁড়িয়া ক্ষত স্থানে লাগাও' লোকে তাহাই করে। খানিক পরে সে সুস্থ হইয়া উঠে ও মাদুলির প্রশংসা করে। লোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়া অনেক টাকা দিয়া সেই মাদুলি কিনিয়া ঠকে।

আমাদের দেশে নির্বিষ অনেক সাপ আছে, তার মধ্যে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—হেলে সাপ ও ঢোঁড়া সাপ। হেলে সাপ দেখিতে খুব সুন্দর। ইহাদিগকে নির্ভয়ে ধরা যায়। ইহারা কামড়ায় না। ব্যাং প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ঢোঁড়া সাপ জলে থাকে। মাছ, ব্যাং, ইন্দুর প্রভৃতি ধরিয়া খায়।

তোমরা অনেকেই হয়ত হেলে প্রভৃতি সাপকে ব্যাং ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছ। সাপের মুখ, গলা ও পেট কত সরু আর ব্যাংটা কত বড়, অথচ সাপ সেই ব্যাংটাকে গিলিয়া ফেলে! সাপের মুখের গঠন এমনি যে, ইহারা উপরে নীচে, আশে পাশে মুখটাকে অনেক খানি ফাঁক করিতে পারে। শরীরও রবারের মত, আবশ্যক মত বাড়িয়া যায়। ইহাদের দাঁতও এমন ভাবে গঠিত যে, এক বার শিকার মুখে ধরিলে, তাহার আর পলাইবার যো থাকে না। এমন কি সাপ নিজে ইচ্ছা করিয়াও মুখ হইতে শিকার বাহির করিয়া দিতে পারে না, ক্রমাগত গিলিতে বাধ্য হয়।

সকল সাপের চেয়ে পাহাড়ী বোড়াসাপ খুব বড়। ইহাদের মত বড় সাপ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাদিগকে অজগর বলে। অজগর অর্থে ছাগল ভক্ষণকারী সাপ। আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় অনেক পাহাড়ী বোড়া আছে। আমাদের দেশের পাহাড়ী বোড়া সেই সকলের অপেক্ষা বড়। ইহারা ছাগল, ভেড়া, বানর ও হরিণ, যাহা সহজে গিলিতে পারে, এরূপ জন্তু ধরিয়া খায়। কখন কখন বাঘ ধরিয়া খাইতেও দেখা গিয়াছে। বড় বড় মহিষ ধরিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহা গিলে কিনা সন্দেহ। আবার অনেক আষাঢ়ে গল্পও প্রচলিত আছে, যেমন—ইহারা বড় বড় হাতী

১. বর্তমানে ভালো ওষুধ পাওয়া যায়।



গিলিয়া ফেলে, ছোট নৌকাতে কয়েক জন ঘুমাইতেছিল, নৌকা শুদ্ধ গিলিয়া ফেলিল—এ সকল বানান গল্প।

সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে আবার নূতন দাঁত গজায়। বিষ দাঁত ছাড়া, মুখে অন্য দাঁতও থাকে তাহাতে আহারের কার্য্য হয়। সাপ উপরি উপরি দু তিন বার বিষ ঢালিলে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে অনায়াসে ধরা যায়। আর বড় কামড়াইতে উদ্যত হয় না। সকল সাপেই খোলস্ বদলায়। নীচে নূতন চামড়া জন্মিলে শরীরের উপরের চামড়া ক্রমে শরীর হইতে আলগা হইয়া যায় ও মাথার কাছে ফাটিয়া যায়। সাপ সেইখান দিয়া আপনার শরীরটাকে বাহির করিয়া লয়।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সাপের মুখের ছবিতে তাহার জিহ্বার আকৃতি দেখিয়াছ। দেখিয়া বোধ হয় যেন সাপের দুইটা জিহ্বা, কিন্তু তাহা নয়, সাপের জিহ্বা খুব সরু এবং মাথার দিকটা চেরা। আমরা হাতের দ্বারা যেমন স্পর্শ করি, বিড়ালেরা যেমন তাহাদের মুখের উপরের বড় বড় লোমের স্পর্শে সহজে সমস্ত অনুভব করিতে পারে, সাপেরাও তেমনি তাহাদের এই জিহ্বার স্পর্শে অতি সহজেই অনুভব করিতে পারে, এবং এই জন্যই সাপেরা চলিবার সময় ক্রমাগত জিহ্বা বাহির করিতে থাকে।

বোড়া সাপ সচরাচর দশ পনের হাত লম্বা ও বাঁশ বা মানুষের উরুর মত মোটা হয়। কিন্তু ২০।২৫ হাত লম্বা ও মানুষেব শরীরের মত মোটা পাহাড়ে বোড়া সাপের কথা কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতে, দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে জায়গায়, আসাম ও সুন্দর বনের জঙ্গলে

অনেক পাহাড়ী বোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গাছেই থাকে ও আশ্চর্য্য কৌশলে শিকার ধরে। গাছের ডালে লেজ জড়াইয়া, মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে, একটুও নড়ে চড়ে না। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, গাছের ডাল বা কোন লতা গাছে জড়াইয়া আছে। কোন জন্তু নিকটে আসিলে, অমনি একটু দুলিয়া, বিদ্যুৎ বেগে তাহার উপর গিয়া পড়ে এবং ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের শরীরে জড়াইয়া চাপিয়া ধরে। শিকারটা প্রাণ পণ টানাটানি করিয়াও তাহার নিকট হইতে পলাইতে পারে না। সাপটা শিকারের পেট জড়াইয়া ধরিয়া এমন জোরে কসিতে থাকে যে, তাহাতেই তাহার অস্থি পঞ্জর ভাঙ্গি য়া যায়। তারপর সেই জন্তুটাকে আস্ত গিলিতে আরম্ভ করে। গিলিবার সময়ে ইহাদের মুখ হইতে অনেক 'লালা' বাহির হইতে থাকে, তাহাতে শিকারের শরীর পিছল হইয়া যায় ও ইহাদের গিলিবার সুবিধা হয়। শিকারটি একটু বড় হইলে, শিং, চুল প্রভৃতি সমেত গিলিতে ইহাদের কিছু কষ্ট হয়। একটা বড় শিকার গিলিতে এক ঘন্টা হইতে ছয় সাত ঘন্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। শিকার গিলিয়া ইহারা সহজে আর নড়িতে চড়িতে পারে না। ছয় সাত দিন এক স্থানে পড়িয়া থাকে। সে সময়ে ইহাদিগকে সহজেই মারা যায়।

একবার এই দেশের কোন নগরের বাহিরে কতকগুলি লোক কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। দুই প্রহরের সময়ে তাহারা একটা খুব বড় গাছের তলায়, সেই গাছের একটা মোটা শিকড়ের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিল ও গল্প করিতেছিল। তামাক খাওয়া হইলে, 'কল্‌কে' হইতে আগুন ঢালিয়া, সেই শিকড়ের উপর রাখিল। কিছুক্ষণ পরে, শিকড় মনে করিয়া যাহার উপর তাহারা বসিয়াছিল, তাহা হঠাৎ নড়িয়া উঠায় তাহারা চমকিয়া উঠিল। তার পর একটু মনোযোগ করিয়া যখন দেখিল, তখন বুঝিল, সেটি গাছের শিকড় নহে, অন্য কিছু; কোন জীবিত প্রাণী হইবে। তখন তাহারা নগরে দৌড়িয়া গিয়া ইহার বিষয় বলিলে, অনেক লোক তাহা দেখিতে আসিল এবং সেই 'শিকড়টাকে' অনেক টানাটানি করিয়াও কিছুতেই সরাইতে পারিল না। তখন তাহার তলা দিয়া, খুব মোটা একটা দড়ি চালাইয়া দিল, খুব কসিয়া বাঁধিল এবং সেই দড়িটার অন্য দিক, গাছের ডালের সহিত আটকাইয়া দিয়া, সকলে মিলিয়া টানিয়া তুলিতে লাগিল ও একজন লোক আগুন জ্বালিয়া সেই শিকড়ে লাগাইয়া দিল। আগুনের তাপ পাইয়া জিনিসটা খুব নড়িয়া উঠিল, তখন তাহাকে সহজে টানিয়া তোলা গেল। যখন গাছের ডালে ঝুলিতে লাগিল, তখন সকলে দেখিল সেটা গাছের শিকড় নয়, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে বোড়া সাপ! শরীরে কাদা লাগিয়া তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহা সাপের গা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই, এবং পেটের ভিতর কিছু ছিল বলিয়া পেটটা ফুলিয়া এত মোটা হইয়াছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন একটা গাছের গুঁড়ি; এবং গাছের তলায় একটা গর্ত্তের মধ্যে মুখ ও শরীরের খানিকটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া এমন আটকাইয়াছিল যে, এত চেষ্টাতেও তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে পারা যায় নাই।

পেট চিরিয়া দেখা গেল, সাপটা একটা বড় শূয়োর তাহার দুটি বাচ্চা সমেত গিলিয়া বসিয়াছিল।

সখা ও সাথী । ভাদ্র ১৩০২ । পৃ. ৮৮-৯৪

ইন্দুরের কৌশল

ইন্দুরদের ডিম চুরি করা অভ্যাসটি বিলক্ষণ আছে। এক একটা ইন্দুরে যে একটা ডিম চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, সে ক্ষমতা তাহাদের নাই—না পারে মুখ দিয়া কামড়াইয়া ধরিতে, না পারে হাতে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে। তবে কি করিয়া ডিম চুরি করে? ইহাদের সে বড় চমৎকার কৌশল। একটা ইন্দুর হাত পা দিয়া ডিমটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, আর একটা ইন্দুর তার লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত লইয়া যায়, পরে ঠেলিয়া গর্ত্তের মধ্যে গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়।

সখা ও সাথী । ভাদ্র ১৩০২ । পৃ. ১০৩

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি

ইন্দুরের দয়া

আমেরিকার এক সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি একদিন তাঁহার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া এক দল ইন্দুর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া ইন্দুরেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে একটি ইন্দুর ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছিল না। ইন্দুরটিকে বুড়া বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইন্দুরের চলা দেখিয়া তাহার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। খানিক পরে দেখিতে পাইলেন যে, একটা ছোট ইন্দুর তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। একটা ছোট কাঠির এক দিক সেই বুড়া ইন্দুরটা মুখে করিয়া ধরিয়াছে ও আর একদিক ছোট ইন্দুরটা ধরিয়াছে। তখন আরও ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে, বুড়া ইন্দুরটা অন্ধ। ছেলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া লাঠি ধরিয়া অন্ধ পিতামাতাকে যত্নপূর্ব্বক পথে লইয়া যায়, এই ছোট ইন্দুরটাও সম্ভবতঃ তাহার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতা মাতাকে, কাঠি মুখে করিয়া পথ দেখাইতেছিল। তিনি শব্দ করিয়া ভয় দেখাইলেও এই ইন্দুরটা এই বৃদ্ধ ও অন্ধকে ফেলিয়া পলাইল না। ইন্দুরের এইরূপ পরোপকারের বিষয় অনেক পুস্তকে পড়া যায় ও যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনা যায়।

মাছের বুদ্ধি

আমেরিকার একজন সাহেব মাছের খুব বুদ্ধির কথা লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাগানে একটা ছোট পুকুরের ভিতর অনেক রকম মাছ পুষিয়াছিলেন। এই পুকুরের ধারে একটা গাছের ডালে ছোট একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ঘণ্টার আগায় লম্বা একটা দড়ি বাঁধা ছিল; দড়িতে মাছেদের জন্য তিনি খাবার বাঁধিয়া বাঁধিয়া জলে নামাইয়া দিতেন। মাছগুলি যেমন খাবার ঠোকরাইতে আরম্ভ করিত আর অমনি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। তাহার পর সাহেব মজা দেখিবার জন্য সেই দড়িতে ছোট ছোট ইঁটের টুকরো বাঁধিয়া দিতেন, মাছেরা সেই দড়ি ধরিয়া টানিত আর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। সাহেব তখন হাতে খাবার নিয়া জলের ভিতরে হাত ডুবাইয়া দিতেন, আর মাছেরা তাহার হাত হইতে খাবার খাইত। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার পাইয়া মাছেদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, ঠিক সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিত। মাছেরা পায়ের শব্দে বা অন্য কোন রকমে যদি বুঝিতে পারিত যে, সাহেব নিকটে আসিয়াছেন, তাহা হইলে অমনি ঘণ্টা বাজাইয়া সাহেবের নিকট খাবার চাহিত।

সখা ও সাথী । আশ্বিন ১৩০২ । পৃ. ১২২-১২৩

হরিণ

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ নানা জাতীয় হয়। কোন কোন জাতীয় হরিণ খুব ছোট হয়, আবার কোন কোন জাতীয় হরিণ গোরু অপেক্ষাও বড় হয়, এমন কি, ছোট খাট হাতীটির মত দেখিতে হয়। ইহাদের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হরিণের শিং ও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়; কোনটার শিং



সোজা ও ছোট, কোনটার শিং খুব লম্বা অথচ পাকান, কোনটার বা শিং খুব বড় ও অনেক ডালপালা যুক্ত, কোনটার আবার শিং খুব বড় বটে, কিন্তু হাতের পাতা বা তেলোর মত চেপটা।

আমাদের দেশে, বনে অনেক রকম হরিণ আছে। সচরাচর যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বাছুরের মত বড় হয়। গায়ের রং লাল্চে, তাতে সাদা সাদা ফোঁটা ও পিঠের দাঁড়ার উপরটা কাল।

হরিণের চোখ গোল, বেশ বড় ও খুব উজ্জ্বল। আমাদের দেশের এবং আরব ও পারস্য দেশের কবিরা হরিণের চোখকে বড়ই সুন্দর দেখিতেন। যে সকল স্ত্রীলোকের চোখ্ দেখিতে বেশ সুন্দর হইত, কবিরা হরিণের চোখের সহিত তাঁহাদের চোখের তুলনা করিতেন।

হরিণের পা লম্বা এবং সরু সরু। খুর গুলি ছোট ছোট। এই জন্য ইহারা খুব দৌড়াইতে পারে এবং দৌড়িয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মহা বলবান জন্তুর হাত হইতেও রক্ষা পায়। হরিণেরা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

কোন কোন জাতীয় হরিণের দলে ৫।৭ টা ১৫।২০ টা করিয়া হরিণ থাকে, আবার কোন কোন জাতীয় হরিণের দলে ১০০ কখনও বা ২০০ করিয়া হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিণের দলে কয়েকটা বড় হরিণ প্রহরীর কাজ করে ও বিপদের আশঙ্কা দেখিলে ভয়সূচক শব্দ করিয়া সমস্ত দলকে সতর্ক করিয়া দেয়। সঙ্কেত করিবামাত্র সমস্ত দলটি গোল হইয়া দাঁড়ায়। হরিণীরা ও হরিণ শিশুরা মাঝ খানে থাকে, আর পুরুষ হরিণগুলি শত্রুর দিকে মুখ করিয়া, শিং বাঁকাইয়া দলটিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে তাহারা আপনাদিগকে হিংস্র জন্তুদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

হরিণ দুই শ্রেণীর হয়। এক শ্রেণীর হরিণের শিং ফাঁপা এবং গোরু বা ছাগলের শিং-এর ন্যায়। একই শিং আজন্ম কাল থাকে। এই শিং মাথার হাড়ের সহিত এক হইয়া জন্মে না। অপর শ্রেণীর হরিণের শিং নিরেট এবং মাথার হাড়ের সহিত এক হইয়া জন্মে। মাথার হাড়ই ঐরূপ বাড়িয়া শিং-এর আকার ধারণ করে। এই শিং প্রায়ই শাখা-যুক্ত হয় এবং তাহা প্রতি বৎসর পড়িয়া যায় ও আবার নূতন উঠে। ইহাদের শিং-এ অনেক ডালপালা বাহির হয়। অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগের মধ্যে এক বল্‌গা হরিণ ছাড়া আর কোন জাতীরই হরিণীর শিং থাকে না, কিন্তু স্থায়ী শৃঙ্গ মৃগের অনেক জাতীরই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শিং থাকে, ও লম্বা শিং দুটিতে প্রায়ই অনেক গাঁইট থাকে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর অনেক রকমের হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দু চারিটার বিষয় বলিতেছি।

এক রকম হরিণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের গায়ের রং কাল, কেবল চোখের চারিদিকে সাদা গোল রেখা থাকে ও পেটের তলা সাদা হয়। ইহাদের শিং দুটি "স্ক্রুর" মত পাকান ও এক হাত হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের পুরুষ হরিণের শিং যত বড় হয় হরিণীর শিং তত বড় হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, রাজপুতানায় এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে বহু পরিমাণে

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব দ্রুত দৌড়ায় এবং দৌড়িবার সময়ে মধ্যে মধ্যে খুব উচ্চ লম্ফ দিয়া চলিয়া যায়। ইহাদিগকে এণ, কৃষ্ণমৃগ বা কৃষ্ণসার বলে। আফ্রিকা দেশে এই জাতীয় মৃগ অনেক প্রকারের আছে।

আমাদের দেশে "গ্যাজেল" (Gazelle) নামে এক প্রকার ছোট মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গায়ের রং বাদামী, লেজ কাল। পা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত দেড় হাত উচ্চ। উহাদের শিং সোজা হইয়া উঠিয়া আগাটা একটু বাঁকিয়া যায়। শিং এক ফুট লম্বা হয়, তাহাতে ১৫।১৬ টা গাঁইট থাকে। ইহারা ৬।৭ টা হইতে ২০ টা পর্য্যন্ত একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা এত দ্রুত দৌড়ায় যে, শিকারী কুকুর দৌড়িয়া ইহাদিগকে ধরিতে পারে না। ইহারা ঘাস ও ছোট ছোট গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং জলপান করে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সচরাচর এমন স্থানে বাস করে, যেখানে গভীর কূপ ভিন্ন অন্য কোথায়ও জল পাওয়া যায় না। গাছের পাতা হইতে যে রস পায়,তাহাতেই ইহাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। আফ্রিকা, আরব ও পারস্য দেশে নানা প্রকারের "গ্যাজেল" মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চোখ বড় সুন্দর।

চৌশিঙ্গা বা চতুঃশৃঙ্গ মৃগ হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থান সকলে এবং দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য ও বনপ্রদেশে বাস করে। ইহাদের গায়ের রং মেটে। ইহারা খুব ক্ষুদ্রকায় মৃগ, দুই ফুটের বেশী উচ্চ হয় না। ইহাদের মাথার দুই জোড়া অর্থাৎ চারিটা শিং জন্মায়, এইজন্য ইহাদিগকে চৌশিঙ্গা বলে। হরিণের মাথায় যেখানে শিং জন্মে, সেখানে ত দুটা শিং আছেই, তা ছাড়া চোখের উপর কপালে আরও দুটা শিং জন্মায়। ইহাদের শিং ছুঁচল ও মসৃণ, গাঁইটযুক্ত নহে।

আমাদের দেশে "নীলগাই" নামে এক প্রকার খুব বড় মৃগ আছে। ইহারা পাহাড়ে জায়গায় ও খোলা মাঠে বাস করে। ইহাদের শিং দুটি কিন্তু খুব ছোট এবং লেজ, ঘাড় ও গলার তলা লোমযুক্ত হয়। ইহাদের কেবল পুরুষগুলিরই শিং হয়, হরিণীদের শিং হয় না। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ, একটু নীল্‌চে, সেই জন্য ইহাদিগকে "নীলগাই" বলে।

আফ্রিকা দেশে কৃষ্ণসার ও গ্যাজেলের ন্যায় মৃগ, চোট বড় নানা প্রকারের আছে; কিন্তু এক অতি অদ্ভুত মৃগ আছে তাহার নাম "নু"। ইহারা কিম্ভূত—কিমাকার, দেখিলে হরিণ বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় যেন শিংওয়ালা ঘোড়া। ঘাড়ের নিকট হইতে মহিষের শিং-এর মত বাঁকা দুটি শিং বাহির হয়। ঘোড়ার মাথায় মহিষের শিং বসাইয়া দিলে যেমন দেখায়, সেই রকম দেখিতে হয়। লেজও ঘোড়ার মত। ঘাড়ে ঘোড়ার মত কেশর আছে।

অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগ বা যে হরিণের শিংএ ডাল পালা হয়, তাহাদের পুরাতন শিং পড়িয়া গেলে, শিং-এর মূলদেশে সুপারির মত উঁচু দুটি হাড় চামড়া ঢাকা থাকে। ক্রমে এই গোল হাড়ের উপর, মখমলের ন্যায় কোমল লোমযুক্ত চর্ম্মে ঢাকা দুটি গুটী জন্মে।



এই দুটি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া শিং হয় ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইয়া বড় হইতে থাকে। ভিতরে শিং শক্ত হইলে এই মখমলের আবরণটা মাথার চামড়া হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও ক্রমে শুকাইয়া যায়। হরিণ তখন গাছের গুঁড়িতে শিং ঘসিয়া এই শুষ্ক মখমলের আবরণটি তুলিয়া ফেলে। শিং পাকিয়া উঠিলে হরিণ লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বেড়ায়, ও বড় ভীষণ হয়। অপর হরিণের সহিত শিং-এ শিং-এ ঢু মারিয়া লড়াই করে। এই লড়াইয়ের ঠক্‌ঠকানি শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যায়। লড়াই করিতে করিতে শিং কখন কখনও এমন আটকাইয়া যায় যে, তাহারা বহু টানাটানি করিয়াও কোন মতে তাহা ছাড়াইয়া লইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে তাহাদিগকে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়।

এই শ্রেণীর হরিণকে অস্থায়ী-শৃঙ্গ মৃগ বলে। এই শ্রেণীর কয়েক জাতীয় হরিণের কথা বলিতেছি।

শীত প্রধান দেশে "রেন্‌ডিয়ার" বা বল্‌গা হরিণ নামে এক প্রকার বড় হরিণ পাওয়া যায়। সাইবিরিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড ও নরওয়ের লোকেরা, বরফের উপর চালাইবার

চাকাশূন্য গাড়িতে ইহাদিগকে জুতিয়া গাড়ি টানায়; ঘোড়ার পরিবর্তে ইহার পিঠে চড়িয়া যাতায়াত করে ও ইহাদের দুধ এবং মাংস খায়। ইহার চর্ব্বিতে তাহারা প্রদীপ জ্বালে এবং চামড়াতে পোযাক তৈয়ার করে। বল্‌গা হরিণ না হইলে ল্যাপল্যাণ্ড দেশের লোকের এক মুহূর্ত্তও চলে না। আমাদের দেশে বল্‌গা-হরিণ তার চেয়ে অধিক উপকারী।

এই শ্রেণীর হরিণের মধ্যে "এল্ক্‌" হরিণই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা আকারে একটা ছোট হাতীর সমান হয়। উচ্চে ৭।৮ ফুট হয়। উত্তর আমেরিকা, আসিয়া ও ইউরোপের শীত প্রধান প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহাদের শিং হাতের তলার মত চেপ্‌টা। ইহারা লতা পাতা ও কচি পল্লব খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের ঘাড় খুব ছোট বলিয়া চরিয়া ঘাস খাইতে পারে না। তবে লম্বা লম্বা ঘাসের আগা ছিঁড়িয়া খায়। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর বর্ণ। ইহাদের শিং জানুয়ারি মাসে পড়িয়া যায়। ৫।৬ সপ্তাহে নূতন শিং উঠিয়া আগষ্ট মাসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এস্কিমো জাতিরা ইহার মাংস খায়।

অস্থায়ী-শৃঙ্গ হরিণের মধ্যে আমাদের দেশে শংবর হরিণ খুব বড়। ইহাদের গায়ের লোম খস্‌খসে। গায়ে ও গলায় বড় বড় লোম জন্মে। লেজ মোটা, কান বড় ও চৌড়া এবং রং মেটে। ইহারা ৪।৫ ফুট উচ্চ হয়। এক একটা বড় হরিণের ওজন প্রায় ৯ মন হইবে। ইহাদের শিং বহুশাখা-যুক্ত ও লম্বায় দুই হাত আড়াই হাত হইবে। এক শিং-এর আগা হইতে অপর শিং-এর আগা আড়াই হাত তফাৎ হইবে। ভারতবর্ষের জঙ্গলা পাহাড়ে' জায়গায় ইহারা বাস করে। কিন্তু, সিন্ধু, পঞ্জাব ও রাজপুতনার বালুকাময় প্রদেশে ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহারা রাত্রে চরিযা বেড়ায়, দিনের বেলায় ছায়াময় নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করে।

আর এক জাতীয় হরিণ আমাদের দেশে পাওয়া যায়, ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে। সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় সাদা সাদা গোল গোল দাগ। এই জন্য ইহাদিগকে চিত্র মৃগ, চিতা হরিণ, বা চিতেল বলে।

এই শ্রেণীর নানা জাতীয় হরিণের মধ্যে ভারতবর্ষে 'মন্টজাক' হরিণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানে "কাকার" বলে।

কস্তুরীমৃগ খুব ছোট, ২০ ইঞ্চ উঁচু। ইহাদের শিং হয় না তা ছাড়া মুখের দুপাশে দুটি লম্বা লম্বা দাঁত বাহির হয়। এই দাঁত তিন ইঞ্চ লম্বা হয়। পুরুষ হরিণদের পেটের তলায় নাভির কাছে চামড়ার একটা থলে জন্মে, তাহা হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ-যুক্ত রস নির্গত হয়। এই রস যখন টাট্‌কা ও তরল থাকে, তখন গন্ধটা বড় উগ্র ও খারাপ লাগে। রস ক্রমে শুকাইলে গন্ধ মনোরম হইয়া উঠে। যাহারা কস্তুরী সংগ্রহ করিতে যায়, তাহারা হরিণ মারিয়া চামড়া শুদ্ধ থলেটা কাটিয়া লয় এবং সেই রসটা ইহাতেই শুকাইয়া থাকে। এই শুষ্ক থলেটা মৃগনাভী। কস্তুরী-মৃগ কাশ্মীর আসাম ও হিমালয়ের অন্যান্য প্রদেশে বাস করে।

সখা ও সাথী । কার্ত্তিক ১৩০২ । পৃ. ১৩৬-১৪২

কয়েকটি অদ্ভুত পাখী

কেরাণী পাখী

আগে যখন হাঁসের পালকের কলমের খুব চলন ছিল, তখন অনেক কেরাণী কানে কলম গুঁজিয়া রাখিত। অনেকে হয়ত অনেক আফিসের লোককে কাণে কলম গুঁজিয়া যাইতে দেখিয়া থাকিবে। যে পাখীর ছবিটি দেখিতেছ, উহার মাথার কানের কাছে, অনেকগুলি লম্বা লম্বা পালক বাহির হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন পাখীটিকে অনেক লিখিতে হয়, তাই কেরাণী বাবুটির মত কাণে কলম গুঁজিয়া রহিয়াছে। এই জন্য ইহার নাম "কেরাণী পাখী" রাখা হইয়াছে।

আফ্রিকার দক্ষিণ প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহারা চিল ও বাজপাখীর জাত। ইহাদের পা দুখানি খুব লম্বা, ঠোঁট বাঁকা, শক্ত ও ধারাল। ইহারা সাপ ধরিয়া খায়। সাপ দেখিলে ডানার ঝাপটে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। সাপ যেই ফোঁস করিয়া তাড়া করিয়া আসে, অমনি কেরাণী পাখী এমনি ডানার বাড়ি মারে যে, সাপ ঘুরিয়া মাটিতে লুটাইতে থাকে। তখন কেরাণী পাখী তাহাকে ধরিয়া গিলিয়া খায়। আফ্রিকার লোকেরা এই পাখী পোষে। ইহারা গৃহস্থের হাঁস মুরগী প্রভৃতিকে ইন্দুর ও সাপের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করে।

ফ্লামিঙ্গো



আর পাশে যে অদ্ভুত পাখীটির চিত্র দেখিতেছ উহাকে "ফ্লামিঙ্গো" বলে। ইহারা হাঁসজাতীয় পাখী। ইহাদের শরীর রাজহাঁসের শরীরের মত বড়, কিন্তু লম্বা লম্বা দুখানি ঠ্যাং আর সাপের মত লম্বা গলা থাকায় মানুষের চেয়ে উঁচু হয়। আমেরিকা দেশে ও আসিয়ার দক্ষিণদিকে ইহাদের বাস। ইহারা বিল ও জলা ভূমিতে বাস করে। ইহারা শামুক, গুগ্‌লি, পানা ও কাদা খায়। হাঁস যেমন কাদার মধ্যে ঠোঁট গুঁজিয়া তাহা হইতে সার ভাগ বাছিয়া লইতে পারে, ইহারাও সেই রূপ করে। তবে হাঁস যখন কাদা খায়, তখন তাহার নীচের ঠোঁট নীচের

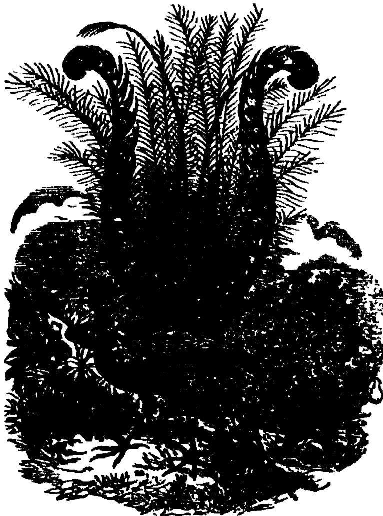
দিকে, অর্থাৎ মাটির দিকে থাকে, আর উপরের ঠোঁট উপর দিকেই থাকে। কিন্তু ফ্লামিঙ্গো যখন কাদা খায়, তখন লম্বা ঘাড়টি একেবারে পায়ের তলায় চালাইয়া দেয়, সুতরাং মাথার তেলোটা মাটির দিকে হইয়া যায়। উপরের ঠোঁট মাটিতে লাগিয়া যায়, আর নীচের ঠোঁট উপরের দিকে হইয়া যায়। এইরূপে খাইবার জন্য ইহাদের ঠোঁট মাঝখান হইতে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের গায়ের রং লাল টুক্‌টুকে। কেবল ডানার বড় বড় পালকগুলি কাল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। এবং সেই দলের দুইধারে দুটি পাহারা রাখে, তাহারা চতুর্দ্দিকে দেখিতে থাকে। কোন বিপদের আশঙ্কা বুঝিলে সকলকে আগেই সতর্ক করিয়া দেয়।

ইহারা এক হাত দেড় হাত পরিমাণ উঁচু মাটির ঢিবি তৈয়ার করিয়া লইয়া, তাহার উপর ডিম পাড়ে এবং 'টুল'' বা মোড়ার উপর যেমন করিয়া বসিতে হয়, তেমনি করিয়া তাহার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ডিমে তা দেয়। বোম্বায়ের নিকটে, সিন্ধুপ্রদেশে, পারস্য উপসাগরের তীরে, মান্দ্রাজের 'পুলিকট' হ্রদের ধারে অনেক ফ্লামিঙ্গো বিচরণ করিতে দেখা যায়।

লায়ার পাখী

এই পৃষ্ঠায় আর একটি অদ্ভুত পাখীর চিত্র দেখ। ইহার লেজের কি বাহার! লেজের দুই পাশের দুইখানি চওড়া পালক উপরদিকে উঠিয়া ক্রমে বাঁকিয়া সাপের ফণার মত হইয়াছে। ভিতরের পালক গুলি খুব সরু সরু, দেখিতে তারের মত। লেজটি দেখিলে বেহালার পেটটির কথা মনে পড়ে। এই লেজের আকার সারঙ্গী বা বীণা জাতীয় ''লায়ার'' নামক বাদ্য যন্ত্রের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ইংরাজীতে ''লায়ার বার্ড'' বলে।



অষ্ট্রেলিয়া দেশে লায়ার পাখীর বাস। পুরুষ পাখীদের লেজই এই রূপ খুব বাহারে হয়। লেজের পাশের পালক দুখানি সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল কাল দাগ, ও ধারটা ঈষৎ লাল। পাখীর গায়ের রং মেটে, পাখা ও গলার তলা লাল। ইহারা ময়ূরের ন্যায় লেজ গুটাইয়া রাখিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলেই খাড়া করিয়া

ছড়াইয়া বাহার দিতে পারে। লায়ার পাখী বনের মধ্যে ঝোপে গোপনে থাকে। ইহারা বড় ভীরু, কোন প্রকারের সামান্য শব্দ শুনিলেই লুকায়, সেই জন্য ইহাদিগকে ধরা বড় কঠিন।

ইহারা পুরাতন গাছের কোটরে অথবা পর্ব্বত গহ্বরে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং বাসাগুলি শুক্না ঘাস ও পাতা দ্বারা তৈয়ার করে।

উড়িবার সময়ে বা মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করিবার সময়ে ইহারা লেজটা গুটাইয়া রাখে। ইহাদের স্বর বড় মিষ্ট এবং ইহারা অন্যান্য পাখীর স্বর ও কুকুরের ডাকেরও নকল করিতে পারে।

সখা ও সাথী । অগ্রহায়ণ ১৩০২ । পৃ. ১৪৯-১৫২

পেন্‌গুইন্

এই পৃষ্ঠায় যে পাখীর ছবি দেখিতেছ, উহাকে পেন্‌গুইন্ বলে। উহারা দক্ষিণ মহাসাগরের তীরে বাস করে। ইহাদের ডানা দেখ কত ছোট। কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। ডানা এত ছোট বলিয়া ইহারা উড়িতে পারে না। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে এই ডানা দিয়া সম্মুখের পায়ের সাহায্যে ইহারা যখন শীঘ্র চলিতে থাকে তখন যেন ছোট চতুষ্পদ জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা জলচর পক্ষী। হাঁস পা দিয়া সাঁতরায়। সাঁতরাইবার সময়ে ডানা দিয়া নৌকার দাঁড়ের ন্যায় জল সরাইয়া অগ্রসর হয়। ইহারা জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিয়া খায়। নিশ্বাস লইবার জন্য মাঝে মাঝে উপরে উঠে। সেই সময়ে হঠাৎ জোরে জলের উপর লাফাইয়া উঠে; আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন পেন্‌গুইন্ এইরূপ করিতে থাকে, তখন কোন পাখী যে ঐরূপ করিতেছে, তাহা বোধ হয় না; মাছ জলের উপর লাফাইয়া উঠিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়।



ইহারা ছানাকে যখন খাওয়ায় তখন দেখিতে বড় মজা! ধাড়ি পাখীটা কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় আর গলা ও মুখ নাড়িয়া খানিকক্ষণ ঠিক যেন বক্তৃতা করে. পরে ছানার দিকে ঘাড়টা হেঁট করিয়া মুখটা হাঁ করে। সেই ছানাটা, যে এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, তখন আপন ঠোঁট মায়ের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ভিতর হইতে

এক গাল খাবার খাইয়া লয়। আবার সেই ধাড়ি পাখীটা পূর্ব্বের মত ঘাড় মুখ নাড়িয়া কতক্ষণ বক্তৃতা করিয়া ছানাটার দিকে ঘাড় হেঁট করিয়া দিয়া হাঁ করিয়া থাকে, আর ছানাটাও পূর্ব্বের মত নিজের মুখ মার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া আহার করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সন্তানের তৃপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধাড়ি পাখীটা বারে বারে ঐরূপ ঘাড় ও মুখ নাড়িতে থাকে ও আপন মুখ হইতে বাচ্চাকে খাওয়ায়।

পেন্‌গুইনের সাহস খুব। মানুষকে পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া যায়। কিন্তু তাড়া করিলে কি হইবে; সামান্য এক ঘা খাইলেই পঞ্চত্ব পায়।

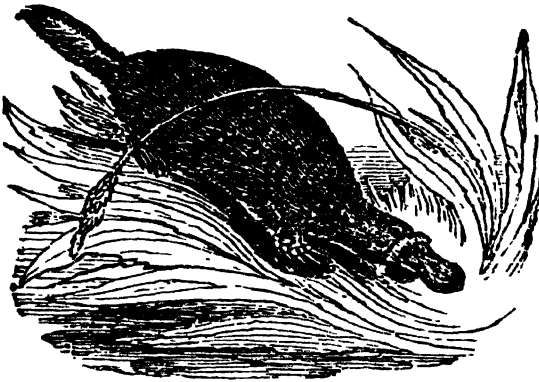
একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে হইলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সারি বাঁধিয়া হাঁটিয়া যায়। সম্মুখে পথে ইঁট পাথর থাকিলে সরাইয়া পথটি পরিষ্কার করিয়া লয়। কোন স্থান দিয়া পেন্‌গুইনের দল চলিয়া গেলে, সেখানটি সমান ও পরিষ্কার হইয়া যায়; দেখিলে বোধ হয় যেন একটা পথ হইয়া রহিয়াছে।

পেন্‌গুইন একেবারে দুইটা ডিম পাড়ে; একটা ডিম বড় হয়, আর একটা ছোট হয়।

সখা ও সাথী । ফাল্গুন ১৩০২ । পৃ. ২১৮-২২০

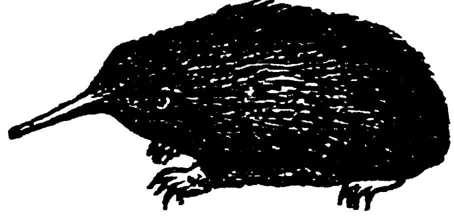
কয়েকটি অদ্ভুত জন্তু

এই যে জন্তুর ছবি দেখিতেছ ইহাদের অষ্ট্রেলিয়া দেশে বাস। ইহাদের শরীর বড় বড় ছুঁচোর শরীরের মত। মুখ খানি দেখ হাঁসের ঠোঁটের মত। পা ও হাঁসের পায়ের মত। ইহারা এক হাত বা দেড় হাত লম্বা হয়। ইহাদের শরীর মেটে রঙ্গের ঘন লোমে আবৃত। লেজটী গোল না হইয়া চেপ্‌টা হয়। ইহারা জলাশয়ের ধারে মাটীতে খুব লম্বা লম্বা গর্ত্ত করিয়া বাস করে। এই বাসায় প্রবেশ করিবার দুইটী করিয়া পথ থাকে। একটী মাটীর উপর দিয়া, আর একটী জলের তলা দিয়া। বাহিরের প্রবেশ পথ জঙ্গল ঝোপের মধ্যে লুকান থাকে। প্রবেশ দ্বার হইতে গর্ত্তে যাইবার মাটীর ভিতরের সরু পথ বা সুড়ঙ্গ প্রায় ১৫ হাত পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। পরে বাস করিবার বড় গর্ত্ত বা ঘর। এইটীতে ঘাস পাতা দিয়া বাসা বানায়। এই বাসায় ইহারা ডিম পাড়ে এবং কালে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। সে ছানারা মার দুধ খায়। তোমরা কি কখন কোন প্রাণীর বিষয় শুনিয়াছ যারা ডিম ফুটিয়া বাহির হয়, অথচ মায়ের দুধ খায়? যত প্রকার জীব ডিম পাড়ে মনে করিয়া দেখ। দেখিবে, তাহারা কেহই সন্তানকে স্তন দেয় না। কিন্তু এই যে জীবের কথা বলিতেছি, ইহারা অদ্ভুত। ইহারা ডিম পাড়ে, অথচ ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে তাহাকে স্তন দেয়। পেটের তলায় চামড়ায় ছিদ্র আছে তাহা হইতে দুধ বাহির হয়। ইহাদের স্তনের বোঁটা হয় না। ভয় পাইলে ইহারা 'বল' এর মত গোল পিণ্ড হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে **duck-bill** বা হংস-চঞ্চু বলে। ইহারা প্রায় জলেই থাকে। ইহাদের পা হাঁসের পার মত বলিয়া সহজে সাঁতরাইতে পারে। শরীরের লোম তেল্‌তেলে, অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিলেও গা ভিজে না। হাঁসের মত চেপ্‌টা ঠোঁট দিয়া কাদার ভিতর হইতে শামুক গুগ্‌লি বাহির করিয়া খায়। কীট পতঙ্গ ও



জলের পোকা মাকড় খাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। পায়ের নখ ও ঠোঁট দিয়া মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া বাসা তৈয়ার করে।

ঐ জাতীয় আর একটী জন্তুর ছবি দেখ। ইহারাও ডিম পাড়ে ও সন্তানকে স্তন দেয়। ইহাদের শরীর সজারুর কাঁটার ন্যায় কাঁটায় আচ্ছাদিত। ইহাদের পা হংস-চঞ্চুর পায়ের ন্যায়। ঠোঁট সরু ও লম্বা। ইহারাও জলের ধারে মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহাতে বাস করে। পোকা মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে 'একড্‌না' বলে। ইহাদিগেরও বাস অষ্ট্রেলিয়া দেশে।



আর একটী অদ্ভুত জন্তুর ছবি দেখ, ইহাকে **"অপোসম"** বলে। অপোসম তিন চারি প্রকারের হয়। ইহাদের পেটের তলায় একটা চামড়ার থলিয়ার মত হয়। সেই থলিয়ায় আপন নিরুপায় ছোট ছানাদিগকে আশ্রয় দেয় ও বহন করিয়া বেড়ায়। পুরুষ অপোসমের পেটে থলিয়া জন্মে না। ছবিতে যে অপোসম দেখিতেছ ইহা অতি ক্ষুদ্র জাতীয়। খুব বড় ইন্দুরের মত হইবে। ইহাদিগকে মেরিয়ানস্ অপোসম বলে। ইহাদের পেটে থলিয়া হয় না। ছানা গুলি মার পিঠে চড়িয়া আপনাদের লেজ দিয়া মার লেজ শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আর এই ভাবে ছানা পিঠে করিয়া ধাড়ি অপোসমটা গাছে গাছে ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। অপোসম ফল মূল ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খায়। আমেরিকা দেশে ইহাদের বাস। তথায় বাগানে গাছের ফল খাইয়া ও নষ্ট করিয়া লোকের বড় ক্ষতি করে। রাত্রে গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া শৃগালের ন্যায় পালিত হাঁস ও



মুরগী মারিয়া লইয়া চলিয়া যায়। ইহাদের লেজ খুব বড় হয়। লেজ দিয়া গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া দুলিয়া, অন্য ডাল ধরে। বিড়াল বা কুকুরের ছানার প্রথম অবস্থায় চোক বন্ধ থাকে। ইহাদের ছানার চোক ও কান দুইই বন্ধ থাকে, পরে একটু বড় হইলে ফোটে।



পাশে দেখ কাঙ্গারুর ছবি। ইহাদের মেয়েদেরও পেটের তলে একটী থলিয়া জন্মে। সেই থলিয়ায় শাবক দিগকে আশ্রয় দেয় ও তাহাতে শাবক গুলি বহন করিয়া বেড়ায়।

কাঙ্গারু অনের প্রকারের হয়। কোন কোন জাতীয় কাঙ্গারুর শরীর চার হাত লম্বা হয়, দাঁড়াইলে মানুষের অপেক্ষা উঁচু হয়। আবার কোন কোন জাতীয় কাঙ্গারু খরগোসের অপেক্ষা বড় হয় না। কাঙ্গারুর মাথাটা দেখিতে হরিণের মাথার মত। ইহাদের সম্মুখের পা দুখানি খুব ছোট, পিছনের পা দুখানি খুব বড়। লেজে এত জোর যে, লেজের এক আঘাতে মানুষের পা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। ইহারা প্রায়ই পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া বসে। লম্বা ঘাস ও ঝোপের উপর দিয়া দূরের জিনিষ দেখিবার সময়ে পিছনের পা ও লেজের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, এবং চলিবার সময়ে লম্বা পায়ের ভরে লাফাইতে লাফাইতে যায়। এক এক লাফে দশ বার হাত পার হইয়া যায়। সন্তান জন্মিলেই মাতা তাহাকে পেটের তলায় থলিয়ায় রাখে। তখন ছানাগুলির শরীর বড় কোমল থাকে। ক্রমে যখন বড় হয়, তখন মাঝে মাঝে থলিয়ার ভিতর হইতে মুখ চারিদিকে দেখিতে থাকে। আরও বড় হইলে বাহির হইয়া মায়ের নিকট থাকিয়া ঘাস পাতা খায়। ভয় পাইলেই আবার থলিয়ায় প্রবেশ করে।

সখা ও সাথী । ফাল্গুন ১৩০২ । ২২৪-২২৬

শজারু

আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই শজারু দেখিতে পাওয়া যায়। শজারুর সর্ব্বাঙ্গ লম্বা লম্বা শক্ত কাঁটায় ঢাকা। শজারু ইচ্ছা করিলে এই কাঁটাগুলিকে পাতিয়া শরীরের সহিত সমান করিয়া রাখিতে পারে। আবার রাগিলে সমস্ত কাঁটা খাঁড়া করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে ইহার নিকটে থাকা নিরাপদ নহে। শজারুর কাঁটার আঘাতে শরীরে যে ক্ষত হয় তা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া পড়ে। শজারু একবার বেগে যে প্রাণীর শরীরের উপর গিয়া পড়ে তাহার দেহে কাঁটা ফুটিয়া যায় এবং কয়েকটী কাঁটা শজারুর দেহ হইতে খসিয়া তাহার দেহে বিঁধিয়া লাগিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া না ফেলিলে সেই কাঁটা ক্রমে ক্রমে শরীরের ভিতর অধিকতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়। ভারতবর্ষে যে সকল বাঘ ও চিতাবাঘ শিকারীদের হাতে মারা পড়িয়াছে তাহাদের অনেকের শরীরের মাংসে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান সকল ঘা হইয়া পচিয়া রহিয়াছে দেখা গিয়াছে।

ইহারা দিবাভাগে আপন গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। এইজন্য দিনের বেলায় ইহাদিগকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা সাধারণতঃ জলপান করে না, ছোট ছোট গাছের রসাল মূল ও ডাঁটা খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহারা খরগোশের ন্যায় ফলমূল পাতা ও গাছের ছাল খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং মাটীতে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বাস করে।

বেত দিয়া যে রূপে ডালা, পাখা ও বাক্স তৈয়ার করা যায়, শজারুর কাঁটা সকল একত্র করিয়া সেইরূপে সুন্দর সুন্দর ডালা, বাক্স ও পাখা তৈয়ার হয়। এই কাঁটায় কলমের হ্যাণ্ডেল বা বাঁটও তৈয়ার হয়।

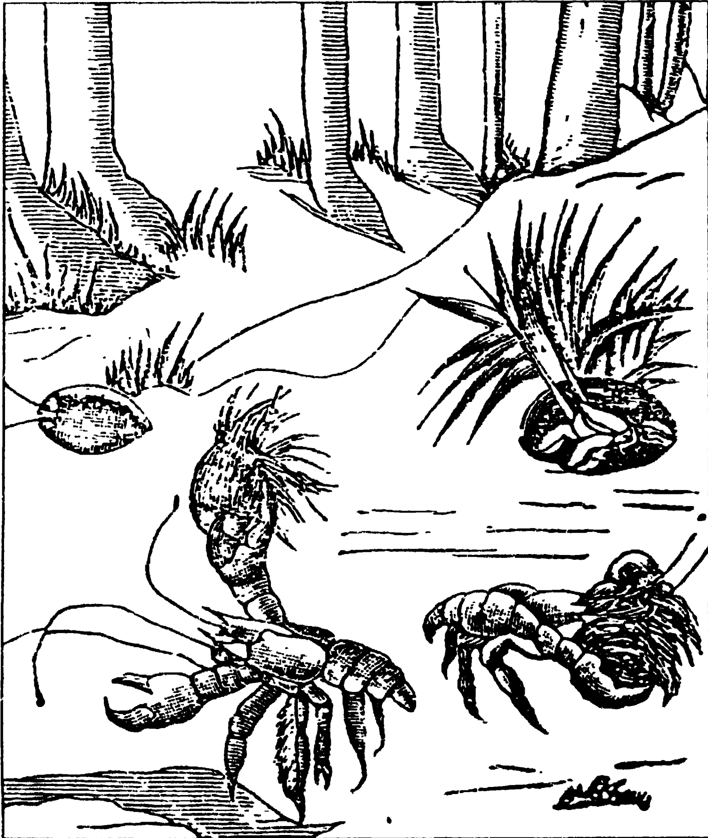
শজারুর ঘাড় ও মাথা কাঁটার পরিবর্ত্তে লম্বা, কঠিন লোমে আবৃত। ভয় পাইলে বা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা শরীর গুটাইয়া বল বা পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ কঠিন কাঁটা খাড়া হইয়া থাকে। শজারু সচরাচর দুই হাত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা ধীরে ধীরে গমন করে এবং চলিবার সময়ে শরীরের কাঁটায় কাঁটায় ঘর্ষণে করকর শব্দ হইতে থাকে।

সখা ও সাথী । চৈত্র ১৩০২ । পৃ. ২২৮-২৩০

কাঁকড়া

তোমরা সকলেই কাঁকড়া দেখিয়াছ এবং অনেকে কাঁকড়া খাইয়াছ, অথচ কেহ কাঁকড়ার সম্বন্ধে কোন খবরই বিশেষ কিছু রাখ না। কিন্তু কাঁকড়ার তত্ত্ব বড়ই কৌতুকজনক।

কাঁকড়া অনেক রকমের আছে। মটরের মত ছোট থেকে দেড় হাত চৌড়া পর্য্যন্ত, সব রকমের কাঁক্‌ড়াই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার বা চেহারাও নানা রকমের। কোনটা চক্রাকার, কোনটা গোলাকার, কোনটা ত্রিকোণ, কোনটা চতুষ্কোণ, আবার কোনটা ডিম্বাকার। কোনটার খোলা সমান, কোনটার কাঁটাযুক্ত বা উঁচুনীচু।



কোনটার বর্ণ খুব উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে, কোনটার মলিন।

কাঁকড়ার মাথা আছে, ঘাড় নাই। আশে পাশে দেখিবার জন্য তাহাকে ঘাড় ফিরাইতে হয় না। তার চোখ্ দুটি—দুটি লম্বা বোঁটার আগায় বসান। সেই বোঁটা ঘুরাইয়া সে সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সব দেখিয়া লয়। কাঁকড়ার পাঁচ যোড়া ঠ্যাং, শরীরের দুই পাশে বসান। কাঁকড়া সম্মুখে চলিতে পারে না, পাশের দিকে হাঁটিয়া যায়। সম্মুখের বা মাথার কাছের ঠ্যাং যোড়া খুব বড় ও সবল হয় এবং তাতে সাঁড়াশির মত তীক্ষ্ণ নখ থাকে। এই বড় ঠ্যাংকে কাঁকড়ার দাড়া বলে। কোন কোন জাতীয় কাঁকড়ার দাড়া যোড়া তার শরীর অপেক্ষা বড় হয়, আবার কোন কোন কাঁকড়ার একটা দাড়া খুব ছোট ও আর একটা খুব বড় হয়।

দাড়াই কাঁকড়ার হাত, দাড়াই তার যুদ্ধের অস্ত্র। ইহা দ্বারা তাহার অনেক কার্য্য সাধিত হয়। শিকার বা শত্রু সম্মুখে আসিলে এই তীক্ষ্ণ সাঁড়াশি দিয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও সুযোগ পাইলে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। সমুদ্র বা নদীর জলে যখন খুব ঢেউ হয়, তখন ঢেউ-এর বেগে বিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে সে দাড়ার চিমটা দিয়া জলমগ্ন পাথর বা অন্য কোন বস্তু শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে।

কাঁকড়া যখন খায় তখন তাহাকে দেখিতে বড়ই আমোদ লাগে। উহার মুখ বক্ষঃস্থলে। তুমি যেটাকে কাঁকড়ার উদর মনে কর, সেটা তার উদর নয়, সেই খানেই তার মুখ,— উদরটা মাথার কাছে। কাঁকড়া যখন সম্মুখের পা দিয়া খাবার মুখের মধ্যে পুরিয়া দেয়, তখন মনে হয়, সে বুঝি খাবার একেবারে পেটের মধ্যেই পুরিয়া দিল।

জলে যে সকল মৃত প্রাণীর দেহ থাকে, কাঁকড়া সাধারণতঃ তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করে; মৃত জন্তুর মাংস উদরসাৎ করিয়া জলকে পরিষ্কার রাখে, নতুবা তাহা পচিয়া জল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর হইত। কাঁকড়ারা কোন মরা মাছ্ বা অপর কোন মরা জন্তু দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ সেটাকে আহার করিতে আরম্ভ করে। বড় বড় কাঁকড়ারা তাদের বড় বড় নখ দিয়া সেটাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মুখে পুরিতে থাকে। ছিঁড়িবার সময়ে বা মুখে পুরিবার সময়ে যে সব ক্ষুদ্র অংশ খসিয়া পড়ে, ছোট ছোট কাঁকড়ারা তাহাই খায়। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহারা যে শুধু মৃত প্রাণীর মাংস খায় তাহা নহে। ছোট ছোট প্রাণী বধ করিয়া খাইতেও ছাড়ে না। যখনই দুটী কাঁকড়া, বিশেষতঃ দুটী পুরুষ কাঁকড়া একত্র হয়, তখনই তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যে জয়লাভ করে, সে আহত বা মৃত শত্রুকে খাইয়া ফেলে। একটী পাত্রে যদি কুড়ি পঁচিশটা কাঁকড়া রাখা যায়, তবে কয়েকদিন পরে দেখা যাইবে, যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কাঁকড়াটা বাঁচিয়া আছে, অপরগুলি হত ও ভক্ষিত হইয়াছে।

রাইমার জোন্স্ সাহেব লিখিয়াছেন, "একবার আমি ছয়টা কাঁকড়াকে একটা কাচপাত্রে রাখিয়াছিলাম। ইহাদের মধ্যে একটা কাঁকড়া ধীরে ধীরে সেই পাত্রের মাঝখানে আসিল।

তখন হঠাৎ আর একটা কাঁকড়া আসিয়া সেই ছোট কাঁকড়াটাকে সাঁড়াশির মত নখ দিয়া কামড়াইয়া ধরিল এবং তার পিঠের খোলা ফুটা করিয়া তাহার মাংস বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খানিক পরে আর একটা বড় কাঁকড়া আসিয়া, সেই দ্বিতীয় কাঁকড়াটাকে ধরিয়া তাহার পিঠের খোলা ভাঙ্গিয়া মাংস কুরিয়া বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে কাঁকড়াটা তাতে কোনই আপত্তি করিল না, পূর্ব্বের মত ছোট কাঁকড়াটাকে খাইতে ব্যস্ত রহিল! বোধ হয়, কাঁকড়াদের বেদনা বোধ বড় একটা নাই। যাহা হউক, এইরূপে জোন্স্ সাহেবের সব কাঁকড়াই ক্রমে ক্রমে ভক্ষিত হইল, কেবল সেই বড় কাঁকড়াটাই অবশিষ্ট রহিল।

যুদ্ধে কাঁকড়াদের দু'একটা ঠ্যাং ছিঁড়িয়া বা শরীর হইতে খসিয়া যায়। তাহাতে কাঁকড়ার দুই চারিদিন একটু অসুবিধা ছাড়া অন্য কোন ক্ষতি হয় না, কারণ শীঘ্রই আবার নূতন ঠ্যাং গজায়। যদি তার দাড়া বা অপর কোন ঠ্যাং খুব জখম হয়, অথচ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে কাঁকড়া নিজেই তাহা শরীর হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাতে তাহার কোনও কষ্ট বোধ হয় না। কয়েকদিন পরে নূতন ঠ্যাং বাহির হয়।

সুযোগ পাইলে কাঁকড়া তাহার অপেক্ষা বড় প্রাণী ধরিয়াও খায়। মাছ ধরিয়া ত খায়-ই, মানুষ খায় এরূপও কথিত আছে। বিখ্যাত নাবিক ড্রেক্ সাহেব যখন জাহাজ লইয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছিলেন, তখন জাহাজ ভাঙ্গিয়া তাঁহার কয়েক জন নাবিক ভাসিতে ভাসিতে একটা নির্জ্জন দ্বীপের কূলে গিয়া পড়িয়াছিল। কিছুকাল পরে লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া আসিয়া সেই অসহায় ক্লান্ত নাবিকদিগকে আক্রমণ করিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।

যদিও সব কাঁকড়াই মাংসভোজী তবু ইহাদের কোন কোন শ্রেণীকে ফলমূল খাইতেও দেখা যায়। পলিনেসিয়া দ্বীপ-পুঞ্জে গেছো-কাঁকড়া নামে এক রকম কাঁকড়া আছে, তাহারা নারিকেল খায়। এই সকল দ্বীপে, সমুদ্রকূলে অনেক নারিকেল গাছ জন্মে। এই কাঁকড়ারা নারিকেল গাছের মূলে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে বাস করে। গাছ হইতে যে সকল নারিকেল মাটীতে পড়ে, ইহারা সাঁড়াশির ন্যায় কঠিন ও সবল নখ দিয়া সেই সব নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া ফেলে। পরে নারিকেলের খোলাটার উপর খুব জোরে বারংবার নখের আঘাত করিতে করিতে তাহাতে ছিদ্র করিয়া ফেলে। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া নখ প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া খায়। সামোয়া এবং স্পাইস্ দ্বীপে চোর-কাঁকড়া নামে আর এক প্রকারের গেছো-কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নারিকেল গাছে বিচরণ করে ও নারিকেলের ছোবড়া দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা গাছ হইতে বোঁটা কাটিয়া নারিকেল মাটীতে ফেলিয়া দেয় ও ছোবড়া ছাড়াইয়া নারিকেল ভাঙ্গিয়া খায়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা ছোবড়া ছাড়ান নারিকেল লইয়া গাছের উপরে উঠে ও তথা হইতে তাহা ভূতলে

নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া খায়। একবার একজন ভদ্র লোক সামোয়র জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যে একটা বড় চোর-কাঁকড়া, নারিকেল গাছের পাতা হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া, নীচে একটা ছাগল চরিতেছিল, তাহার গলা চিম্‌টাইয়া ধরিল ও তাহাকে মাটী হইতে প্রায় শূন্যে টানিয়া তুলিল। ইহাদের গায়ে এতই জোর।

জাপান সমুদ্রে এক রকম প্রকাণ্ড কাঁকড়া আছে। তাহা দেখিতে অনেকটা খুব বড় মাকড়সার মত। ইহার এক একটা ঠ্যাং খুব লম্বা—তিন চার হাত হইবে, এবং মানুষের হাতের মত মোটা। তার দাড়ার নখ দুখানিই এক হাতের বেশী লম্বা। জাপানীরা এই কাঁকড়াকে ভারি সুখাদ্য মনে করে। একবার একজন মেছো নৌকা করিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতেছিল, এমন সময়ে একটা বৃহৎ কাঁকড়া হাত বাড়াইয়া মেছোর পা ধরিয়া টানিয়া জলে নামাইয়াছিল। মেছো ভয়ে বিহ্বল না হইয়া, হাতের বড় ছোরা দিয়া কাঁকড়ার দাড়া দ্বিখণ্ড করিয়া দিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। নতুবা সে যাত্রা আর তাহাকে বাঁচিতে হইত না।

ডিম ফুটিয়া যখন কাঁকড়া বাহির হয় তখন তার বেশ বড় লেজ থাকে, আর তখন তাকে অনেকটা চিংড়ি মাছের মত দেখায়। এক একবার যখন খোসা বদলায়, তখন তার চেহারাও বদলাইয়া যায়, অবশেষে লেজশূন্য কাঁকড়াব আকার ধারণ করে। কোন কোন কাঁকড়ার একটুখানি লেজ থাকে। শক্ত খোলার মধ্যে থাকে বলিয়া কাঁকড়ার শরীর বাড়িতে পায় না। সেই জন্য মাঝে মাঝে কাঁকড়াকে সাপের মত খোলস ছাড়িতে হয়। যথাসময়ে খোলাটা ফাটিয়া যায় এবং শরীরের মাংসও খুব নরম হইয়া যায়। তখন সেই ফাটা স্থান দিয়া কাঁকড়া আপনার সমস্ত শরীরটা বাহির করিয়া লয়, শুধু খোলাটা পড়িয়া থাকে। সেই সময়টা কাঁকড়ার শরীর ভারি নরম থাকে। কাঁকড়া শরীরে আঘাত লাগিবার ভয়ে, গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে। এই সময়ে শরীরটা যতদূর সম্ভব বাড়িতে থাকে। শরীরের ওপরটাও ক্রমে শক্ত হইতে থাকে ও কিছুকাল পরে নূতন খোলায় আবৃত হইয়া যায়।

অনেকে চিংড়ি ও কাঁকড়াকে মাছ বলে। বাস্তবিক উহারা মাছ নয়। মাছের শরীরের ভিতরে অস্থি বা কাঁটা থাকে, পিঠে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড থাকে, গায়ে লাল রক্ত থাকে। কাঁকড়া বা চিংড়ির এসব কিছুই থাকে না। ইহারা পোকা বা কীট। ইহারা মাকড়সা শ্রেণীভুক্ত, মাকড়সারই জাতভাই। যখন কাঁকড়া বা চিংড়ি খাও তখন যেন মনে থাকে, যে এক রকম জলচর মাকড়সা খাচ্চ!

মুকুল। শ্রাবণ ১৩০৮। পৃ. ৫২-৫৫

মাকড়সার জাল

মাকড়সার উদরের কিঞ্চিৎ নিম্নে সূতা প্রস্তুতের কল থাকে। এই কল অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত। ইহা হইতে এত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় যে, তাহা প্রায় আমাদের চক্ষেই পড়েনা। মাকড়সা সাধারণতঃ যেরূপ সূতায় জাল প্রস্তুত করে, তাহাতে প্রায় ৪০০০ গাছি অতি সূক্ষ্ম সূতা থাকে। এই সূতার সহস্র সহস্র গাছি একত্র করিলে. তবে তাহা আমাদের মস্তকের কেশের মত স্থূল হয়।



যেস্থানে ও যেরূপভাবে জাল প্রস্তুত করিলে শিকার সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, মাকড়সারা সেই স্থানে তেমনি করিয়া জাল পাতে। এই জালে রীতিমত টানা এবং পড়েন দেওয়া থাকে। মশা, মাছি প্রভৃতি ধরিবার জন্য জালের মধ্যে মধ্যে কোষ প্রস্তুত করে। জাল পাতা শেষ হইলে, মাকড়সা জালের কয়েকগাছি সূতা কিছু দূরে এক স্থানে বাঁধিয়া. তাহারই কাছে লুকাইয়া থাকে। এই সূতা যেন টেলিগ্রাফের তার! মশা. মাছি প্রভৃতি ধরা পড়িলেই, অমনি থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে। সংবাদ পাইবামাত্র মাকড়সা ছুটিয়া আসিয়া শিকার ধরিয়া ফেলে।

মুকুল । আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৮। পৃ. ১১০-১১১

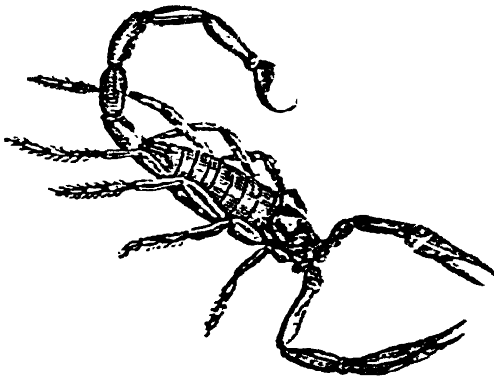
কাঁকড়া-বিছা

কাঁকড়া-বিছা মাকড়সার জাতভাই। কাঁকড়ার সহিত ইহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। তবে কাঁকড়ার ন্যায় ইহার সাঁড়াসির মত খুব বড় এক জোড়া "দাড়া" বা হাত আছে, তাই ইহার নাম কাঁকড়া-বিছা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বৃশ্চিক বলে, আর হিন্দুস্থানীরা ইহাকে বলে, "বিচ্ছু"।

তেঁতুলে-বিছা বা চেলার সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই। একটা বড় তেঁতুলে-বিছাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কতকগুলি তেঁতুল বীচি একত্র গাঁথা রহিয়াছে। কাঁকড়া-বিছা সে রকম নয়। তেঁতুলে-বিছার শরীরের দু'ধারে সারি সারি অনেকগুলি পা ; কাঁকড়া-বিছার মাকড়সার মত কেবল চার জোড়া পা।

কাঁকড়া-বিছার লেজটি বেশ লম্বা, আর তা ছয় ভাগে বিভক্ত। শেষ ভাগটিতে বিষের থলি আছে, আর তার আগায় বাঁকা ছুঁচের মত একটা হুল আছে। হুলটিতে আগাগোড়া একটা সরু ছিদ্র আছে।

চলিবার সময়ে বিচ্ছু হুলযুক্ত লেজটি পিঠের উপরে বাঁকাইয়া রাখে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন সে তার ছোরাখানি তুলিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে সুযোগ পাইলেই বসাইয়া দিবে। চলিবার সময়ে ওরূপ লেজ উঠাইয়া চলার উদ্দেশ্য জল ফুটাইবার জন্য প্রস্তুত থাকা, এবং মাটিতে ক্রমাগত ঘষা লাগিয়া হুল ভোঁতা না হয় তাহার উপায় করা। হুল ফুটাইবার সময়ে বিচ্ছু লেজটিকে পিঠের উপর বাঁকাইয়া লয় ও এত শীঘ্র আঘাত করে, যে সে হুলের দংশন এড়ান সহজ নহে। হুল ফুটিলে হুলের ছিদ্রপথে বিষ-কোষ হইতে বিষ আসিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহার বিষ বড় ভয়ঙ্কর। জ্বালা ও যন্ত্রণা ত খুব হয়-ই, সময়ে সময়ে মানুষ মারাও পড়ে।



শীতপ্রধান দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁকড়া-বিছা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁকড়া-বিছা অনেক রকমের আছে। কোন কোনটা মোটে তিন চার ইঞ্চ লম্বা হয়, আবার কোন কোনটা দশ বার ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কোন কোনটা লাল হয়, কোন কোনটা ধূসর, আর কোন কোনটা কালো হয়। ইউরোপে তিন চার ইঞ্চের চেয়ে বড় বিচ্ছু দেখা যায় না। লাল রঙ্গের বড় বিচ্ছু কেবল ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় দেখা যায়। ইহারা প্রায় দশ ইঞ্চ লম্বা হয় ও পাহাড়ে যায়গায় বাস করে। কলিকাতার মিউজিয়াম বা যাদুঘরে যদি বেড়াইতে যাও, তবে ছোট বড় নানা রকমের বিচ্ছু দেখিতে পাইবে।

সব বিচ্ছুই রাত্রিচর, আর সব বিচ্ছুই মাংসাশী। ইহারা শুক্‌নো জায়গায় থাকিতে ভালবাসে। দিনের বেলায় ইট পাথরের তলায়, কাঠ বা খড়ের গাদায়, মাটীর গর্ত্তে, দেওয়ালের ফাটলে, অন্ধকার কোণে, এমন কি, ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ফাঁকে ও জুতার ভিতরে আশ্রয় লয়। সন্ধ্যার সময়ে ও রাত্রিতে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। পোকা মাকড়, ফড়িং প্রভৃতি যে কোন জীয়ন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী ধরিতে পারে, তাহাই খায়। ইহাদের তিন জোড়া হইতে ছয় জোড়া চোখ থাকে। এতগুলি চোখ সত্ত্বেও ইহারা আধ হাতের বেশী দূরের জিনিস দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। ইহারা যে শুনিতে পায়, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে স্পর্শ শক্তিটা খুব প্রবল। শিকার নিকটে আছে বুঝিতে পারিলেই, বেগে তাহার উপর গিয়া পড়ে এবং সাঁড়াসির মত "দাড়া" দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে। ধৃতপ্রাণী পলাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, আর বিচ্ছু লেজের আগার ছোরাখানি অর্থাৎ হুলটি তুলিয়া তার গায়ে দুচারি বার বসাইয়া দেয়, তাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বেচারার সব ছট্‌ফটানি থামিয়া যায়, হুলের বিষে সে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

ইহাদের ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। বিচ্ছু ডিম প্রসব করে না। পেটের মধ্যেই এক থলিয়ার ভিতর ডিম থাকে, সেখানেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি প্রথমতঃ মার গায়ে পিঠে ঝুলিতে থাকে। মা যেখানে যায়, বাচ্চাগুলিকে পিঠে চড়াইয়া লইয়া যায়। ইহাদের এত বাচ্চা হয়, যে এক সময়ে ছানাতে মার শরীর একবারে ঢাকিয়া যায়। ছানাগুলি মার মাথায়, পিঠে, লেজে, গায়ে, যে যেখানে পারে, ধরিয়া থাকে।

মুকুল । অগ্রহায়ণ ১৩০৮ । পৃ. ১১৭-১১৮

কাঙ্গারু

চতুষ্পদ জন্তুগণের মধ্যে কাঙ্গারু অতি অদ্ভুত। এই জন্তুর শরীরের পিছন দিকটা খুব মোটা আর সাম্‌নের দিকটা ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়াছে। সাম্‌নের পা দুখানি খুব ছোট, পিছনের পা দুখানি খুব বড়। লেজ লম্বা আর তার গোড়ার দিকটা খুব মোটা। মুণ্ড ছোট, মুখ অনেকটা হরিণের মুখের মত। কান দুটা খুব লম্বা। চোখ দুটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। কাঙ্গারু অদ্ভুত হইলেও দেখিতে মন্দ নয়।

কাঙ্গারু চতুষ্পদ বটে, কিন্তু চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলাফেরা বা দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে না। সাম্‌নের পা দু'খানি খুব ছোট বলিয়া তাহাতে পায়ের কোনই কায হয় না; বরং তাহাতে হাতেরই কায হয়। সাম্‌নের পায়ে পাঁচটি করিয়া নখযুক্ত আঙ্গুল আছে; তাহার দ্বারা কাঙ্গারু জিনিস পত্র ধরিতে পারে। পিছনের পা দু'খানি যেমনি লম্বা তেমনি মোটা। কাঙ্গারু চলিবার সময়ে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া লাফাইয়া চলে। লেজটি যেন আর একখানি পা। কাঙ্গারু যখন বিশ্রাম করে তখন পিছনের দুই পা ও লেজের উপর ভর দিয়া বসে। তখন দেখিলে মনে হয় যেন কাঙ্গারু একটা তেপায়ার উপর বসিয়াছে। পিছনের পায়ে চারিটি করিয়া আঙ্গুল আছে, তার মধ্যে মাঝের আঙ্গুল আধ হাতের চেয়েও বেশী লম্বা, আর সেটাতে খুব মোটা, শক্ত ও ধারাল নখ আছে। এই আঙ্গুলটি কাঙ্গারুর আত্মরক্ষার অস্ত্র। কাঙ্গারুর পিছনের পায়ে এত জোর, এবং নখ এত ধারাল যে, কাঙ্গারু পায়ের এক আঘাতে মানুষ বা কুকুরের পেট চিরিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া দিতে পারে।



কাঙ্গারু সাধারণতঃ নিরীহ ও শান্তস্বভাব; কাহাকেও আক্রমণ করে না। তবে তাহাকে যদি কেহ আক্রমণ করে এবং তাহার যদি পলাইবার উপায় না থাকে, তবে সে ফিরিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তখন যে আক্রমণ করিতে আইসে তাহাকে পিছনের

পায়ের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। একটা কাঙ্গারু একলা কুড়ি পঁচিশটা কুকুরকে হারাইয়া দিতে পারে। অনেক শিকারী এক দল কুকুর লইয়া কাঙ্গারু শিকার করিতে যায়। শিকারী কুকুরের দল তাড়া করিয়া গেলে যদি পলাইবার উপায় না থাকে তবে কাঙ্গারু নিকটের কোনও একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসে। কোন কুকুর নিকটে আসিলে কাঙ্গারু পিছনের পা দিয়া তাহাকে এমন এক ঘা লাগায় যে তাহাতেই কুকুরের নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইয়া যায়! এইরূপে সে একে একে সবকটি কুকুরকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কাছে নদী বা হ্রদ থাকিলে কাঙ্গারু জলে গিয়া পড়ে এবং পিছনের পা ও লেজে ভর দিয়া জলের মধ্যে বসিয়া থাকে। কুকুর সাঁতরাইয়া নিকটে আসিলে কাঙ্গারু সাম্‌নের দুই পায়ে ধরিয়া তাহার মাথাটা জলের মধ্যে চুবাইয়া রাখে। কুকুর দম আটকাইয়া মারা যায়।

কাঙ্গারু ঘাস খায় এবং গরুর মত মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়ায়। খাইবার সময়ে উবুড় হইয়া বসে। তখন সাম্‌নের দুপায়েও ভর দেয়। তখন লেজে ভর দিয়া পিছনের দুই পা সাম্‌নে বাড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। খোঁড়া মানুষ বগলের নীচে লাঠির ভর দিয়া পরে পা বাড়াইয়া দিয়া যে রকম করিয়া অগ্রসর হয়। লেজটাই ইহার ভর দিবার লাঠি। কিন্তু কাঙ্গারু যখন ভয় পায় তখন খুব বড় বড় লাফ মারিয়া চলিয়া যায়। এক এক লম্ফে বার তের হাত ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারে। ইহারা গ্রামের নিকটে চাষের ক্ষেতে ঢুকিয়া শস্য খাইয়া কৃষকদেব বড় ক্ষতি করে।

অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটেব কয়েকটি দ্বীপে কাঙ্গারুর বাস। পৃথিবীর আর কোথাও এই জন্তু দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ায় ছোট বড় নানা জাতীয় কাঙ্গারু দেখা যায়। বড় জাতীয়. কাঙ্গারুর কথাই উপরে বলা হইয়াছে। ইহাদের দেহ নাকের আগা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত আড়াই হাত, পৌনে তিন হাত লম্বা হয়। আর যখন পিছনের পায়ে ভর দিয়া বসে তখন মাথা পর্য্যন্ত তিন হাত উঁচু হয়। লেজটাই দু'হাত লম্বা। এক একটা ওজনে আনাই মণ ভারি হয়।

খুব ছোট জাতীয় কাঙ্গারু ইন্দুরের মত বড় হয়। আবার মাঝারি অনেক রকমের আছে' তবে সকলেরই শরীরের গড়ন একই প্রকার।

ইহাদের সম্বন্ধে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাদী কাঙ্গারুর তলপেটের চামড়া ভাঁজ হইয়া একটা থলিয়ার মত হয়। কাঙ্গারুর ছানা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন অতি ক্ষুদ্র—প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা—একটি মাংসপিণ্ডেব মত থাকে, নড়িতে চড়িতে পারে না। ছানা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ছানার মা তাহাকে তুলিয়া নিজের পেটের থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া দেয়। সেই থলিয়ার মধ্যেই মার স্তন থাকে, বাচ্ছা সেই স্তন পান করিয়া বড় হইতে থাকে। যত দিন না বড় হয় ও নিজে চলা-ফেরা করিতে পারে. ততদিন বাচ্ছা এই থলিয়ার মধ্যেই থাকে। সাত আট মাসের হইলে বাচ্ছাটা এক একবার অল্পক্ষণের জন্য থলিয়ার বাহির হয়। আবার থলিয়ায় ঢুকিয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে

অনেক সময়ে থলিয়ার ভিতর হইতে এক একবার মুখ বাহির করিয়া বাহিরের ব্যাপার দেখিয়া লয়। একটু বড় হইলে থলিয়ার বাহির হইয়া মার নিকটে থাকিয়া মাঠে চরে। কোন কারণে ভয় পাইলে মার পেটের থলিয়ার ভিতর ঢুকিয়া পড়ে, মা তাহাকে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান করে। মদ্দা কাঙ্গারুর পেটে থলিয়া জন্মে না।

মদ্দা অপেক্ষা মাদী কাঙ্গারু আকারে ঢের ছোট হয়। মদ্দা ও মাদীর আকারে এত তফাৎ হয় যে দুটা যে একই জাতের তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে আরও অনেক প্রকারের জন্তু আছে। তাহাদের অনেকেরই পেটে সন্তান পালনের জন্য থলিয়া থাকে। এই রূপ থলিয়া থাকে বলিয়া এই সকল জন্তুদের "দ্বিগর্ভ" জন্তু বলে।

ধ্রুব । বৈশাখ ১৩১৯ । পৃ. ১৯-২০

ছুঁচো

ভাই সন্দেশ,

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় যখন বাড়ী ফিরিতেছি তখন রাস্তার ধারের এক বাড়ীতে একটি ছেলে তাহার পড়া মুখস্থ করিতেছিল,—"এম্—ও—এল্—ই—'মোল্;' মোল মানে ছুঁচো।" সে ইংরাজি (mole) শব্দের অর্থ করিল ছুঁচো। আমি অনেক ছেলেকে আর মাষ্টার মহাশয়দের বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মোল্' মানে ছুঁচো। বাস্তবিক মোল্ আর ছুঁচো এক নয়। আমরা যে জন্তুকে ছুঁচো বলে জানি, মোল্ দেখিতে ঠিক সে রকম নয়। বাঙ্গলা দেশে মোল্ নাই। ভারতবর্ষে কেবল দার্জ্জিলিং প্রভৃতি হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ে-যায়গাতেই মোল্ দেখা যায়।

ছুঁচো মোল্ আর কাঁটাচুয়া (ইংরাজিতে যাকে বলে হেজ্‌হগ্) একই দলের বা বর্গের জন্তু। এই বর্গের জন্তুগণ সাধারণতঃ কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাই উহাদের কীট ভোজী জন্তু বলে। এই বর্গের সকল জন্তুই খুব ছোট ছোট হয়। ইহাদের মুখ সরু, নাক লম্বা, সাম্‌নের পা দুখানি বেশ মজবুত আর নখও মাটি খুঁড়বার উপযোগী। দাঁতগুলির আগা সরু ও ছুঁচল, ইঁদুরের সম্মুখের দাঁতের মত চ্যাটাল বা কষের দাঁতের মত চ্যাটাল নয়।

মোলের শরীর অনেকটা পুলিপিটার মত, লম্বা ও গোল, এবং সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক্ ক্রমশঃ সরু। নাকের আগাটাও সরু, লেজটা ছোট। মোলের পিছনের পা অপেক্ষা সম্মুখের পায়ের তলা অনেক চৌড়া এবং শক্ত চামড়ায় ঢাকা। পিছনের পায়ের নখ সরু ও ছোট, সামনের পায়ের আঙ্গুলে বড় বড় চ্যাটাল তীক্ষ্ণ নখ থাকে। সেই সব নখের দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া সেই মাটী পায়ের দ্বারা দূরে ঠেলিয়া ফেলে, আর সরু নাকের আগা ক্রমাগত মাটীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। এইরূপে মাটীতে সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিয়া, মোল্ তাহাতে প্রবেশ করে ও মাটীর ভিতরে যে সব পোকা মাকড় থাকে তাই ধরিয়া খায়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে মোলের চোখ নাই, মোল্ অন্ধ। সেটা ঠিক নয়। মোলের চোখ দু'টি খুব ছোট, তাতে আবার গায়ের ঘন লোমে ঢাকা—দেখিলে চোখ নাই বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মাটীর তলে সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারেই কাল কাটায়, সুতরাং চোখের তত প্রয়োজন হয় না। গন্ধ ও শব্দের দ্বারাই ইহারা পোকা মাকড়ের সন্ধান পায় ও তাহাদের অনুসরণ করে। ইহারা সর্ব্বক্ষণই খায় ও খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। এত খায় তবু ইহাদের ক্ষুধা মিটে না। ইউরোপে মোল্ বাগানের ও মাঠের

পোকা মাকড় খাইয়া ফেলিয়া কৃষকের উপকার করে।

ইহারা আঁকা বাঁকা, বহু শাখা প্রশাখা ও বহু দ্বারযুক্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। যে সকল প্রাণী ইহাদের শত্রু তাহারা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে, ইহারা সহজেই আঁকা বাঁকা পথে পলাইয়া যায়, শত্রু গোলক ধাঁধায় পড়িয়া দিশাহারা হইয়া যায়। মোলের শরীর মখমলের মত ঘন কোমল লোমে ঢাকা। সে লোম এমন মসৃণ যে তাহাতে একটুও ধূলা কাদা লাগে না।

ইউরোপীয় মোলের মাথা ও শরীর পাঁচ ইঞ্চ আর লেজটা এক ইঞ্চ লম্বা হয়। ভারতীয় মোল্ ইউরোপীয় মোলেরই সমান বড় হয় কিন্তু লেজটা খুব ছোট্ট, প্রায় সিকি ইঞ্চ লম্বা— তাহাও আবার গায়ের লোমে এমন ভাবে ঢাকা যে, লেজ নাই বলিয়াই বোধ হয়।

ছুঁচো বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, ছুঁচো দেখিতে অনেকটা ইন্দুরের মত; কিন্তু ইহার মুখ দাঁত ও লেজের গড়ন অন্য প্রকার। ইন্দুরের মুখের চেয়ে ছুঁচোর মুখ অনেক সরু। ছোট নাকটাও লম্বা ও ছুচ্‌লো এবং মুখের সাম্‌নে অনেকখানি বাহির হইয়া থাকে" ইন্দুরের লেজ অপেক্ষা ছুঁচোর লেজ ছোট। ছুঁচোর চোখ ছোট কিন্তু কাচের পুঁথীর মত উজ্জ্বল। পাতা বড় ও গোল। ছুঁচোর গা ঘন নরম লোমে ঢাকা। ছুঁচোরা ফড়িং আরসুল্লা, কেঁচো, অন্য নানা প্রকারের কীট পতঙ্গ, শামুক গুগ্‌লি ও ছোট ছোট ব্যাঙ এবং টিক্‌টিকি গিরগিটি প্রভৃতির ডিম খায়। মরা জন্তুর মাংসও খায়। গোবরের ঢিপি খড়ের গাদা ও অন্য আবর্জ্জনা রাশির আশে পাশে প্রায়ই ইহাদিগকে পোকার সন্ধানে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা যায়।

ইহারা সচরাচর রাত্রিতেই আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। মাটীতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বা ইঁট পাথরের গাদার ফাঁকে, খানাখন্দে বা অন্য জন্তুর গর্ত্তে, ইহারা বাস করে। ছুঁচো অনেক রকমের হয়। ভূচর ছুঁচোরা মাটীতেই চলা ফেরা ও বসবাস করে। ইহাদের তলপেটে দুই ধারে ও জংঘায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস কোষ আছে তাহা হইতে এক প্রকার উগ্র দুর্গন্ধ রস বাহির হয়। সাধারণতঃ পুরুষ ছুঁচোর গায়েই বেশী দুর্গন্ধ হয়, কোন কোন জাতির স্ত্রী ছুঁচোর দেহ হইতেও দুর্গন্ধ রস বাহির হয়। ছুঁচো যেখান দিয়া বা যে জিনিসের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাতে দুর্গন্ধ হয়, সে গন্ধ শীঘ্র ছাড়ে না। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরে ছুঁচো প্রবেশ করিলে অনেক সামগ্রী দুর্গন্ধ ও অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। ইংলণ্ডের যে সাধারণ ছুঁচো (common shrew) বৈজ্ঞানিক নাম "Sores Vulgaris" তাহা আমাদের দেশের সাধারণ ছুঁচো বা musk shrew নয় কিন্তু স্বভাব প্রকৃতি দুয়েরই প্রায় এক রকম। বিলাতের shrewর গায়ের গন্ধ অপেক্ষা আমাদের দেশের musk shrew র (বৈজ্ঞানিক নাম crocidura) গন্ধ ঢের বেশী উগ্র। আমাদের দেশের দুর্গন্ধী ছুঁচোকে সাধু ভাষায় 'গন্ধ-মুষিক' বলে, ইংরাজেরা musk rat বলেন। কিন্তু ছুঁচো 'মুষিক' বা rat নয়। আমাদের দেশের দুর্গন্ধী ছুঁচো বিলাতী 'শ্রু' অপেক্ষা

ঢের বড় হয়। সাধারণ বিলাতী বড় শ্রুর (shrew) রং লাল্‌চে মেটে, দেহ তিন ইঞ্চ, লেজ আড়াই ইঞ্চ লম্বা হয়। লেজটা গোল না হইয়া চৌকোণা হয়। কান অতি ক্ষুদ্র, বিলাতে ইহারাই পোকা মাকড়ের লোভে লোকের ঘরের ভিতর ঢুকে। এই বর্গের এক জাতিয় ক্ষুদে ছুঁচো আছে, তারা লেজ শুদ্ধ মোটে আড়াই ইঞ্চ লম্বা হয়। ছুঁচো বড় কলহপ্রিয়। দুইটা একত্র হইলেই মারামারি কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করে। যতক্ষণ একটা না মরে ততক্ষণ নিরস্ত হয় না। যেটা মরে অপরটা তাহাকে খাইয়া ফেলে। শ্রুর shrew এই ঝগড়াটে স্বভাব বলিয়া—যে স্ত্রীলোক ভারি রাগী, কুন্দুলে, ও ঝগড়াটে হয়, তাহাকে ইংরাজিতে শ্রু shrew বলে। একটা ঝগড়াটে স্ত্রীলোককে তার স্বামী কি উপায়ে জব্দ করিয়া শান্তস্বভাব করিয়াছিলেন— সেই বিষয় লইয়া ইংরাজ কবি সেক্‌সপীয়র Taming of the shrew নামে এক খানা সুন্দর নাটক লিখিয়াছেন। আমাদের দেশে "ছুঁচো" শব্দ গালি রূপে ব্যবহার হয়। যে লোক নীচ, মন্দপ্রকৃতি, ও ঝগড়াটে তাকে "ছুঁচো" বলে।

একটা প্রবাদ কথা আছে "ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন"। অর্থাৎ ঘরে লোক জনের সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করে, বাহিরে বড় ভাল মানুষটি দেখায়। অথবা ঘরে খাবার নাই যা তা খায়, বাবুয়ানী চাল দেখায় বাইরে। আর একটা প্রবাদ আছে "সাপের ছুঁচো গেলা।" সাপ একবার যাহা ধরে বা গিলিতে আরম্ভ করে তাহা আর ফেলিতে পারে না, সমস্তটা তাহাকে গিলিতে হয়। ছুঁচোকে ধরিয়া তাহার দুর্গন্ধে আর তাহাকে খাইতে পারে না, অথচ ফেলিতেও পারে না, মুস্কিলে পড়ে। সেই রকম যে কাজ ...বা যে জিনিস রাখা আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর বা কষ্টকর হইয়া পড়ে অথচ তাহা ছাড়িতে পারি না বা ফেলিয়া দিতে পারি না, তখন বলি "এ যেন সাপের ছুঁচো গেলার মত।" ছুঁচোর গায়ে দুর্গন্ধ থাকাতে অনেক জন্তু তাকে খায় না। বিড়াল বা কুকুর ছুঁচো মারিয়া খায় না। পেঁচা কিন্তু ছুঁচো ধরিয়া খায়। আমাদের দেশের সাধারণ দুর্গন্ধী ছুঁচো বিলাতী শ্রুর' চাইতে অনেক বড় হয়। তার গায়ের রং ধূসর বা ছেয়ে, পেটের তলা সাদাটে; মাথা ও শরীর সাত আট ইঞ্চ লেজ সাড়ে তিন চার ইঞ্চ লম্বা হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদের দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই গণের অনেক জাতের ছুঁচো আছে। খুব ছোট জাতের ছুঁচো



আমাদের দেশে লেজশুদ্ধ আড়াই ইঞ্চ লম্বা হয়, ইহারা বনে জঙ্গলে মাঠে থাকে। এই দুর্গন্ধী ছুঁচো ইংলণ্ডে নাই কিন্তু ইউরোপের অন্য নানা স্থানে আছে। বিলাতী ছুঁচোর (shrew, sorex এর) দাঁতের রং মেটে বা লাল্‌চে। আর গন্ধী ছুঁচোর দাঁতের রং ধপ্‌ধপে সাদা হয়।

ইহা ছাড়া উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ দাক্ষিণাত্য সিংহল, বোর্ণিও, সুমাত্রা যাবাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অর্থাৎ এসিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে এক গণের ছুঁচো দেখা যায়। তাহারা গাছে গাছেই থাকে, গাছের পোকা মাকড় ও ফল খায়। তাদের বৃক্ষচর ছুঁচো বা গেছো ছুঁচো বলে। ইহাদের লেজটা যেন ঝাঁকড়া, দেখিতে অনেকটা কাঠ বিড়ালের মত। মান্দ্রাজী গেছো ছুঁচোর মত মুণ্ড ও দেহ সাত ইঞ্চ ও লেজ নয় ইঞ্চ লম্বা হয়। ইহা অপেক্ষা ছোট এক জাতির গেছো ছুঁচো আসামে দেখা যায়।

বোর্ণীও দ্বীপে এই বংশের এক জাতির গেছো ছুঁচো আছে তার লেজটা খুব লম্বা হয়, এবং লেজের আগার লোমগুলি এরূপ ভাবে সাজান যে ঠিক পাখীর পালকের মত দেখায়। ইহাকে "কলমপুচ্ছ" গেছো ছুঁচো বলে। গেছো ছুঁচোর বৈজ্ঞানিক নাম (টুপায়া) Tupaia সকল গেছো ছুঁচোই দিবাচর।

আর এক বংশের ছুঁচো আছে তারা জলে সাঁতরায়, জলে ডুব দেয়, জলের ধারে গর্ত্তে থাকে। জলের ভিতরে ও জলের তলায় পাথরের নীচে যে সব জলের পোকা, চিংড়ি প্রভৃতি থাকে তাই খায়। ইংলণ্ডে এই জলচর ছুঁচো Water shrew (বৈজ্ঞানিক নাম crossopus) অনেক দেখা যায়। আমাদের দেশে হিমালয় পাহাড়ের কাছের যায়গায় জলচর ছুঁচো দেখা যায়। জলচর ছুঁচো দিবাচর। দিনের বেলায় খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বংশের ছুঁচো আছে তাদের পিছনের পা দুখানি সম্মুখের পা অপেক্ষা অনেক বড় আর নাকটাও হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা হয়। ইহারা কাঙ্গারুর মত পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলে। ইহারা দিবাচর, দিনের বেলায় পোকা মাকড় প্রভৃতি আহারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে "হাতীনেকো ছুঁচো" বা "লম্ফনকারী ছুঁচো" বলে।

কীটভোজী বর্গের আর এক বংশের প্রাণী আছে তাহাদের দেহ ছোট ছোট শক্ত কাঁটায় ঢাকা বলিয়া তাহাদিগকে কাঁটাচুয়া বা শল্যকণ্ট বলে। ইংরাজিতে বলে হেজ্‌হগ্‌ (hedgehog) বা অর্চ্চিন (urchin)। ইহারা ছয় হইতে দশ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের মাথা, পিঠ ও শরীরের দুই পাশ ছোট ছোট শক্ত কাঁটায় এবং পেটের তলা নরম লোমে ঢাকা থাকে। কাঁটাচুয়া ইচ্ছা অনুসারে এই কাঁটাগুলিকে দেহের উপর পাতিয়া রাখিতে অথবা খাড়া করিয়া তুলিতে পারে। শত্রু নিকটে আসিলে বা ভয় পাইলে, ইহারা মাথাটা পেটের তলায় দিয়া তাল পাকাইয়া একটা গোল পিণ্ডের মত হইয়া যায়। তখন তাহার শরীরের চারিদিকে শক্ত ছুঁচলো কাঁটাগুলি খাড়া হইয়া উঠে। তখন কোন জন্তু তাহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করে না। এই কাঁটার জন্যই ইহারা শিয়াল, বনবিড়াল

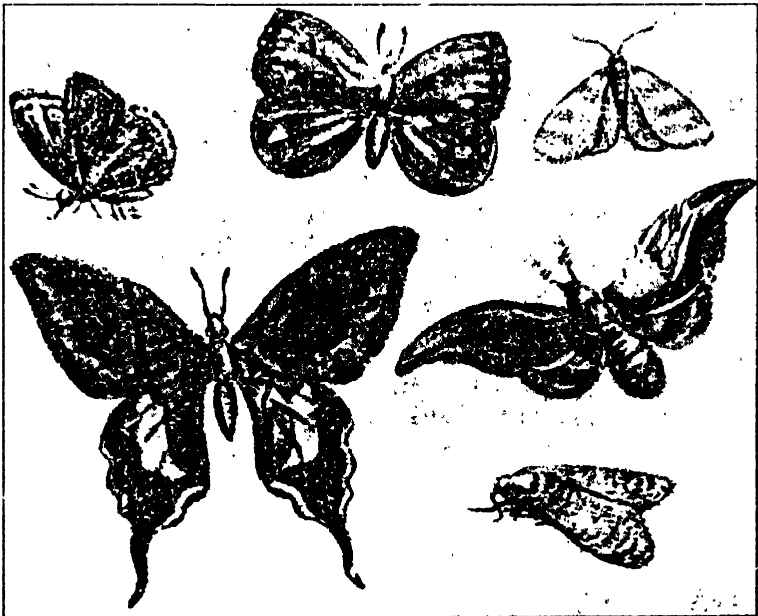
প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পায়। খুব উঁচু হইতে নীচে নামিতে হইলে কাঁটার শরীরকে তাল পাকাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। গায়ের কাঁটা খাড়া হইয়া থাকাতে উঁচু হইতে পড়িলেও শরীরে আঘাত লাগে না। শিয়াল কিন্তু অনেক সময়ে চালাকি করিয়া কাঁটাচুয়া মারে। গোল পিণ্ডটাকে গড়াইতে গড়াইতে জলে ফেলিয়া দেয়। কাঁটাচুয়ার দম আটকাইয়া যায়। তখন সে নিশ্বাস লইবার জন্য বাধ্য হইয়া শরীরকে লম্বা করিয়া জল হইতে উঠিতে চেষ্টা করে। শিয়াল সেই সময়ে তার পেটে থাবা মারিয়া বা কামড়াইয়া তাকে মারিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে বাঙ্গলা দেশ মধ্যপ্রদেশ ছাড়া, অনেক স্থানে— উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পাঞ্জাব প্রদেশ মান্দ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ যে সব প্রদেশ শুষ্ক, সেই মত প্রদেশে কাঁটাচুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও রাত্রিচর। সন্ধ্যার সময়ে খাবার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাঁটাচুয়ার এক কালে চারিটা ছানা হয়। জন্মকালে বাচ্চাদের চোক বোঁজা থাকে। গায়ের কাঁটাগুলিও তখন নরম লোমের মত থাকে। কয়েক দিন পরে বাচ্চাদের চোখ ফোটে। বাচ্চারা যত বড় হইতে থাকে তাদের গায়ের লোমও তত শক্ত ও ছুঁচলো কাঁটার মত হইয়া যায়। কাঁটাচুয়া ফল মূল, পোকা মাকড়, ছোট ছোট পাখী, টিক্‌টিকি গিরগিটি, ব্যাং, কাঁকড়া ও শামুক খায়। কখন কখন সাপ মারিয়াও খায়। সাপকে একবার কামড় মারিয়াই কাঁটাচুয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে, তখন সাপ কাঁটার ভয়ে তাহাকে কামড়াইতে বা ছোঁ মারিতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে কাঁটাচুয়া হঠাৎ সোজা হইয়া আবার এক কামড় মারিয়াই পিণ্ডের মত হইয়া যায়। এইরূপে বারংবার কামড়াইয়া সাপকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলে। পুষিলে কাঁটাচুয়া বেশ পোষ মানে ও ঘরের আরসুলা ও অন্যান্য পোকা মাকড় খাইয়া গৃহস্থের উপকার করে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় কোন রকমের ছুঁচো, মোল্‌ বা কাঁটাচুয়া নাই।

সন্দেশ । বৈশাখ ১৩২৭ পৃ. ১০-১৬

প্রজাপতি

পৃথিবীতে যত প্রকারের কীটপতঙ্গ আছে তাহাদের মধ্যে প্রজাপতিরা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। সাদা, হল্‌দে, নারঙ্গী লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী, কাল--- একরঙ্গা, অথবা নানা নানা রঙ্গের—ছিটা ফোঁটা ডোরা নক্সা কাটা, চিত্র বিচিত্র, কত রকমের যে প্রজাপতি দেখিতে পাই তাহার ঠিকানা নাই। দিনের আলোতে যখন মাঠে ঘাটে, বাগানে গাছ পালায়, ঘাসের উপর, পাতা ও ফুলের মধ্যে প্রজাপতিরা আপন সৌন্দর্য্যের বাহার লইয়া উড়িয়া বেড়ায়, তখন দেখিলে চোখ্ জুড়ায়।

প্রজাপতিদের দুই যোড়া করিয়া পাখা থাকে। দেহের তুলনায় পাখা খুব বড়। প্রজাপতি নানা বংশের ও নানা জাতির হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পাখার গড়ন এবং তাহার রং ও নক্সা ভিন্ন ভিন্ন হয়; তবে প্রত্যেক বংশের একটা বংশগত গঠন থাকে, বা চেহারার ধরণ প্রায় একরকম হয়। কোন কোন বংশের প্রজাপতির দুই যোড়া



পাখাই সমান বড় ও গোল হয়। কোন কোন বংশের দুই যোড়া পাখাই পাখীর ডানার মত লম্বাটে হয়। কোন কোন বংশের উপরের পাখা যোড়া লম্বা আর নীচের যোড়া গোল হয়। কোন কোন জাতির নীচের পাখা যোড়াই দুই কোণ সরু ও লম্বা হইয়া তাল্‌চটা বা ফিঙ্গে পাখীর লেজের মত দেখায়।

একই বংশের প্রজাপতি আবার ছোট বড় নানা আকারের হয়। ক্ষুদে, ছোট, মাঝারি, বড়, অতিবড়, নানা আকারের প্রজাপতি দেখা যায়। ক্ষুদে প্রজাপতি পাখা মেলিলে তাহার বিস্তার সিকি ইঞ্চ হইতে আধ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হয়। ছোটদের আধ ইঞ্চ হইতে এক ইঞ্চ, মাঝারিদের এক ইঞ্চ হইতে দুই ইঞ্চ, বড়দের দুই হইতে পাঁচ ইঞ্চ, অতিবড়দের পাঁচ হইতে বারো ইঞ্চ পর্য্যন্ত পাখার বিস্তার হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রজাপতি, যাহার পাখার বিস্তার একফুট হয়, তাহা আমাদের দেশেই আছে। অত বড় প্রজাপতি আর কোন দেশে নাই।

অনেক জাতির প্রজাপতির পাখায় উপরের পিঠের রং ও চিত্র একপ্রকার, তল বা নীচের পিঠের রং ও চিত্র অন্যপ্রকার হয়; কোন কোন জাতির উপরের পাখা যোড়ার রং অনুজ্জ্বল মেটে, পাটকিলে বা ধূসর, আর নীচের যোড়ার রং খুব উজ্জ্বল ও নানা বর্ণের হয়; কোন কোন জাতির পুরুষদের ডানার রং ও চিত্র এক প্রকার, স্ত্রীদের অন্য প্রকার। ছোট ছোট কয়েক জাতির প্রজাপতির স্ত্রীদের মোটেই পাখা থাকে না। ইহাদের সংখ্যা খুব কম।

প্রজাপতিদের সাধারণতঃ দুই দলে ভাগ করা যায়। প্রথম দলের প্রজাপতিদের দেহ হাল্‌কা ও সরু হয়। দেহে বুক ও পেটের সংযোগস্থল বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাদের মাথায় শুঙ্গ ও শুঁয়া যোড়া লম্বা সরু সূতার মত, কিন্তু তাহার আগাটা মোটা — দেখিতে অনেকটা গদার মত। এই দলের প্রজাপতিরা যখন বসে তখন দুই পাশের পাখা একত্র করিয়া পিঠের উপর খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া রাখে। ইহারা প্রায় সকলেই দিবাচর, দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের শুঁয়া গদাকার বলিয়া ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'রোপালো-সেরা' (Rhopalocera) অর্থাৎ "গদাশুঙ্গী"। ইংরাজি চলিত কথায় বলে 'বাটারফ্লাইস্' (Butterflies) —বাঙ্গলায় ভিন্ন কোন নাম নাই, আমরাও 'বাটারফ্লাই' বলিতে পারি। যদি নেহাৎ বাঙ্গলা নাম দিতে হয় তবে 'দিবাচর-প্রজাপতি' বলিলে চলে।

দ্বিতীয় দলের প্রজাপতিদের দেহ ভারি ও মোটা হয়; বুক ও পেট পৃথক বুঝা যায় না। ইহাদের শুঙ্গ বা শুঁয়াযোড়া নানা আকারের হয়। কোন কোন জাতির লম্বা শুঁয়ায় করাতের দাঁতের মত, কোন কোন জাতির শুঁয়ায় চিরুণীর মত সূক্ষ্ম খাঁজ কাটা থাকে; কোন কোন জাতির শুঁয়ার আকার পাখীর পালকের মত হয়। ইহাদের অনেকের পুরুষের শুঁয়া একরকম স্ত্রীদের অন্যরকম হয়। ইহারা যখন বসে তখন অনেকে পাখা মেলিয়া বা ছড়াইয়া বসে। কোন কোন জাতি দুইপাশের পাখা নীচের দিকে টানিয়া,

উপরের পাখা যোড়া দিয়া নীচের পাখা যোড়াকে ঢাকিয়া, শরীরের সঙ্গে লাগাইয়া বসে; কোন কোন জাতি বসিবার সময়ে দুই দিকের ডানা ভাঁজ করিয়া পিঠের উপর পাতিয়া রাখে; কিন্তু কেহই পাখা যোড়াকে খাড়াভাবে তুলিয়া রাখে না। ইহারা প্রায় সকলেই রাত্রিচর। দিনের বেলায় গাছের ডালের উপর, পাতার তলায়, ঘাসের উপর সমস্তক্ষণ একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যা হইলে উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের শুঙ্গ বা শুঁয়া নানা আকারের হয় বলিয়া ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম "হেটেরো-সেরা" (Hetero cera) অর্থাৎ "নানাকার শুঙ্গী"। ইংরাজি চলিত কথায় বলে 'মথ্' (Moths)। বাঙ্গলায় ভিন্ন কোন নাম নাই। আমরাও 'মথ্' বলিতে পারি, নতুবা 'রাত্রিচর প্রজাপতি' বলিলেও চলে।

'বাটারফ্লাই' অপেক্ষা 'মথে'র সংখ্যাই খুব বেশী। পৃথিবীতে পঞ্চাশ হাজার জাতির প্রজাপতির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে দশ হাজার জাতি 'বাটারফ্লাই' আর চল্লিশ হাজার জাতি 'মথ'। ইংলণ্ডে মোটে ৬৫ জাতির বটরফ্লাই আর ১৯৩৫ জাতির মথ আছে। সমস্ত ইউরোপে তিনশ' বাটারফ্লাই আর পাঁচ হাজার মথ। সমস্ত ভারতবর্ষে দেড়হাজার জাতির বাটারফ্লাই আর সাড়ে আট হাজার জাতির মথের ঠিকানা হইয়াছে। আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রজাপতি— পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক প্রজাপতি সেইখানে।

প্রজাপতি নিরামিষভোজী, অন্য প্রাণীব রক্তমাংস ইহারা খায় না, অথচ ইহাদের শত্রু অনেক। নানা রকমের পাখী, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, বাদুড় প্রভৃতি জন্তু প্রজাপতি ধরিয়া খায়। শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য প্রজাপতিদের নানা উপায় আছে। কতকগুলি প্রজাপতি খাইতে বিস্বাদ, তাই পাখী প্রভৃতি তাহাদের খায় না। বোধ হয় বহুকাল ধরিয়া খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়া পুরুষানুক্রমে পাখী আর টিক্‌টিকি গিরিগিটিদের একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিযা গিয়াছে, তাই তাহারা বিস্বাদ প্রজাপতি দেখিলেই জানিতে পারে, তাদের আর ধরে না। যদি কোন আনাড়ি পাখী বা টিক্‌টিকি না জানিয়া কোন বিস্বাদ প্রাজপতি ধরে, তবে মুখে দিয়াই সেটাকে ফেলিয়া দেয়, আর কখনও সে রকমের প্রজাপতি ধরে না। যে সব প্রজাপতি বিস্বাদ তাহাদের রং প্রায়ই খুব উজ্জ্বল হয়। তাহারা যখন উড়ে তখন ত খুব উজ্জ্বল দেখায়ই—যখন ডানা ভাঁজ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকে তখনও খুব উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখায়। তাহারা যেন শত্রুদের বলিয়া দেয়—"বাপু হে, এই আমি বসিয়া আছি, আমার কাছে আসিও না, আমায় ধরিলে মজাটি টের পাইবে।"

আগেই বলিয়াছি, অনেক প্রজাপতির পাখার উপর-পিঠের রং খুব উজ্জ্বল, আর তল-পিঠের রং অনুজ্জ্বল এবং অন্য প্রকারের চিত্রযুক্ত। অনেক দিবাচর প্রজাপতির পাখা এই রকমের। তাহারা যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের খুব উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখায়। কিন্তু তাহারা যখন দুই পাশের ডানা পিঠের উপর ভাঁজ করিয়া বসে, তখন আশ-পাশের ডালপালা, পাতা বা ফুলের রঙ্গের সঙ্গে এমনি মিশিয়া যায় যে প্রজাপতিকে

সহজে ঠাহর করা যায় না। তাহারা এইরূপে আত্মগোপন করিয়া শত্রুর হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

আমাদের দেশে পাহাড়ে যায়গার বনজঙ্গলে 'কালিমা' নামে এক জাতি দিবাচর প্রজাপতি আছে, তাহারা বড় চমৎকার। একবার হাতী চড়িয়া উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলের এক পাহাড়ের বনের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। এক যায়গায় আমার সম্মুখে প্রায় দশ হাত দূরে একটা বেশ সুন্দর বড় প্রজাপতিকে উড়িতে দেখিলাম। তাহার ডানার রং উজ্জ্বল নীল আর বেগুনি—তাহাতে সুন্দর নারঙ্গী রঙ্গের ফিতার মত চৌড়া দাগ আছে। দেখিতে দেখিতে সেটা হঠাৎ চোখের সাম্‌নেই অদৃশ্য হইয়া গেল, আমি সেইখানে হাতী দাঁড় করাইয়া সেটাকে খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি আবার আমার সাম্‌নে উড়িতেছে। তাহার পর আমার কাছেই সম্মুখের একটা ডালে বসিল, কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও সে যায়গায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে রঙ্গের কোন জিনিষই সে ডালপালায় নাই। এই প্রজাপতি যখনই উড়ে তখনই তাহাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, আর যেই বসে অমনি অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহারা যখন বসে তখন একটা গাছের সরু ডালের উপর পাতার মধ্যে বসে। পাখা দুযোড়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, তখন কেবল পাখার তলার দিক্‌টাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দিকের রং শুক্‌নো পাতার মত। পাখার মাঝামাঝি একটা লম্বা ডোরা থাকে, সেটা দেখিতে পাতার মাঝের শিরার মত। ভাঁজ-করা পাখার আকারটাও ঠিক একটা পাতার মত। পাখার নীচের অংশটা সরু ও লম্বাটে, ঠিক পাতার বোঁটার মত দেখায়। ডালের উপর বসিলে ঐ প্রজাপতিকে গাছের একটা পাতা বলিয়াই ভ্রম হয়। আরও অনেক জাতির প্রজাপতি আছে তাহারা বসিলে কাহাকেও ছেঁড়া পাতার মত, কাহাকেও শুক্‌নো মোড়া পাতার মত দেখায়। আবার কাহারও পাখার রং ফুলের রঙ্গের সঙ্গে বেশ মিশিয়া যায়, তখন আর তাহাদের প্রজাপতি বলিয়া বোধ হয় না।

ছোট বড় অনেক জাতির 'মথে'র পাখার বর্ণ ও চিত্র আত্মগোপনের সহায় হয়। তাহারা যখন পাখা মেলিয়া অথবা ভাঁজ করিয়া গাছের গুঁড়ির উপর বা পাথরের উপর বসে, তখন গাছের গুঁড়ির বা পাথরের রঙ্গের সঙ্গে তাহাদের পাখার রং ও দাগ বেশ মিশিয়া যায়। তাহাদের অনেকের পিছনের পাখা যোড়া খুব রঙ্গীন ও উজ্জ্বল, উড়িবার সময় তাহাদের বেশ ঝক্‌ঝকে দেখায়; কিন্তু যেই সাম্‌নের পাখা যোড়া গুটাইয়া পিছনের পাখা যোড়া ঢাকিয়া ফেলে, তখন আর সহজে তাহাকে ঠাহর হয় না। আবার সুখাদ্য অনেক প্রজাপতি আছে, তাদের পাখার রং ও চিত্র কোন কোন বিস্বাদ প্রজাপতির মত। তাহাদের বিস্বাদ মনে করিয়া শত্রুরা খায় না। আবার অনেক বড় প্রজাপতির পাখায় উজ্জ্বল বর্ণের বড় বড় ফোঁটা বা 'চোখ' থাকে। পাখীরা সেই বড় উজ্জ্বল রঙ্গিন 'চোখ' দেখিয়া তাহারই উপর ঠোকর মারে। তাহাতে প্রজাপতির পাখায় সেই রঙ্গিন ফোঁটা বা 'চোখ'টাই ফুটা হইয়া যায়, প্রজাপতির কিছুই হয় না;

সে প্রাণ লইয়া পালায়। এই সব হইতেছে শত্রু ঠকান রং ও চিত্র।

প্রজাপতির দেহে তিনটা অংশ আছে,— মাথা, বুক ও পেট। মাথায় এক যোড়া শুঁয়া ছাড়া দুইটা বড় বড় বহুপার্শ্বযুক্ত চোখ্ আছে। প্রজাপতিরা কেবল ফুলের মধু, ফলের মিষ্ট রস, গাছের রস প্রভৃতি খায়। কেহ কেহ পচা গাছ পালার বা পচা মাংসের রসও খায়। ইহারা কেহ পাতা ডাঁটা বা অন্য কোন শক্ত জিনিষ খায় না। তাই প্রজাপতির মুখে কামড়াইবার বা চিবাইবার শক্ত চোয়াল বা 'দাঁত' নাই। শুধু রস চুষিয়া খাইবার জন্য ইহাদের মুখে, হাতীর শুঁড়ের মত, সরু লম্বা ফাঁপা শুঁড় আছে। প্রজাপতি সেই লম্বা শুঁড়টাকে ঘড়ির স্প্রিং এর মত গুটাইয়া মুখের সামনে রাখে। ফুলের মধু খাইতে হইলে সেই শুঁড়টাকে খুলিয়া লম্বা করিয়া ফুলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মধু চুষিয়া লয়।

কোন কোন জাতির প্রজাপতির মুখে শুঁড় নাই। তাহারা কিছুই খাইতে পারে না, খায়ও না। ডিম পাড়িবার জন্যই তাহারা বাঁচিয়া থাকে। পাখা গজাইবার পর দুএক দিনের মধ্যেই ডিম মরিয়া যায়। যে সব প্রজাপতি খাইতে পারে, তাহারা কিছু বেশী দিন বাঁচে। পুরুষরা অল্প দিনেই মরিয়া যায়; স্ত্রীরা ডিম পাড়িবার সুবিধা না পাওয়া পর্য্যন্ত বাঁচে, ডিম পাড়া হইয়া গেলে মরে। ইহারা সাধারণতঃ পাঁচ সাত দিন হইতে এক মাস পর্য্যন্ত বাঁচে। খুব শীত বা খুব গ্রীষ্মের সময়ে যখন বাচ্চাদের খাইবার উপযুক্ত গাছপালার অভাব হয়, তখন কোন কোন প্রজাপতি অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে,—নূতন গাছ পালা জন্মাইলে ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়। সে সময়ে সন্তানের সুবিধা করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে।

প্রজাপতির বুকে তিনটা খণ্ড আছে। বুকের প্রত্যেক খণ্ডের তলা হইতে এক যোড়া করিয়া পা বাহির হয়। বুকের শেষের দুই খণ্ডের উপরদিক বা পাশ হইতে এক যোড়া করিয়া পাখা বাহির হয়। অন্যান্য পতঙ্গের মত প্রজাপতিরও তিন যোড়া বা ছয়টা পা থাকে। কোন কোন জাতির তিন যোড়া পা-ই বেশ বড় হয়। পা থাকিলেও ইহারা পা দিয়া বড় বেশী চলা ফেরা করে না। বসিবার জন্য বা অল্পস্বল্প চলিবার জন্য পায়ের দরকার হয়। কোন কোন জাতির সামনের পা যোড়া খুব ছোট্ট অকর্ম্মণ্য হয়। কোন কোন জাতির পুরুষদের পিছনের পা যোড়া খুব ছোট্ট হয়।

প্রজাপতির পেটে নয়টা খণ্ড থাকে। সে সব খণ্ডে পা বা পাখা থাকে না। তাহাতে কেবল দুই ধারে নিশ্বাস লইবার ছিদ্র থাকে। প্রজাপতিদের পূর্ণ রূপান্তর হয়, অর্থাৎ প্রথমে ডিম, তাহার পর ডিম ফুটিয়া শুঁয়াপোকা ও তাহা হইতে নিশ্চল গুটি, তাহার পর গুটি ফাটিয়া পাখাযুক্ত প্রজাপতি হয়। প্রজাপতি যেমন সুন্দর ও বিচিত্র, তাহার ডিম, শুঁয়াপোকা, গুটিপোকা, সবই সুন্দর, বিচিত্র ও নানা প্রকারের হয়।

জাতিভেদে প্রজাপতিরা কেহ গাছের পাতায়, কেহ ফুলে, কেহ ডাঁটায়, কেহ ফলের উপরে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে বাহির হইয়া বাচ্চা শুঁয়াপোকারা যাহা খাইয়া বাঁচিবে,

তাহা বুঝিয়া সেই খাদ্য সামগ্রীর উপর প্রজাপতি ডিম পাড়ে। দিবাচর প্রজাপতির অনেকেই একটা একটা করিয়া পৃথক পৃথক ডিম পাড়ে। কোন কোন জাতি সারি বাঁধিয়া ডিম পাড়ে। রাত্রিচর প্রজাপতিরা প্রায়ই গোছা গোছা বা রাশি রাশি করিয়া শত শত ডিম পাড়ে। দিবাচর প্রজাপতিদের ডিম গোল বা গম্বুজের মত বা লম্বাটে হয়। রাত্রিচর প্রজাপতিদের ডিম প্রায়ই গোল হয়। জাতিভেদে ডিম সাদা, সবুজ, হলদে, কাল, নানা রঙ্গের হয়। অধিকাংশ প্রজাপতির ডিমের খোলার উপরটা পলতোলা বা খাঁজকাটা থাকে। কোন কোন জাতির ডিম মসৃণ হয়। অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে প্রজাপতির ডিম ভারি সুন্দর দেখায়।

রাত্রিচর প্রজাপতির ডিম গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে খুব শীঘ্র ফুটে। দিবাচর প্রজাপতির ডিম পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ফুটে। তবে বৎসরের যে সময়ে ভারি শীত হয় অথবা বাতাস শুষ্ক থাকে, তখন কখন কখন ডিম না ফুটিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। পরে যখন ঋতু অনুকূল হয় তখন ফুটে।

ডিম ফুটিয়া ক্ষুদে ক্ষুদে শুঁয়াপোকা বাহির হয়। বাহির হইয়াই খাইতে আরম্ভ করে। অনেকেই প্রথমেই ডিমের খোসাটাকে খাইয়া ফেলে। তাহার পর যাহাদের যাহা খাদ্য তাহারা তাহাই খায়। কোন কোন জাতি কেবল পাতাই খায় কোন কোন জাতি ফুলের পাপড়ি খায়। কোন কোন জাতি ফলের গা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া ফলের শাঁস খায়। কোন কোন জাতি গাছের ডাঁটার ভিতর ঢুকিয়া ডাঁটার শাঁস খায়। কোন কোন জাতি গাছের শক্ত ডাল ফুঁড়িয়া কাঠ খায়। সব জাতির শুঁয়াপোকা সব রকম গাছের পাতা ডাঁটা বা ফল খায় না। এক এক জাতি দু চার রকমের গাছ ছাড়া অন্য গাছে লাগে না।

আমাদের শাকসবজী বা ফুলফলের বাগানে আর শস্যের ক্ষেতে, নানা জাতি শুঁয়াপোকার দৌরাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা কেবল পাতা খায়, তাহারা গাছের উপরেই থাকে, তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। আর যাহারা ডাঁটার মধ্যে আর ফলের মধ্যে থাকিয়া লুকাইয়া খায়, তাহাদের আর আমরা দেখিতে পাই না। বেগুন ক্ষেতে দেখি বেগুনের কচি কচি ডালগুলি শুকাইয়া যাইতেছে বা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আবার দেখি অনেক বেগুন ফলের ভিতরে শুঁয়াপোকা ঢুকিয়া বেগুনকে ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে। ছোলা বা মটর শুঁটির ভিতর ঢুকিযা কাঁচা মটর বা ছোলা খাইয়া ফুটা বাহির করিয়া দিয়াছে। ধান, গম, ভুট্টার ডাঁটা বা বীজ খাইয়া নষ্ট করিতেছে। আবার দুই এক জাতির ক্ষুদে প্রজাপতির শুঁয়াপোকা ফ্লানেল শাল প্রভৃতি পশমের কাপড় খাইয়া নাশ করে।

সব শুঁয়াপোকার আকার শলার মত লম্বাটে। জাতিভেদে শুঁয়াপোকা নানা রকমের ও নানা বর্ণের হয়। সব শুঁয়াপোকার গায়ে যে শুঁয়া বা লোম থাকে তা নয়। অনেকের দেহ লোমশূন্য বা মসৃণ হয়। কোন কোন জাতির গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু উঁচু মাংসপিণ্ড

থাকে। কোন কোন লোমশূন্য শুঁয়াপোকার পিছন দিকে একটা লম্বা সরু লেজের মত থাকে। কাহারও মাথায় বা পিঠে এক যোড়া সরু লম্বা, গোঁজের মত বাহির হয়। কাহারও কাহারও দেহে লম্বালম্বি লাল কাল বা হলদে ডোরা থাকে। কাহার এড়ো ডোরা থাকে। কাহারও গায়ে রঙ্গীন ফোঁটা থাকে। কাহারও কাহারও দেহে স্থানে স্থানে এক এক গোছা লোম বা কাঁটা থাকে। কোন কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গ লোমে ঢাকা থাকে। কোন কোন জাতির লোম শক্ত কাঁটার মত হয়। অনেকের লোমে বা কাঁটায় বিষ থাকে।

শুঁয়াপোকার শত্রু অনেক। পাখী, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, ছুঁচা, কাঠবিড়াল প্রভৃতি শুঁয়াপোকা ধরিয়া খায়। আবার অনেক পতঙ্গ শুঁয়াপোকার দেহে হুল ফুটাইয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে ডিম পাড়িয়া দেয়। সেই ডিম ফুটিয়া যে বাচ্চা বাহির হয় তাহার শুঁয়াপোকার গায়ের ভিতরে থাকিয়া তাহার রক্ত মাংস খায়। বোলতার মত অনেক পতঙ্গ শুঁয়াপোকার গায়ে হুল ফুটাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া নিজের বাসার মধ্যে লইয়া যায়, আর সেইখানে তাহার পাশে ডিম পাড়িয়া দেয়। সেই ডিম ফুটিয়া যে বাচ্চা বাহির হয়, সে শুঁয়াপোকাকে খাইয়া বড় হয়। এইরূপে অনেক শুঁয়োপোকা মরে।

এত শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার অনেক উপায় আছে। অনেক মসৃণ শুঁয়াপোকার গায়ের রং ও চিত্র ঘাস পাতা ফুল ডাঁটার সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহাদের সহজে ঠাহর হয় না। কোন কোনটা আবার শরীরকে ফুলাইয়া ভীষণ চেহারা করিয়া শত্রুকে ভয় দেখায়। কোন কোনটার আকার ও রং এমন যে দেখিলে বোধ হয় যেন পাখীর বিষ্ঠা পড়িয়া আছে। যে সব শুঁয়াপোকার গায়ে বিষাক্ত লোম ও কাঁটা আছে তাহাদের কেহ ছোঁয় না। অনেক আবার বিস্বাদ, তাদের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণ, তাদেরও কেহ খায় না। তাহাদের অনেকের গায়ে এক এক জায়গার লম্বা লোমের গোছা খুব উজ্জ্বল আর সেই লোম ভারি বিষাক্ত। না খাইলেও, কোন পাখী তাহার গায়ে ঠোকর মারিতে পারে; কিন্তু পাখীরা ঐ উজ্জ্বল জায়গাটার উপরেই ঠোকর মারে। তাহাতে সেই স্থানের রোমের গোছাটা পাখীর মুখে উঠিয়া আসে, পাখী বিষের জ্বালায় অস্থির হয়। শুঁয়াপোকাটা বাঁচিয়া যায়। এই রকম আত্মগোপনকারী রং, ঠকানো রং, ভয় দেখান রং আর বিষাক্ত লোম থাকায় অনেক শুঁয়াপোকা শত্রুর হাত হইতে বাঁচে। তাই বলিয়া সবাই বাঁচে না।

শুঁয়াপোকারা পাতা ডাঁটা প্রভৃতি শক্ত জিনিষ কাটিয়া বা কুরিয়া খায়, তাই তাহাদের কাটিয়া বা কুরিয়া খাইবার উপযোগী এক যোড়া শক্ত চোয়াল বা "দাঁত" আছে। শুঁয়াপোকার মাথায় তিনটা সামান্য চোখ থাকে। সে চোখ প্রজাপতির চোখের মত বহুপার্শ্বযুক্ত নয়। শুঁয়াপোকার বুকের তিন খণ্ডে তিন যোড়া সরু নখযুক্ত আসল পা থাকে। তা ছাড়া পেটের অংশে জাতিভেদে দুই যোড়া হইতে পাঁচ যোড়া উপপদ থাকে। এই সকল উপপদ ছোট্ট ছোট্ট মাংসের বাটীর মত। চলিবার সময় শুঁয়াপোকারা

এইগুলি দিয়া পাতা বা ডালের উপর চাপিয়া ধরিয়া, তারপর শরীরটাকে সাম্‌নে বাড়াইয়া, আসল পা দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। তারপর উপপদ গুলিকে আল্‌গা করিয়া দিয়া শরীরটাকে টানিয়া আনে। যে সব শুঁয়াপোকার পিছন দিকে মোটে দু যোড়া উপপদ থাকে, তাহারা পিঠটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া লইয়া অনেকটা জোঁকের ধরণে চলে। এদের ইংরাজিতে চলিত কথায় বলে looper, (loop অর্থ ফাঁস),—দেহকে ফাঁসের মত করিয়া চলে, তাই ঐ নাম। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এদের বলে Geometridae অর্থাৎ জমি-জরিপকারী, যেন মাটী জরিপ করিতে করিতে চলে। এক রকম শুঁয়াপোকা আছে, তাহাদের আসল পা তিন যোড়া খুব লম্বা লম্বা হয়। তাহাদের দেখিতে অনেকটা কাঁকড়া বা মাকড়সার মত দেখায়।

'লুপার' শুঁয়াপোকারা পিছনের দুই যোড়া উপপদ দিয়া গাছের ডাল ধরিয়া, শরীরকে সোজা টান বা লম্বা করিয়া, খাড়া হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সেই সময়ে ইহাদের দেখিলে গাছের ডালের একটা নূতন লম্বা কুঁড়ি বা কচি ডাল বলিয়া ভ্রম হয়। কোন কোন শুঁয়াপোকাকে ছুঁইলে কেন্নোর মত গোল হইয়া যায়। অনেক জাতির শুঁয়াপোকা আছে, গাছের উপর তাহারা যখন থাকে তখন ছুঁইলে, মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া পাতায় আটকাইয়া দিয়া হঠাৎ ঝুলিয়া তলে পড়িয়া যায়। আর তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন জাতির শুঁয়াপোকা খড়কুটা দিয়া সরু লম্বা একটা খোল তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে থাকে আর সেই খোলের বাসাশুদ্ধ চলা ফেরা করে। ভয় পাইলে, খোলের মধ্যে মুখটা টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। তখন আর তাহাকে কোন পোকা বলিয়া মনে হয় না,—খড়কুটা বলিয়াই ভ্রম হয়। যে সব শুঁয়াপোকা কম্বল ফ্লানেল প্রভৃতি খায়, তাহারাও সেই কম্বল ও ফ্লানেলের লোম জড়াইয়া একটা খোল করিয়া তাহার মধ্যে দেহটাকে ঢাকিয়া রাখে ও সেই খোল সমেত চলা ফেরা করে।

শুঁয়াপোকার মাথা ছাড়া শরীরে যে বারটা খণ্ড আছে তাহার প্রথম, তৃতীয় চতুর্থ এবং শেষ খণ্ড ছাড়া প্রত্যেক খণ্ডের দুই পাশে এক একটি ছিদ্র আছে। অনেকের এই ছিদ্রের চারি পাশ খুব রঙ্গীন হয়। এই সব ছিদ্রের মুখ হইতে নানা শ্বাস প্রশ্বাসের নল শরীরের সর্ব্ব স্থানে গিয়াছে। এই ছিদ্র ও নলের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

ডিম হইতে বাহির হইয়া শুঁয়াপোকা ক্রমাগত খাইয়া খাইয়া বড় হয়। ভিতরের শরীর বড় হইলেও সেই সঙ্গে গায়ের চামড়াটা বাড়ে না। তখন চামড়ায় ভারি টান পড়ে। সেই সময়ে শুঁয়াপোকার গায়ের পুরাণো চামড়ার নীচে নূতন চামড়া লোম প্রভৃতি সবই গজায়। এই সময়ে শুঁয়াপোকা এক স্থানে স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। মাথার কাছে পিঠের উপরে পুরাণো চামড়াটা ফাটিয়া যায়। শুঁয়াপোকা পিছনের পা এক জায়গায় আটকাইয়া দিয়া শরীরটাকে সেই পুরাণো চামড়ার খোলার ভিতর হইতে

টানিয়া বাহির করিয়া লয়। এই সময়ে নূতন চামড়াটা খুব নরম থাকায় শরীরটা হঠাৎ বড় হইয়া পড়ে। তাহার পর আবার বাতাস লাগিয়া চামড়াটা শক্ত হইয়া যায়। শুঁয়াপোকা আবার খাইয়া বড় হয়, আবার চামড়া বদলায়। এইরূপে বার বার খোলস বদলায়। খোলস বদলাইবার সময়টা বড় সঙ্কট কাল; এই সময়ে অনেক শুঁয়াপোকা মরিয়া যায়। শুঁয়াপোকা সাধারণত পাঁচবার খোলস বদলায়। কোন কোন জাতি দুইবার, কোন কোন জাতি সাত আট বারও খোলস বদলায়। চৌদ্দ পনের দিনের মধ্যেই যতটা বড় হইবার হয়। তখন শুঁয়াপোকা আর খায় না। বড় অস্থির হইয়া পড়ে। এইবার তাহার শুঁয়াপোকা অবস্থার শেষ। আর একবার খোলস বদলাইয়া গুটিপোকা রূপ ধারণ করিবে।

এই সময়ে অনেক জাতির দিবাচর প্রজাপতির শুঁয়াপোকা মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া একটা পাতা বা ডাঁটায় লাগাইয়া দিয়া একটা থোপ্‌না তৈয়ার করে। পরে সূতার সেই থোপনায় পিছনের পা দুইটা আটকাইয়া দিয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতে থাকে। এই অবস্থায় শেষবার খোলস বদলায়। তখন চামড়ার ভিতর হইতে পিণ্ডাকার গুটি বাহির হইয়া পড়ে। কোন কোনটার আবার লেজের দিক আটকান ত থাকেই, তাহা ছাড়া গুটির মাঝখানটাও সূতার বেড় দিয়া পাতা বা ডালের সঙ্গে আটকাইয়া লাগিয়া থাকে। ইহাদের গুটি ঝুলে না।

দিবাচর প্রজাপতির গুটির রং সবুজ বা হল্‌দে হয়, তাহাতে সোনালি, রূপালি ফোঁটা থাকে, দেখিতে সুন্দর ও চক্‌চকে হয়। প্রথম অবস্থায় গুটির উপরের চামড়াটা স্বচ্ছ থাকে, তাহার মধ্য দিয়া ভিতরকার প্রজাপতির চোখ, শুঁড়, পা. ডানা, সব একত্র জড়ান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বাতাস লাগিয়া সেই চামড়া শক্ত ও অস্বচ্ছ হইয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই গুটির ভিতরের প্রজাপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তখন গুটির চামড়া ফাটিয়া যায় আর তাহার ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া পড়ে। সেই সময়ে প্রজাপতির ডানা ভাঁজ করা ছোট ও নরম থাকে। প্রজাপতি গুটির পাশেই পাতায় বা ডালে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। রৌদ্র ও বাতাস লাগিয়া পাখাযোড়া শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়, এবং ভাঁজ খুলিয়া গিয়া পাখা ছড়াইয়া পড়ে। তখন প্রজাপতি পাখামেলিয়া উড়িয়া যায়।

রাত্রিচর প্রজাপতির শুয়োপোকার গুটি হইবার পূর্ব্বে দেহের চতুর্দ্দিকে একটা আবরণ বা খোল তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে দেহটাকে একেবারে পূরিয়া ফেলে। তাহার পর সেই খোলের ভিতর থাকিয়াই শুঁয়াপোকা খোলস্ বদলাইয়া গুটি হয়। কেহ কেহ গাছ হইতে নামিয়া মাটির ভিতর, ইঁটপাথরের ফাটলে বা কোন গর্ত্তে মাটীকাদা বা ঘাসপাতা দিয়া গায়ের চারিদিকে একটা খোল বা কোষ তৈয়ার করিয়া লয়। কেহ কেহ গায়ের উপরে পাতা জড়াইয়া ঠোঙ্গার মত একটা খোল করে। কেহ কেহ মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া ও গায়ের লোম দিয়া শরীরের চারিদিকে ফাঁক্

ফাঁক্ বুনাখোলের মত একটা থলিয়া করিয়া লয়। কেহ কেহ মুখের সূতা দিয়া খুব ঘন বুনিয়া একটা শক্ত থলিয়া বা কোষ তৈয়ার করে। যে সব প্রজাপতি সূতা দিয়া ঘন কোষ তৈয়ার করে তাহারা আমাদের কাজে লাগে। এই সব কোষ হইতে আমরা সূতা বাহির করিয়া দামী রেশম তসর এণ্ডি ও মুগার কাপড় তৈয়ার করি।

এই সব খোল বা কোষের ভিতরের গুটি ফাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে পর, সেই প্রজাপতি মুখের লালায় সেই কোষের এক যায়গায় ভিজাইয়া ফুটা করিয়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। গুটি অবস্থায় প্রজাপতি বড় অসহায়। এ সময় তাহার ঘুমন্ত অবস্থা, নড়িতে চড়িতে পারে না, শত্রুর হাত হইতে একপাও পলাইবার যো থাকে না। তাই নিরাপদে থাকিবার জন্য নানা উপায় করিতে হয়।

সাধারণতঃ আট দশ দিনেই গুটি ফাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। তবে বৎসরের যে সময়ে প্রজাপতিদের মধু খাইবার ফুল না থাকে, সে সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত গুটি না ফাটিয়া থাকিতে পারে।

প্রজাপতির সমস্ত জীবনটা আর কত দিনের? ডিমের অবস্থায় থাকে চার পাঁচ দিন, তার পর হয় শুঁয়াপোকা; সে অবস্থায় থাকে দশ বার দিন হইতে পনের কুড়ি দিন, তার পর হয় গুটিপোকা; সে অবস্থাও সাধারণতঃ থাকে মোটে আট দশ দিন, তার পর হয় প্রজাপতি। সেও দুই চার দিন, বড় জোর দু তিন সপ্তাহ। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যে অনেক প্রজাপতির পুত্রপৌত্রাদি করিয়া ছয় সাতটি বংশ হয়। অন্তত দুই তিনটা বংশ ত প্রায় সকলেরই হয়।

বাগানে বা ক্ষেতে এক এক সময়ে দেখা যায়, গাছপালা শুঁয়াপোকায় ভরিয়া আছে গাছের পাতা খাইয়া গাছকে মুড়া করিয়া দিতেছে। আবার দিন পনের পরে হঠাৎ সব অদৃশ্য হইয়া যায়, একটাও শুঁয়াপোকা দেখা যায় না। আবার দশ বার দিন পরে দেখা যায়, দলে দলে প্রজাপতি বাগানে ক্ষেতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। বছরের মধ্যে বারবার এই রকম হয়। কেন এমন হয় এবার হয়ত বুঝিতে পারিয়াছ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক জাতির শুঁয়াপোকা মুখ হইতে চিক্কণ সূতা বাহির করিয়া কোষ তৈয়ার করে। সব রকমের কোষ হইতে টানিলে সূতার খেই বাহির করা যায় না, অথবা তুলার মত পেঁজিয়া পাক দিয়াও ভাল সূতা হয় না, মানুষের কোন কাজেই লাগে না। আবার অনেক রকমের কোষে ভাল সূতা হইলেও সে সব কোষ বনে জঙ্গলে খুঁজিয়া পাতিয়া খুব অল্পই সংগ্রহ করা যায়। যে সব 'মথে'র গুটি হইতে রেসম পাওয়া যায়, তাহাদের দল বা গণকে পণ্ডিতেরা Bombyx বলেন। ইহাদের শুঁয়াপোকারা সাধারণতঃ তুঁত গাছের পাতা খায়, সেই জন্য আমাদের দেশে তাহাদের 'তুঁতপোকা' বলে; অপর নাম পলুপোকা, বা রেসমপোকা। তুঁত পোকা বা পলু পোকা নানা জাতের হয়, যেমন 'বড় পলু', দেশী বা ছোট পলু, মান্দ্রাজি পলু, 'চীনে পলু'। দেশী মান্দ্রাজি ও চীনে পলুর কোষ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ তিন চার বার সংগ্রহ করা হয়। বড়

পলুর কোষ বৎসরে একবারের বেশি পাওয়া যায় না। কারণ ইহার ডিম ফুটিতে দশ মাস লাগে।

পলু পুষিতে হইলে প্রথমে বীজকোষ সংগ্রহ করিতে হয়। বীজকোষ অর্থ, যে কোষের ভিতর জীয়ন্ত গুটি থাকে, যাহার প্রজাপতি বাহির হইয়া যায় নাই। কয়েকটা বীজকোষ একটা ডালায় রাখিয়া দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ৮/৯ দিনে আর শীতকালে ১৫/১৬ দিনেই কোষের ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি পুরুষ ও কতকগুলি স্ত্রী প্রজাপতি থাকে। পুরুষগুলি আকারে ছোট হয় ও সর্ব্বক্ষণই ফড্ ফড্ করিয়া ডানা নাড়িতে থাকে, সেই জন্য ইহাদিগকে 'ফর্ফরে' বলে। পুরুষরা এক দিন বা দুই দিনেই মরিয়া যায়; তাহাদের বাছিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। স্ত্রী প্রজাপতিরা একদিন পরেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, তারপর তিন চার দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। গুটি হইতে বাহির হইয়া রেসমের প্রজাপতিরা কিছুই খায় না, খাইতে পারেও না, মুখে খাইবার যন্ত্রপাতিও থাকে না। ইহাদের জীবনের কাজ শুধু ডিম পাড়া,— ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। একটা রেসম প্রজাপতি গড়ে ৩২০টা ডিম পাড়ে। চল্লিশটা স্ত্রী প্রজাপতি দশ কাহণ অর্থাৎ ১২৮০০ ডিম দেয়।

ডালায় ডিম ফুটিয়া যখন ক্ষুদে শুঁয়াপোকা বাহির হয়, তখন কচি কচি তুঁতপাতা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ডালের উপরে ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহাদের প্রত্যহ বারে বারে তুঁতপাতা কাটিয়া খাইতে দিতে হয়। তিন চার দিন পরে শুঁয়াপোকারা খোলস বদলাইয়া একটু বড় হয়। খোলস বদলাইবার পূর্ব্বে ইহারা কিছু খায় না, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে। খোলস বদলাইয়া তার পর খাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে চার বার খোলস বদলাইয়া বেশ বড় হয়, তারপর ৫/৭ দিনের মধ্যে কোষ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। ডিম ফুটিয়াও কোষ তৈয়ার করা পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকালে ১৮/১৯ দিন, আর শীতকালে ৫৬/৫৭ দিন সময় লাগে। শুঁয়াপোকাদের কোষ তৈয়ারি শেষ করিতে গ্রীষ্মকালে দুই দিন আর শীতকালে চার দিন সময় লাগে।

যখন বুঝিতে পারা যায় যে শুঁয়াপোকারা কোষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন তাহাদের এক একটিকে ধরিয়া 'চন্দ্রকি' নামে এক রকম ডালায় ছাড়িয়া দিতে হয়। কোষ তৈয়ার শেষ হইলে সেই সব কোষ একত্র সংগ্রহ করিতে হয়। তারপর বীজের জন্য কতকগুলি কোষ বাছিয়া রাখিয়া, বাকি সব কোষগুলিকে গরম জলের তাপে বা গরম তন্দুরের মধ্যে দিয়া ভিতরের গুটি মারিয়া ফেলিতে হয়। মারিয়া না ফেলিলে গুটি প্রজাপতি হইয়া কোষ কাটিয়া বাহির হয়। কোষ কাটিয়া গেলে কোষের সূতা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়,— সূতার একটি মূড়া টানিয়া একটা খুব লম্বা সূতা পাওয়া যায় না। আস্ত কোষের সূতার এক খেই টানিয়া, লাটাইতে কোষের সমস্ত সূতা জড়াইয়া লওয়া যায়। কোষের ভিতরের গুটি মারিয়া ফেলিলে সে কোষ যতদিন ইচ্ছা ঘরে রাখা যায়, বিদেশে পাঠান যায়।

কোষ হইতে সূতা বাহির করিবার সময়ে কোষগুলিকে গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে সূতা বেশ সহজে আল্‌গা হইয়া যায়। কেবল একটা কোষের সূতা লইয়া জড়াইলে সূতার আঁশ বড়ই সরু হয়; সেই জন্য তিন চারটা কোষের সূতার খেই একত্র করিয়া, একসঙ্গে টানিয়া একগাছি সূতার মত করিয়া লাটাইয়ে জড়াইতে হয়; আরও মোটা সূতা করিতে হইলে, পাঁচ সাতটা বা দশ বারটা কোষের খেই এক সঙ্গে করিয়া জড়াইলেই হইল।

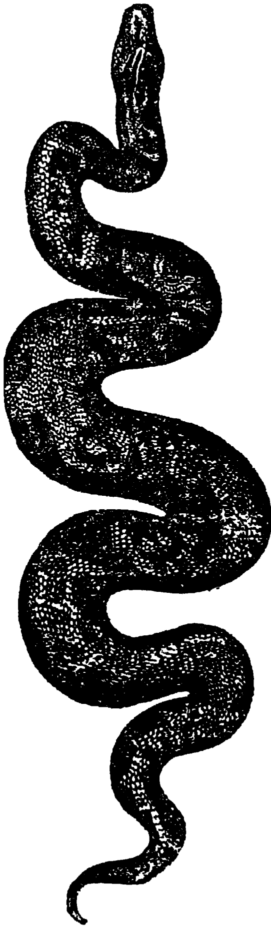
এই উপায়ে যে সূতা হয়, তাহাতেই ভাল রেসমের কাপড় হয়। কাটা কোষ হইতেও সূতা করা হয়। তুলা পাক দিয়া যেমন সূতা তৈয়ার করা হয়, এই কোষগুলি হইতেও সেই রকমে পাক দিয়া সূতা করিতে হয়। সে সূতা দিয়া মোটা রকমের কাপড় বুনা যায়, তাহাকে 'মটকা' কাপড় বলে।

তসর আর এণ্ডির সূতা অন্যরকম মথের কোষ হইতে সংগ্রহ করে।

সন্দেশ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। পৃঃ ৪৪-৫০
আষাঢ় ১৩২৭। পৃঃ ৭২-৭৮
শ্রাবণ ১৩২৭। পৃঃ ১২২-১২৬

অজগর

'অজ' অর্থ ছাগল, 'গির্' আর গিল একই কথা—'অজগর' অর্থ যে ছাগল গিলিয়া খায়। আস্ত ছাগল গিলিয়া ফেলিতে পারে পৃথিবীতে এমন আর কোন প্রাণী নাই।



ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা সুমাত্রা বোর্ণীও প্রভৃতি দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে, অজগর দেখিতে পাওয়া যায়। অজগর নানা জাতীয় হয়। ইহাদের কাহারও বিষদাত নাই। ইহারা বড় বড় গাছের উপর, পাহাড়ে বড় বড় পাথরের আড়ালে, লুকাইয়া থাকে। কোন জন্তু নিকটে আসিলেই চক্ষের পলকে বিদ্যুৎবেগে তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে বেড়িয়া জড়াইয়া ধরে; তারপর নিজের শরীরটাকে হঠাৎ এমন টান করিয়া ফেলে যে তাহাতেই বেড় বা ফাঁস কষিয়া যায়। কোন জন্তু সে ফাঁস ছাড়াইয়া বাহির হইতে পারে না, তাহার হাড়গোড় সব চূর্ণ হইয়া, দেহটা থ্যাঁৎলাইয়া মাংসপিণ্ডের মত হইয়া যায়। অজগর তখন জন্তুটার মাথার দিক হইতে গিলিতে আরম্ভ করে।

ফাঁস কষিয়া জন্তু মারে বলিয়া ইংরাজিতে অজগরকে Boa constrictor বলে। ইহারা সাধারণতঃ পাখী, বানর, খরগোস, ছোট ছোট হরিণ, ছাগল, ভেড়া, শূয়র প্রভৃতি যে সব জন্তু সহজে গিলিতে পারে, তাহাই ধরিয়া খায়। কখন কখন বাঘ সিংহ প্রভৃতি ধরিয়াও খাইতে দেখা গিয়াছে। বড় বড় মহিষ ধরিয়া চাপিয়া মারিতে পারে, কিন্তু শিংশুদ্ধ অত বড় জন্তুকে গিলে কিনা সন্দেহ। অনেক আষাঢ়ে গল্প শুনা যায়, যেমন— অজগর বড় বড় হাতী গিলিয়া ফেলে, ছোট নৌকাতে চারপাঁচ জন ঘুমাইতেছিল অজগর নৌকাশুদ্ধ সব গিলিয়া

ফেলিল! এ সব অতিরঞ্জিত বানান গল্প। তেমনি অজগরের বড় বড় মহিষ গেলা প্রভৃতির যে সব চিত্র পুস্তকে দেখা যায়, তাহাও কাল্পনিক,— চোখে দেখা সত্য ঘটনার চিত্র নয়। যাহা হউক, অত ছোট মুখ ও সরু গলার ভিতর দিয়া আস্ত একটা ছাগলও যে ঢুকিয়া যায়, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমাদের চোয়ালের দুই পাশের হাড় যেমন একসঙ্গে জোড়া, সাপের সে রকম নয়— তাহার চোয়ালের হাড় দুখানি আল্‌গা। মুখের চামড়াও খুব ঢিলা এবং টান পড়িলে রবারের মত লম্বা হয়।

তোমরা হয়ত হেলে ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছ। হেলে সাপের মুখ গলা ও পেট কত সরু আর ব্যাংটা কত বড়, অথচ হেলে সাপ সেই ব্যাংটাকে আস্ত গিলিয়া ফেলে। সব সাপের মুখের গড়ন এমন যে তাহারা মুখটাকে উপরে নীচে আশে পাশে অনেকখানি ফাঁক করিতে পারে। গলা ও পেটের মাংসপেশীও আবশ্যকমত অনেকখানি বাড়াইতে পারে। ইহাদের চোয়ালে অনেকগুলি ছুঁচল দাঁত আছে, সেগুলির মুখ পিছন দিকে বা ভিতর দিকে বাঁকানো—তাহা দিয়া চিবান যায় না। সাপ একবার যে জন্তুকে গিলিতে আরম্ভ করে তাহার আর বাহির হইয়া পলাইবার উপায় থাকে না। বাহির হইতে গেলেই দাঁতে আট্‌কাইয়া যায়। এমন কি সাপ নিজে ইচ্ছা করিলেও মুখ হইতে শিকার বাহির করিতে পারে না, ক্রমাগত গিলিতে বাধ্য হয়। সাপ যতই চোয়াল নাড়িতে থাকে, শিকারও ততই মুখের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে থাকে।

অজগর-বংশীয় সাপদের পণ্ডিতেরা নাম দিয়াছে 'বোয়া'দি-বংশ। এই বংশ আবার দুই প্রধান দলে বিভক্ত, —'পাইথন', এবং 'বোয়া' আর 'আনাকোণ্ডা'। 'পাইথন'রা দক্ষিণ এসিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অজগর, বোয়া ও আনাকোণ্ডা প্রধানতঃ দক্ষিণ আমেরিকার অজগর।

আমাদের দেশে অজগরকে 'পাহাড়ে বোড়া'ও বলে। সচরাচর দশ বার হাত লম্বা অজগরই দেখা যায়, কিন্তু কখন কখন পনের ষোল হাত অজগরও লোকে মারিয়াছে দেখিয়াছি। পাহাড়ে বনে কুড়ি হাত লম্বা অজগরও আছে। দশ বার হাত লম্বা অজগরের দেহটা মানুষের উরুর মত মোটা হয়। আর ষোল সতের হাত লম্বা অজগরের দেহ মানুষের দেহের সমান মোটা হয়।

ইহারা পাখীর পালক ও জন্তুর রোমশুদ্ধ আস্ত গিলিয়া খায় বলিয়া গিলা কাজটা অতি ধীরে ধীরে হয়। গিলিবার সময় মুখ হইতে অনেক লালা বাহির হইতে থাকে, তাহাতে খাদ্যজন্তুর দেহটা পিচ্ছিল হয় এবং গিলিতে অনেকটা সুবিধা হয়। একটা বড় জন্তু গিলিবার পর সাপের পেটটা অনেকখানি ফুলিয়া উঠে, পেটের মাংস পাৎলা হইয়া যায়, তাহার ভিতর দিয়া গিলিত জন্তুর আকৃতিটা বেশ দেখা যায়। সে সময়ে অজগর আর বড় নড়িতে চড়িতে পারে না, এক জায়গায় স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। মারিলে পালাইতে বা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

আমি একবার উড়িষ্যার এক পাহাড়ে এক অজগরকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

তাহার পেট খুব ফুলিয়া রহিয়াছে, আর গিলিত হরিণের শিং যেন তাহার পেট ফুটা করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে। আর একবার এক অজগরকে এক ঘোড়ার বাচ্চা গিলিতে দেখিয়াছিলাম। আমি যখন প্রথম দেখি, তখন ঘোড়ার মাথাটা গলা পর্য্যন্ত গিলিয়াছে। অজগরটা এক একবার ভোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে আর একটু করিয়া চোয়াল আগাইয়া দিতেছে, আর ঘোড়ার শরীরটাও একটু করিয়া মুখের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। সমস্ত ঘোড়াটাকে গিলিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। বড় জন্তু হজম করিতে দশ বারো দিন লাগে।

অনেক চিড়িয়াখানায় অজগর রাখা হয়। ইহারা জল ভালবাসে, অনেক সময়ে জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। ইহারা সাঁতার দিতে পারে, তবে সচরাচর জলে থাকে না। চিড়িয়াখানায় অজগরকে পায়রা, মুর্গী, হাঁস, খরগোস প্রভৃতি ছোট জীয়ন্ত জন্তু খাইতে দেওয়া হয়। একবার এক চিড়িয়াখানায় এক অজগরের খাঁচায় জীবন্ত খরগোস ফেলিয়া তাহার ফটো লওয়া হইয়াছিল। সাপটা কুণ্ডলি পাকাইয়া শুইয়াছিল; সে দু তিন সেকেণ্ড খরগোশটাকে দেখিল, দু তিনবার লক্ লক্ করিয়া সরু জিভ বাহির করিল, তারপর নিমেষের মধ্যে খরগোসকে জড়াইয়া ফেলিয়া চাপিয়া মারিল। এত শীঘ্র এ কাজটা শেষ হইয়া গেল যে কখন কোন্ দিক্ দিয়া যে দুতিন ফাঁস জড়াইল তাহার কিছুই বুঝা গেল না। তারপর ফাঁস খুলিয়া লইয়া সে খরগোসের মাথাটা গিলিতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধেকটা গিলা হইলে পর ঘাড় উঁচু করিয়া খরগোসটাকে শূন্যে তুলিয়া গিলিতে লাগিল। সমস্তটা গিলিতে বার মিনিট সময় লাগিল।

ইহারা পালক ও লোমশুদ্ধ আস্ত জন্তু গিলে বলিয়া তাহার কোন স্বাদই পায় না, অনেক সময়ে কি গিলিতেছে তাহা বুঝিতেও পারে না। একবার চিড়িয়াখানায় এক অজগর মুর্গী গিলিতেছিল। খাঁচায় একটা কম্বল ছিল, সেটা কোনরকমে মুর্গীর নখে আটকাইয়া যায়। মুর্গী গেলা হইলে তাহার পায়ের সঙ্গে কম্বলের এক অংশও অজগরের মুখে ঢুকিল। অজগরের আর উপায় নাই— কম্বল আর ছাড়িতে পারে না; সমস্ত কম্বলটাই সে গিলিতে বাধ্য হইল! তারপর কম্বলটা হজম করিতে না পারিয়া, কয়েক দিনের মধ্যে মারা পড়িল।

পাইথন অজগরেরা অনেক ডিম পাড়ে, তারপর ডিমগুলি একত্র করিয়া স্তূপ করে। সেই স্তূপটাকে নিজের দেহ দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া কুণ্ডলি পাকাইয়া স্থির হইয়া থাকে। পঞ্চাশ ষাট দিন পর্য্যন্ত এইরূপ তা' দেওয়ার পর ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার দশ পনের দিন পরে বাচ্চারা গায়ের খোলস বদলায়। তারপর তাহারা চড়াই প্রভৃতি ছোট ছোট পাখী বা অন্য ছোট প্রাণী ধরিয়া বড়দের মত ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া গিলিয়া খায়। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রিচর, রাত্রিতে খাবার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়।

দক্ষিণ আমেরিকার বোয়া সাপ আট দশ হাতের বেশী লম্বা হয় না। ইহারা গাছের

ডালে লম্বা হইয়া বা কুণ্ডলি পাকাইয়া শুইয়া থাকে। গাছের তলা দিয়া কোন জন্তু গেলে গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়া পড়িয়া সেই জন্তুকে কামড়াইয়া ধরে ও তাহার গায়ে ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া ফেলে। কখন কখন মানুষ মারিয়াছে এরূপও শুনা যায়। ইহারা ডিম পাড়ে না। ডিম পেটের ভিতরে থাকিয়াই ফুটে, তার পর একেবারে বাচ্চা হইয়া সব বাহির হয়। আমেরিকার অনেক লোকে বোয়ার মাংস খায়। আমাদের দেশেও অনেক পাহাড়ী বুনো লোক অজগবের মাংস খায়।

একবার লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এক খাঁচার মধ্যে দুইটা বোয়াকে রাখা হইয়াছিল। একটা বড় আর একটা একটু ছোট। দুইটা বহুকাল পর্য্যন্ত এক ঘরে একত্র সদ্ভাবে ছিল। এক দিন তাহাদের খাইবার জন্য খাঁচার ভিতর একটা জীয়ন্ত মুর্গী দেওয়া হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে দেখা গেল যে বড় সাপটা সটান লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার সমস্ত দেহের আগা গোড়া বেজায় ফুলিয়া রহিয়াছে। খোঁচা মারিয়া দেখা গেল, তাহার দেহ বাঁকাইবার সাধ্যও নাই। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও খাঁচার ভিতর ছোট বোয়াটাকে কোথাও দেখা গেল না। তাহার পর বড় সাপটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া সাপের রক্ষক বুঝিতে পারিল যে ছোট সাপটা তাহারই পেটের ভিতর রহিয়াছে। সে ছোট সাপটাকে গিলিয়াছে। বোয়া সাপের যে অপর বোয়াকে খাইয়া ফেলা অভ্যাস তাহা নহে। খাইবার জন্য উভয়েই মুর্গীটাকে ধরিয়াছিল, গিলিতে গিলিতে মুর্গীর সহিত ছোটটার মুখ ও মাথা বড়টার মুখের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। একবার গিলিতে আরম্ভ করিলে, কতটা গিলিল আর কিই বা গিলিতেছে, তাহা দেখিতেও পায় না, বুঝিতে পারিলেও আর ছাড়িতে পারে না। তাই, কম্বল গেলার মত, আস্ত সাপটাকে সে গিলিতে বাধ্য হইল।

আনাকোণ্ডা খুব বড় জাতের বোয়া। ইহারা জলে বা জলাশয়ের ধারে থাকিতে ভালবাসে, জলে বেশ সাঁতরাইতে পারে। দেহটি ডুবাইয়া মাথাটি বাহির করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। কখন জলের ধাবে বড় বড় গাছের ডাল জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে। জলের নিকট কোন জন্তু আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে, তারপর গিলিয়া খায়। মানুষকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। ইহারা কুড়ি পঁচিশ হাত লম্বা হয়। ইহারাও ডিম পাড়ে না,— পেট হইতে একেবারে বাচ্চা বাহির হয়। ইহাদের গায়ে গোল গোল চাকা চাকা দাগ বা ফোটা থাকে।

সন্দেশ। আশ্বিন ১৩২৭। পৃ: ১৬৫-১৭২

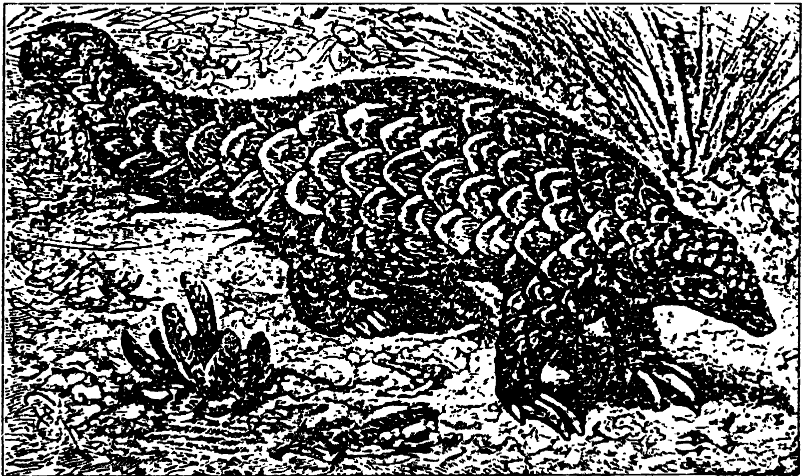
প্যাঙ্গোলিন্ বা বজ্রকীট

কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন যে রংপুরে একটি অদ্ভুত রকমের জন্তু দেখা গিয়াছে। জন্তুটির শরীর বড় বড় মোটা শক্ত আঁইসে ঢাকা। চেহারা কতকটা কুমীরের বাচ্চা বা গোসাপের মত। ইহা লইয়া নানা কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। কেহ কেহ আন্দাজে বলিয়াছিলেন— ওটা আর্ম্মাডিলো। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্ম্মাডিলো নাই, আর্ম্মাডিলোর বাস কেবল দক্ষিণ আমেরিকা দেশে।

রংপুরে যে জন্তুটি দেখা গিয়াছিল তাহাকে আমাদের দেশে--বজ্রকীট, বজ্রকাতী, বা বনরুই বলে। ইংরাজিতে বলে, প্যাঙ্গোলিন। প্যাঙ্গোলিন মালয় দেশীয় নাম— সেই নামই ইংরাজীতে চলিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নাম— 'ম্যানিস্'।

প্যাঙ্গোলিনদের সমস্ত দেহ, পা ও লেজ পুরু ও কঠিন শল্ক বা আঁইসে ঢাকা থাকে। এই সব শল্কের এক ধার গায়ের চামড়ার সঙ্গে লাগা, অপর অংশ আল্‌গা। শল্কগুলির ঘরের চালের টালির মত একটার উপর আর একটা বসান থাকে। প্যাঙ্গোলিন ইচ্ছা করিলে এই শল্কগুলিকে খাড়া করিয়া অথবা শরীরের সঙ্গে পাতিয়া রাখিতে পারে।

ইহাদের মাথা সরু ও লম্বাটে; মুখটা চোঙ্গের মত। মুখের ভিতর দাঁত নাই। ইহাদের জিভ্‌টা কেঁচোর মত সরু ও লম্বা, আঠালো বা চট্‌চটে। মুখের ছিদ্র এত সরু যে মটরের মত ছোট জিনিষও ইহারা মুখে পূরিতে পারে না, দাঁত নাই বলিয়া কোন



জিনিষ চিবাইয়া, কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া খাইতে পারে না। ইহারা তবে খায় কি? যেখানে অনেক উই আর পিঁপড়া থাকে, সেখানে লম্বা জিভ্‌টা ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে উই আর পিঁপড়া আটকাইয়া লইয়া মুখে ইহারা শুধু উই আর পিঁপড়া খাইয়াই জীবন ধারণ করে। আমেরিকায় Ant-eaters বা পিপীলিকাভুক্ আছে, কিন্তু তাহাদের গায়ে শল্ক হয় না, বড় বড় লোম হয়। সেই জন্য প্যাঙ্গোলিন্‌কে...কথায় ইংরাজিতে Scaly eaters বা শল্কধারী পিপীলিকা ভুক্ বলে। আমাদের দেশে এবং আফ্রিকার ও আমেরিকার মাঠে বনে জঙ্গলে এত পিঁপড়া আছে যে উই আর পিঁপড়া খাইয়া জীবন ধারণ করাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

প্যাঙ্গোলিনের পা চারিখানা ছোট ছোট। প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া বাঁকা বাঁকা ধারাল নখ থাকে। পিছনের পায়ের অপেক্ষা সম্মুখের পায়ের নখগুলি বড় মজবুত হয়। কিন্তু এই নখ ইহারা আত্মরক্ষার জন্য বা শত্রুকে মারিবার জন্য ব্যবহার করে। উই এর ঢিপি ভাঙ্গিবার আর পিঁপড়ার গর্ত্ত খুঁড়িবার জন্য নখের ব্যবহার করে। বিপদে পড়িলে বা ভয় পাইলে ইহারা পিঠটাকে বাঁকাইয়া মাথাটাকে বুকের তলে গুঁজিয়া দিয়া, তার পর লেজটাকে পেটের তল দিয়া আনিয়া মাথাটা ঢাকিয়া, ঘাড়ের উপর চাপিয়া দিয়া একটা গোল 'বল্' বা পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। সে সময়ে উহার গায়ে শক্ত ও তীক্ষ্ণ-ধার শল্কগুলি খাড়া হইয়া থাকে। তখন তাহাকে ধরা সহজ নয়। এ অবস্থায় তাহার দেহে আঘাত করিলেও তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইহাদের মাংসপেশীর এত জোর যে একবার ঐরূপ গোল পাকাইয়া বসিলে একজন বলবান লোকেও তাহাকে টানিয়া সোজা করিতে পারে না। এইরূপ কুণ্ডলি পাকাইয়া পিণ্ডের মত হয় বলিয়া ইহার মালয়-দেশীয় নাম প্যাঙ্গোলিন। সেদেশী ভাষায় প্যাঙ্গোলীন কথার অর্থ, পিণ্ডাকারধারী। 'বজ্র' বা হীরার মত শক্ত 'কাতী' বা আঁইস আছে বলিয়া আমাদের দেশে ইহার নাম হইয়াছে 'বজ্রকাতী', 'বজ্রকাপ্তা' বা 'বজ্রকীট'। বনে থাকে, অথচ গায়ে রুই মাছের মত বড় বড় আঁইস আছে, তাই অপর নাম হইয়াছে— 'বনরুই'।

ভারতীয় প্যাঙ্গোলিন ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র পাহাড়ে যায়গায় এবং সিংহল দ্বীপে দেখা যায়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণাত্যের শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা বাস করে। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড প্রায় দেড় হাত আর লেজটা একহাত লম্বা হয়। গায়ের শল্ক পুরু, শল্কের রং ঈষৎ সবুজ আভাযুক্ত গাঢ় খয়েরী। মাথার নীচের পাশে, নাকের ডগায় এবং পেট ও পায়ের তলায় শল্ক নাই।

ইহারা মাটীর নীচে সাত আট হাত গভীর সুড়ঙ্গ কাটিয়া, তাহার তলে দুই ফুট চৌড়া একটা গর্ত্ত করে। সেই গর্ত্তে এক যোড়া একত্র বাস করে। বসন্ত কালে ইহাদের একটা বা দুইটা বাচ্চা হয়। জন্মকালে বাচ্চাদের গায়ের শল্ক খুব নরম থাকে। বড় হইলে ক্রমে শক্ত হইয়া যায়।

উড়িষ্যায় ঢেঙ্কানাল রাজ্যে বাস করিবার সময়ে আমি একটা বজ্রকীট ধরিয়াছিলাম।

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে দেখি একটা ছোট জন্তু ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না—যেন খোঁড়াইয়া চলিতেছে। হাতের লাঠি দিয়া একটা খোঁচা মারিলাম, অমনি সেটা একটা গোল বলের মত হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিল। গায়ের চাদরে সেটাকে জড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম। একটা বড় কাঠের বাক্সের সামনে কতকগুলি লোহার শিক্ লাগাইয়া একটা খাঁচা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সেটাকে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। পরদিন সকালে যখন দেখিলাম তখনও দেখি সেইরূপ পিণ্ডের মত পড়িয়া আছে। সমস্ত দিন সেই ভাবেই রহিল। সন্ধ্যারাত্রে দেখি খাঁচার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যহ সেটা সমস্ত দিন বাক্সের এক কোণে কুণ্ডলি পাকাইয়া একটা গোল 'বল্' এর মত হইয়া পড়িয়া থাকিত। সমস্ত দিন একবার নড়িতও না, খোঁচাখুঁচি করিলে সেই অবস্থায় এক একবার হিস্ হিস্ শব্দ করিত, আর কোন শব্দ করিতে শুনি নাই। সন্ধ্যা হইলে ভারি চঞ্চল হইত এবং খাঁচা হইতে বাহির হইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতি। ধরিতে গেলেই পিণ্ডাকার হইয়া যাইত। খাঁচাটা খুলিয়া রাখিলে খাঁচাব বাহিরে আসিয়া বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইত। লম্বা দড়ি বাঁধিয়া বাগানে ছাড়িয়া দিব বলিয়া তাহার পিঠ ও পেট বেড়িয়া দড়ি বাঁধিতে লাগিলাম; সে তখন গাটাকে ফুলাইয়া দিল। বাঁধিয়া যেই ছাড়িয়া দিলাম অমনি দড়ির ফাঁকের ভিতর হইতে গা বাহির করিয়া লইল।

তারপর তার সামনের এক পায়ে ফাঁস লাগাইয়া দড়িটাকে পেট ও পিঠ বেড়িয়ে পায়ের ফাঁসের ভিতর দিয়া টানিয়া আনিয়া বাঁধিলাম, তখন আর বাঁধন খসাইতে পারিল না। তারপর তাহাকে বাগানে লইয়া দড়ির আগাটা একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলাম। লম্বা দড়িতে বাঁধা, সেটা বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উই এর গর্ত্ত আর ঢিপি দেখিলে সম্মুখের পায়ের বাঁক বাঁকা নখে মাটি ফুঁড়িয়া ফেলিত, মুখ হইতে লম্বা আঁঠাল জিভ্ বাহির করিয়া তাহাতে উই লাগাইয়া লইয়া মুখে পুরিত। চলিবার সময়ে সম্মুখের পা দুখানি মুড়িয়া আর পিছনের পা দুখানি মাটিতে পাতিয়া চলিত। পায়ে বড় বড় ধারাল নখ ছিল, কিন্তু কোন দিন আমায় এত ঘাঁটাঘাঁটি সত্ত্বেও আঁচড়াইতে চেষ্টা করে নাই।

ইহাদের লেজ ধারণক্ষম। টানাটানি করিলে নিকটে যাহা পায় তাহাই লেজে জড়াইয়া ধরে। একবার সেটাকে চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া, হাতে করিয়া উপরে টানিয়া তুলিয়াছিলাম; তখন সে চেয়ারের হাতলটাকে লেজে জড়াইয়া ধরিল। টানিয়া তুলিলে লেজের বাঁধন খুলিল না, চেয়ার শুদ্ধ উঠিয়া আসিল। যখন তাহাকে হাতে তুলিয়া লইতাম, তখন আমার হাতখানিকে লেজে জড়াইয়া ধরিত। টানাটানি করিলে আরো কষিয়া ধরিত। স্থির হইয়া থাকিলে নিজেই লেজের বাঁধন খুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিত।

ইহারা অনেকদিন জল পান না করিয়া থাকিতে পারে। আমি চার পাঁচ দিন অন্তর

সেটাকে একটা সরায় করিয়া দুধ বা জল পান করিতে দিতাম। সে তখন সরার কাছে মুখ আনিত। বারংবার এত তাড়াতাড়ি জিভ্ বাহির করিয়া দুধে বা জলে ডুবাইয়া আবার মুখে টানিয়া লইত যে জিভ্টাকে ভাল করিয়া দেখাই যাইত না। কেবল সপ্ সপ্ শব্দ হইত আর সমস্তটা দুধ বা জল ফেনাইয়া উঠিত। ইহার আহারের জন্য প্রত্যহ উই সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সুবিধা হইত না, তাই অন্য খাবার দিয়া দেখিতাম খায় কিনা। ডিম সিদ্ধ করিয়া চট্‌কাইয়া, ভাত চট্‌কাইয়া ও কাঁচা মাংস পুড়িয়া খাইতে দিলে, জিভে ....লইয়া সে সব খাইত। দুই মাস কাল সেটা আমার কাছে ছিল, পরে ক্রমশ রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল। উপযুক্ত খাবার না পাওয়াতেই বোধ হয় অসুস্থ হইয়া মারা গেল। সেটা নিজে কখনও গাছে চড়িত না, তবে গাছের উপর ছাড়িয়া দিলে ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইত। নামিতে পারিত না, নামাইয়া লইতে হইত।

আর এক জাতীয় প্যাঙ্গোলিন নেপাল আসাম ব্রহ্ম ও চীন দেশে দেখা যায়। ইহাদের দেহ ও লেজ ভারতীয় প্যাঙ্গোলিনের চাইতে ছোট, এবং সেরূপ মোটা নয়; গায়ের শল্কগুলিও ছোট এবং সেগুলির রং কাল। ইহাদিগকে 'চীনা প্যাঙ্গোলিন' বলে। ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, এবং সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি দ্বীপে আর এক জাতীয় প্যাঙ্গোলিন দেখা যায়; তাহাদের দেহ আরও লম্বা ও সরু গোছের, লেজও বড়। ইহাদিগকে 'জাভা প্যাঙ্গোলিন' বলে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে চারি জাতীয় প্যাঙ্গোলিন দেখা যায়— 'দীর্ঘলাঙ্গুল প্যাঙ্গোলিন' 'অতিকায় প্যাঙ্গোলিন' 'খর্ব্ব লাঙ্গুল প্যাঙ্গোলিন' ও 'শাদা-পেটো প্যাঙ্গোলিন'। অতিকায় প্যাঙ্গোলিন্‌গুলি লেজ শুদ্ধ পাঁচ ফুট লম্বা হয়। ইহাদের সকলেরই স্বভাব প্রকৃতি আমাদের দেশীয় প্যাঙ্গোলিনের মত। তবে দীর্ঘলাঙ্গুল এবং শাদাপেটো প্যাঙ্গোলিন অনেক সময়ে গাছে চড়িয়া গাছের উই ও পিঁপড়া খায়; অন্যগুলি সম্পূর্ণ ভূচর, কখনও গাছে চড়ে না।

সন্দেশ। অগ্রহায়ণ ১৩২৭।
পৃ: ২৩১-২৩৬

গঙ্গাফড়িং

ভাই সন্দেশ,

একদিন ভাদ্রমাসের সন্ধ্যা রাত্রিতে ঘরের ভিতর বড় গরম বোধ হওয়াতে, বাহিরে বড় ফাঁকা উঠানে বসিয়া লেখা পড়া করিবার জন্য সেখানে একটা টেবিল ও একটা চেয়ার পাতিলাম। টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বালিয়া, কাগজ পত্র বই সাজাইয়া, লেখাপড়া করিতে বসিয়া গেলাম। আলো দেখিয়া ক্রমে নানা জাতের অনেক পোকা, ল্যাম্পের গায়ে ও আশে পাশের সাদা কাগজের উপর, আসিয়া জুটিল। আমি লিখ্‌ছি আর মাঝে মাঝে দেখছি কত রকম পোকা এল। কিছুক্ষণ পরে একটা বেশ বড় রকমের সবুজ রঙ্গের ফড়িং উড়ে এসে সম্মুখের বড় সাদা খাতাখানার উপরে বস্‌ল। সেটা তার দু জোড়া বা চারখানি খুব সরু সরু লম্বা লম্বা ঠ্যাংএর উপর ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসেছে। তার মাথার নীচে বুকের প্রথম অংশ যেটাকে গলা বলে বোধ হচ্ছে সেটা বেজায় লম্বা। সেই 'গলার' আগার দিকে মাথার কাছ থেকে এক যোড়া মোটা পা বা হাত বেরিয়েছে। সে পায়ে ভর দেয় নাই, সে পা বা হাত যোড়াকে ভাঁজ করে বুকে টেনে নিয়ে হাত যোড় করে চার পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলে বোধ হয় যেন, বিনয়ে হাত যোড় করে কার স্তব কচ্ছে। সেটা অনেকক্ষণ ধরে এই রকম স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে; নড়ে চড়ে না, একমনে স্তবই কচ্ছে।

এ সমস্ত গায়ের রং সবুজ। ডানাটা বুক থেকে পেটের শেষ পর্য্যন্ত লম্বা আর তাতে সমস্ত পেটটা ঢাকা পড়েছে। ডানার রং সবুজ তার উপর জালের মত অনেক শিরা আছে, দেখতে সবুজ পাতার মত। মাথার সামনে থেকে সরু সূতার মত দুটা শুঁয়া



বাহির হইয়াছে। শুঁয়া দুটা ক্রমাগত এপাশ ওপাশ নড়ছে। মাথার দুপাশ থেকে দুটা বড় ড্যাব ঢেবে চোখ বেরিয়েছে।

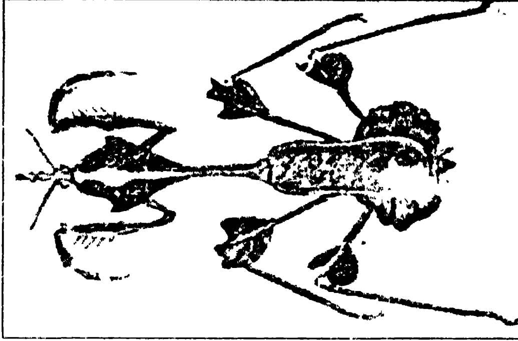
আমার কলমের ডগাটা তার সাম্‌নে মাথার কাছে ধর্‌লাম, তখন সে মাথাটাকে ঘুরিয়ে সেই দিককার বড় চোখ্‌টি দিয়ে খুব মনোযোগ করে এক-দৃষ্টে দেখে নিলে, তারপর মাথাটাকে অপর দিকে ঘুরিয়ে সেই দিকের চোখ্‌ দিয়ে আবার ভাল করে দেখ্‌লে। তারপর মাথা স্থির করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে একটা বড় সবুজ ঘেসো-ফড়িং উড়ে এসে সেই খাতাখানার উপর বস্‌ল। গঙ্গা ফড়িং মাথাটা ঘুরিয়ে দূর হতে প্রথমে এক চোখ দিয়ে দেখল, আবার অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে আর এক চোখ দিয়েও দেখে নিল। তারপর দেখি গঙ্গাফড়িংএর গাটা দুল্‌ছে, যেন তার গায়ের ভার তার অত সরু ঠ্যাংএ সইছে না, পড়ে যাবে। এক দিকে কাৎ হয়ে পড় পড় হ'ল। সেই সঙ্গে দেখি একখানি ঠ্যাং সাম্‌নে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। কখন যে কি করে ঠ্যাংটা অতদূর এগিয়ে দিলে তা ঠাওর কত্তে পার্‌লাম না। তারপর সে ধীরে ধীরে সমস্ত গাটাকে সেই পায়ের টানে এগিয়ে নিলে।



তারপর আবার চার পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে স্থিরভাবে রইল। সর্ব্বক্ষণই করযোড়ে স্তবে রত, জপ্‌ তপ্‌ ছাড়ে নি। তারপর হঠাৎ চখের পলকে ভাঁজ করা সেই দুই হাত খুলে লম্বা করে সটান ঘেসো ফড়িংএর দিকে এগিয়ে দিয়ে, সেই ফড়িংটাকে এনে বাহু ও হাতের সন্ধির মাঝে চেপে ধরে, বুকের কাছে টেনে এনে তার ঘাড়ের মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগ্‌লে। এমনি চেপে ধরেছে যে অতবড় ঘেসো ফড়িং ছট্‌ ফট্‌ কত্তেও পার্‌লে না। তার পর কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মাংস খেতে লাগ্‌ল। পনের মিনিটের মধ্যে তার সমস্তটা খেলে কেবল ডানা দু যোড়া পড়ে রইল। কি ভণ্ড তপস্বী! হাত যোড় করে যেন কতই স্তবস্তুতি করেন, আসলে কিন্তু প্রাণী বধ করবার জন্য ওৎ পেতে থাকেন।

এদের এই রকম হাত যোড় করে থাকা স্বভাব বলে নানা দেশের লোকে এদের ভারি নিরীহ মনে করে। তাই এদের নাম দিয়েছে,—ধার্ম্মিকফড়িং, তপস্বী ফড়িং, নমস্কারী ফড়িং, স্তবকারী ফড়িং। আমাদের দেশে বলে—গঙ্গা ফড়িং অর্থাৎ গঙ্গার উদ্দেশ্যে স্তব করে যে ফড়িং।

গঙ্গাফড়িং নানা জাতির হয়। ছোট বড়, সরু মোটা নানা রকমের দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের রং ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন জাতির মেয়েদের ডানা ছোট হয় বা একেবারেই থাকে না। কোন কোন জাতির ডানা খুব রং চঙ্গে হয়। সকলের স্বভাব প্রকৃতি প্রায় একই রকমের। সকলেই মাংসাশী। এরা ঋজু-পত্রী বর্গের পতঙ্গ। সব রংগের ফড়িং এই বর্গের। অন্যান্য বংশের ফড়িংরা সকলেই তিন জোড়া পায়ে হাঁটে, আর তাদের বুকের প্রথম অংশটা এত লম্বা হয় না। তোমরা জান পতঙ্গদের বুকে তিনটা অংশ থাকে, প্রত্যেক অংশের নীচের দিক থেকে এক এক জোড়া পা বাহির হয়। আর দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশের প্রত্যেকটার উপর থেকে এক জোড়া করিয়া ডানা বাহির হয়। এদেরও সেই রকম, তবে বুকের প্রথম অংশ খুব লম্বা আর সরু হয়, তাই সেটাকে লম্বা গলার মত দেখায়। এরা যেমন মাথা আশে পাশে ঘুরাইতে পারে, অন্য কোন বংশের ফড়িং তা পারে না। এদের প্রথম পা জোড়ায় চলা ফেরার কাজ হয় না, সে পা জোড়া মাটীতেও পড়ে না, তা দিয়ে হাতেরই কাজ হয়।



এদের 'হাতের বা প্রথম পায়ের গড়ন চমৎকার।' সমস্ত 'হাত'খানি যুদ্ধ করিবার, শিকার করিবার ও ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার উপযোগী করিয়া গড়া। তার আগার অংশটাকে চরণ বলে। সেটাতে পাঁচটা গাঁইট বা পাব আছে তার আগায় দুটি ক্ষুদ্র নখ থাকে। তার পরের বা দ্বিতীয় অংশটা 'জংঘা', সেটা ছুরীর ফালের মত পাৎলা ও চ্যাপ্টা আর তার ভিতর ধারে করাতের মত খাঁজ বা দাঁত কাটা থাকে আর তার আগার এক পাশে একটু ছুঁচের মত খুব শক্ত সরু বাঁকা নখ থাকে। তার পরের অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটা 'উরু', সেটা বড়, পুরু ও চ্যাপটা; তা ভিতর ধারে দুই সারি করাতের মত বড় বড় দাঁত বা কাঁটা আছে। হাঁটু বাঁকাইলে বা ভাঁজ করিলে, ছুরীর ফাল যেমন তার বাঁটের লম্বা খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়া যায় সেই রকমে ফালের মত

জংঘাটাও উরুর খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

তার পরের ক্ষুদ্র অংশটাকে অর্থাৎ চতুর্থ অংশটাকে ইংরাজিতে বলে ট্রোকানটার trochanter। তারপর লম্বা অংশটা, যেটা বুকের সঙ্গে কব্জায় লাগা থাকে তাকে বলে (coxa) কক্সা। পায়ের শেষ এই দুই অংশ আমাদের বা অন্য কোন পশুর নাই।

গঙ্গা ফড়িং জংঘাকে উরুর উপর ভাঁজ করে, এবং পায়ের অন্যান্য খণ্ড বা অংশকে ভাঁজ করে সমস্ত পা'টাকে টেনে গুটিয়ে বুকের কাছে রেখে স্থির হয়ে বসে থাকে। শিকার দেখলে তার কাছে ধীরে ধীরে বেমালুম এগিয়ে যায়, তারপর যখন বুঝে যে বেশ লাগাল পাবে তখন হঠাৎ সমস্ত পাটাকে খুলে সটান এগিয়ে দিয়ে শিকারের গায়ে আঁকুশির মত বাঁকা ছুঁচল শক্ত নখ ফুটিয়ে দিয়ে, টেনে এনে জংঘা আর উরুর মাঝে চেপে ধরে। শিকারটা যেন জাঁতির মধ্যে সুপারির মত আটক পড়ে যায়। জংঘা ও উরুতে অনেক ছুঁচল দাঁত বা কাঁটা থাকায় সেগুলিও শিকারের গায়ে ফুঁড়ে যায়, শিকারটা ছটফট করেও সেই দুই অংশের মাঝ থেকে পিছলেও বেরিয়ে যেতে পারে না। গঙ্গাফড়িং তখন সেই আটকান শিকারকে বুকের কাছে টেনে এনে তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।



ইহারা ভারি হিংস্র ও পেটুক। নানা জাতের ফড়িং, প্রজাপতি, মাছি, প্রভৃতি পতঙ্গ ত খায়ই, মাকড়সা ও অন্যান্য ছোট প্রাণী ধরিয়াও খায়। শিকার ধরিয়া যত পারে তত খায়, না খাইতে পারিলে ধরিয়া ছিঁড়িয়া চাখিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট পোকা ত ধরেই, নিজের শরীরের মত বড় পোকাও ধরিয়া খায়। আবার স্বজাতিকে ধরিয়া খাইতে ছাড়ে না। একটা গঙ্গাফড়িং অপর একটা গঙ্গাফড়িংকে ধরিয়া খায়: একথা আগে আমি বইতে পড়েছিলাম। পরে নিজেও জান্‌তে পেরেছি। একবার ঢেঙ্কানলে থাক্‌তে একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমার ফুলের বাগানে একটা গাছে দুটা গঙ্গাফড়িং ধরেছিলাম। দিনের বেলায় ভাল করে দেখ্‌ব বলে, সে দুটাকে একটা কাঁচের বড় বোতলে পূরে, বোতলের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে বোতলটাকে তাকের উপর রেখে দিলাম। পরদিন সকালে দেখি বোতলের মধ্যে একটি মাত্র গঙ্গাফড়িং রয়েছে, অপরটার ডানা ক'খানা পায়ের দুচার খণ্ড পড়ে আছে।

মেয়ে ফড়িংরাই রাক্ষুসী হয়। একটা মেয়ে ফড়িং আর একটা মেয়ে ফড়িং দেখলে ঝগড়া মারামারি বাধিয়ে দেয়। তারপর যেটা কায়দা করে জিতে যায় অপরটাকে বাগিয়ে ধরে কাবু কত্তে পারে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। তা এ মেয়েরা নিজের স্বামী বা বরকেও খেয়ে ফেলে। বিয়ের জন্য বরকে আস্‌তে দেয়, কিছুকাল বরের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটায়, তারপর বরকে ধরে ঘাড় ভেঙ্গে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এক ফরাসী পণ্ডিত পরীক্ষা করে দেখেন যে একটা মেয়ে গঙ্গাফড়িং পনের দিনের মধ্যে পর পর সাত বার বিয়ে কল্লে, পরপর সাতটা বর জুটল, আর একে একে সাতটা বরকেই খেলে। ওমা! এমন রাক্ষুসী বরখাকী মেয়ের কথা তোমরা কখন শুনেছ?



মেয়ে গঙ্গাফড়িং সব সময়েই যে অপর মেয়ে বা পুরুষ গঙ্গাফড়িং খায় তা যখন মেয়ে ফড়িং এর পেটে ডিম হয় আব ডিম পাড়বার সময় হয় তখনই সে এই রাক্ষুসী হয়ে ওঠে। অন্য সময়ে একত্র থাকলেও তাদের অমন প্রবৃত্তি হয় না।

গঙ্গাফড়িংএর ডিমগুলি একটা খোল বা থলের মধ্যে থাকে। এই খোল ঘাসে, গাছের ডালপালায় আটকান দেখতে পাওয়া যায়। এদের ডিম পাড়ার কায়দা বড় চমৎকার। মেয়ে তেলা পোকার পেটের শেষে যেমন দুটা গোঁজের মত অংশ বাহির হয় ইহাদেরও তেমনি হয়। ডিম পাড়বার সময়ে মেয়ে ফড়িং পেট থেকে আটার মত তরল রস বাহির করে। সেই রসটার মধ্যে পেটের আগাটা থাকে। নাড়াচাড়া ঘোঁটা ঘুঁটি কত্তে কত্তে সেই রসটা ফেনাময় হয়ে ফেঁপে উঠে। সেই ফেনার ভিতর পেটের আগা ঢুকিয়ে দিয়ে এক একটা খোপ করে, খোপে ডিম পাড়ে। তারপর বাতাস লাগিয়া সেই ফেনার খোলটা বাতাসার মত শক্ত ও ফোঁপড়া হইয়া যায়। এই খোলের স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাতলা পাত একটার উপর আর একটা টালির মত সাজান থাকে। সেই সব পাতের ফাঁক দিয়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বাহির হয়। নভেম্বর মাসে ডিম পাড়্‌লে সে ডিম মার্চ্চ মাসে ফুটে। গ্রীষ্মকালে জুলাই মাসে ডিম পাড়্‌লে ১৫/২০ দিনের মধ্যেই

ডিম ফুটে। ডিম ফুটেই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা যখন বাহির হয় তখন তাহারা মাকড়সার সূতার মত সূতায় সেই খোল থেকে ঝুল্‌তে থাকে, তারপর গায়ের খোলস বদলাইয়া একটু বড় হইয়া এদিক ওদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন ক্ষুদে বাচ্চাদের কাল পিঁপড়ের মত দেখায়। তারা পিঁপড়ের মত ছ'পায়ে চলে আর খাবার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। কয়েকবার খোলস বদলাইয়া বড় হইলে পর পাখা গজায়। তখন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়, শিকার কাছে এলে ধরে খায়।

গঙ্গাফড়িংদের দেহের গড়নের বিশেষত্ব এই যে, এদের বুকের প্রথম অংশটা অন্য দুই অংশ অপেক্ষা লম্বা হয়। আর প্রথম পা যোড়ার গড়ন শিকার চেপে ধরে আটক করে রাখার উপযোগী। যে সাধারণ গঙ্গাফড়িং এর কথা বলিলাম, যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, সে রকম গঙ্গাফড়িং ছাড়া আরও কয়েক রকমের বিচিত্র গঙ্গাফড়িং আছে। তাদের দেখলে গঙ্গাফড়িং বলে বোধ হয় না। তাদের কারু গলার মত লম্বা বুকের দু ধার থেকে পাৎলা পাতের মত চ্যাটাল অংশ বাহির হয়। কারু পেটের দু ধার থেকে পাতার মত অংশ বাহির হয়। কারু পাগুলি থেকে পাতার মত অংশ বাহির হয়। কারু বুক পেট পা সব থেকেই পাতার মত অংশ বাহির হয়। তার উপর অনেকের ডানা দু যোড়া ও রঙ্গীন হয়। তারা যখন মাথা নীচু করে ঠ্যাং বাধিয়ে গাছে ঝুলতে থাকে, তখন শুকন্‌ পাতা বা রঙ্গীন ফুল বলে ভ্রম হয়।

একবার উড়িষ্যায় ঢেঙ্কানলে আমার বাগানে এই রকম ১নং চিত্র একটা গঙ্গা ফড়িংকে গাছে ঝুলতে দেখেছিলাম। তার রংটা আগা গোড়া মেটে বা কালোচে ছিল, বোধ হচ্ছিল যেন একটা শুক্‌না ছেঁড়া পাতা বাতাসে দুল্‌ছে। ঠিক এই ধরনেরই অপর এক রকম ফড়িং উড়িষ্যায় দেখা যায়, তাদের গায়ের উপর পিঠটা সবুজ গলার চ্যাপটা অংশ তলার দি কে বেগুনি তার ধার গোলাপী মাঝখানে মেটে রঙ্গের ফোঁটা মনে হয় যেন একটা ফুলের পাপ্‌ড়ি, হাত দুখানি বুকের কাছে যোড় করে রেখে মাথা নীচু করে বাতাসে দুল্‌লে ফুল বলে আরও বেশী ভ্রম হয়।

বোর্ণীও, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক রকমের গঙ্গাফড়িং আছে তারা যখন তাদের রঙ্গীন বিচিত্র ডানা যোড়া মেলে মাথা নীচু করে গাছে ঝুলতে থাকে তখন ঠিক ফুল বলে ভ্রম হয়। পোকারা ফুল মনে করে তাদের কাছে যেই আসে অমনি তারা তাদের ধরে খায়। ছবিতে দেখ কেমন সব ফুল ঝুল্‌ছে।

তোমার মেজ দাদামশাই
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশ। পৌষ ১৩২৭। পৃ. ২৭৭-২৮৪

আমাদের শরীরের কথা

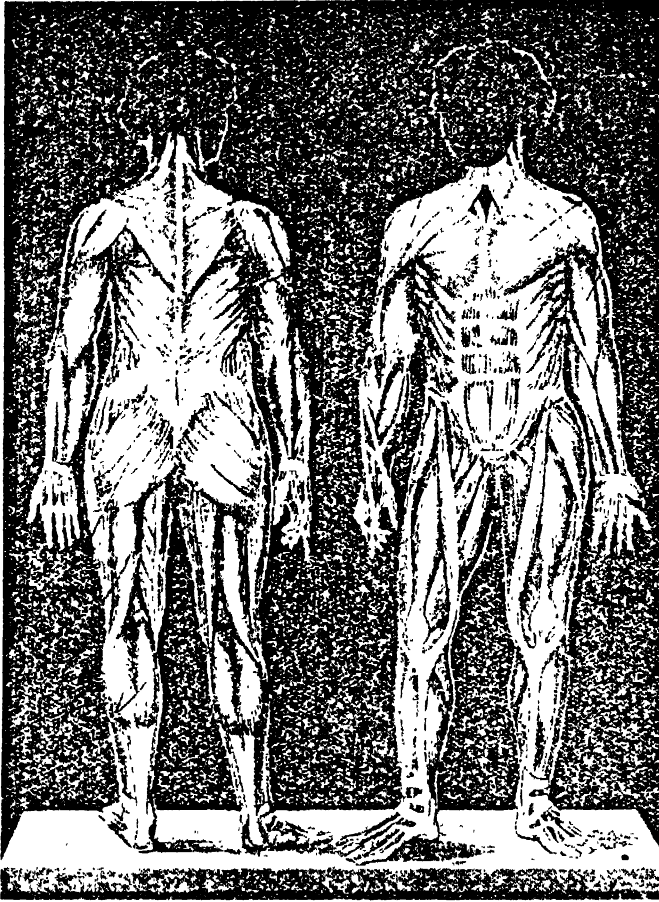
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের কথা, গাছপালা আর জীবজন্তুর কথা এবং কলকারখানার কথা জান্‌তে সকলেরই ইচ্ছা হয়; আর সে সব বিষয়ের কিছু কিছু জানাও সকলের দরকার।

আকাশে গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে কোন্ পথে কি করে ঘোরে; দিন রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, ঘুরে ফিরে কেন হয়; চাঁদ কেন চুড়ির টুক্‌রোর মত থেকে ক্রমে বাড়্‌তে বাড়্‌তে থালার মত হয়, আবার কেন কম্‌তে কম্‌তে সরু বাঁকা রেখার মত হয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। আকাশে মেঘ কোথা থেকে আসে; ঝড় বৃষ্টি কেন হয়; রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি আর জাহাজ কিসের জোরে কেমন করে চলে; গ্রামোফোন মানুষের কথা আর গান কি করে ধরে রাখে আর বের করে দেয়; ফটোগ্রাফে কি করে সব জিনিসের ছবি বা চেহারা উঠে; টেলিফোনে কি করে দূরের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়; কাগজ পেন্‌সিল, দেয়াসলাই, কাপড়, কাঁচ কি দিয়ে কি করে তৈয়ার হয়—এ সব কথা জান্‌তে ইচ্ছা হয় আর জানাও দরকার।

কিন্তু সব চেয়ে জানা দরকার আমাদের শরীরের কথা। শরীর আছে বলে আমরা চলা ফেরা করি, দেখি শুনি, সুখ দুঃখ অনুভব করি, জ্ঞান লাভ করি, বুদ্ধি খাটিয়ে কত রকম জিনিস তৈয়ার করি। শরীর যখন জীবন্ত থাকে তখনই এই সব কাজ হয়, মরে গেলে এসব কোন কার্য্যই ক'র্ত্তে পারে না। কি করে আমাদের শরীর ছোট থেকে বড় হয়, কেন ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়, ডাল ভাত প্রভৃতি যে সব খাবার খাই তা কি করে শরীরের মাংস প্রভৃতিতে পরিণত হয়, কিসে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে, কেনই বা ব্যামোপীড়া হয়, কি করেই বা রোগ সেরে যায়, জীবন কি, মরণ কি—এসব কথার কিছু কিছু সকলেরই জানা দরকার।

এসব কথা জান্‌তে হলে প্রথমে শরীরের গড়ন আর তার যন্ত্রপাতির কথা জানা আবশ্যক। তার পর সে সব যন্ত্রপাতির প্রত্যেকের কি কাজ, আর কি করে তা'রা সেই সব কাজ করে তা জানা আবশ্যক।

শরীরের প্রধান বা আসল হচ্ছে, মাথা থেকে পাছা পর্য্যন্ত অংশটা; অর্থাৎ পেট, বুক, মাথা নিয়ে যে অংশটা সেটাই আসল। এই অংশের উপর দিকে এক যোড়া ডাল বেরিয়েছে, তাকে বলি হাত, তা দিয়ে ধরা ছোঁয়ার কাজ হয়। আর নিচের দিকে আর এক জোড়া ডাল বেরিয়েছে, তাকে বলি পা, সে দুটা শরীরের খুঁটি, তার উপর শরীর বসান, তা দিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি আর চলাফেরা করি। আমরা খাড়া হয়ে থাকি বলে আমাদের শরীরের দুটা খুঁটি বা পা; পশুদের শরীর পাথালি বা শোয়ান থাকে

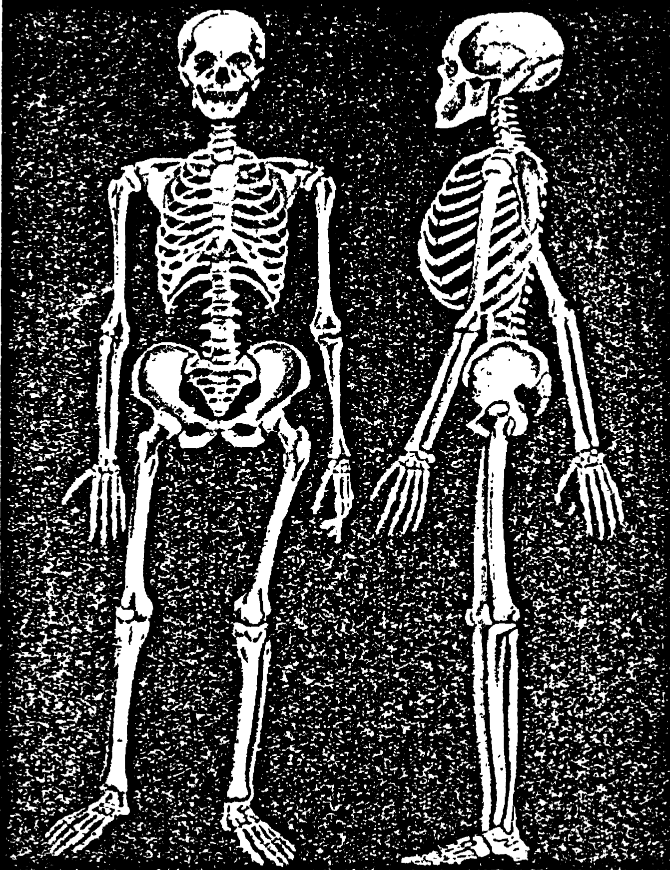


ছাল ছাড়াইয়া ফেলিলে আমাদের শরীরের চেহারা এইরূপ হয়। ১নং ছবি

বলে তাদের শরীরের টেবিলের মত চারিটা খুঁটি বা পা।

তোমরা অনেকেই এমন মানুষকে দেখেছ যে, তার একটা হাত বা একটা পা নাই, অথচ খায় দায়, কাজ করে, বেঁচে আছে। আমি এমন মানুষও দেখেছি যে, ডাক্তারে তার দুটো হাত আর দুটো পা শরীর থেকে কেটে ফেলে দিয়েছে, তার কাটা ঘা সব শুকিয়ে গিয়েছে, সে লোক খাচ্চে দাচ্চে বেঁচে আছে, কাঠের হাত পা লাগিয়ে কোন রকমে কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু পেটটা নাই কিম্বা বুকটা নাই অথবা মাথাটা নাই এমন লোককে কেউ বেঁচে থাকতে দেখে নাই।

শরীরের হাত পা, আঙ্গুল গলা প্রভৃতির যেখানে ইচ্ছা সেখানে এপার ওপার কেটে ফেল, দেখ্‌বে যে প্রথমে চামড়া, তার পর মাংস, তার পর হাড়, তার পর আবার মাংস



শরীরের হাড়ের ফ্রেম বা কঙ্কাল। ২নং ছবি

আর চামড়া কাটা পড়েছে। চামড়া আর মাংসের মাঝখানে আর মাংসের মাঝে মাঝেও চর্ব্বির থাক্ আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। চামড়া আর মাংস কাট্‌লে রক্ত বেরোয়। রক্ত থাকে, সরু সরু নলের মধ্যে। সেই সব নল কাটা পড়ে বলে তা থেকে রক্ত বেরয়। শরীরের মধ্যে সর্ব্ব স্থানেই রক্তের নল আছে, সে সব নল থেকে সরু সরু নলের ডাল

পালা বেরিয়েছে, সে সব সূক্ষ্ম নল থেকে আরও সূক্ষ্মতর, (রোমের চেয়েও সরু) নলের ডাল পালা সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কোন যায়গায় একটা ছুঁচও ফুটোতে পার না যাতে রক্তের কোন নল ফুঁড়ে না যায়। হাতের কুনুই থেকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত হাতের দুপিঠেই দেখ্‌তে পাবে যে নীলরঙ্গের কতকগুলি নল এঁকে বেঁকে গিয়েছে, এগুলির ভিতর দিয়ে রক্ত বুকের দিকে হৃৎপিণ্ডে আস্‌ছে, এদের বলে— শিরা। আবার হাতের কব্জির কাছে বুড়ো আঙ্গুলের নীচে যেখানে ডাক্তারে নাড়ি দেখে, সেখানে যদি টিপেধর ত টের পাবে একটা নলের মধ্যে রক্ত ঢেউ তুল্‌তে তুল্‌তে যাচ্ছে। এ রকম নল, যার ভিতর দিয়ে রক্ত ঢেউ খেল্‌তে খেল্‌তে যায় তাকে বলে— ধমনি। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে ধমনির ভিতর দিয়ে শরীরের সব জায়গায় যায়। শিরা আর ধমনি হৃৎপিণ্ডতে রক্ত আস্‌বার আর তা থেকে বেরিয়ে যাবার নল, এরা কোথায়ও শরীরের উপরভাগে এসে পড়েছে, কোথায়ও শরীরের ভিতরে গভীর মাংসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যে সব যায়গায় ধমনি মাংসের উপরে চামড়ার তলে এসে পড়েছে, সেই সব যায়গায় নাড়ির ধপ্‌ধপানি টের পাই। বুকের উপর যদি হাত দাও বা কাণ দাও ত বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধপ্‌ধপানি টের পাবে বা শুন্‌তে পাবে। হৃৎপিণ্ড থেকে শিরা আর ধমনির বড় নল বেরিয়েছে সেই সব নল থেকে আবার অনেক সরু সরু ডাল পালা বেরিয়ে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে, এদের ভিতরে রক্ত চলাচল করে।



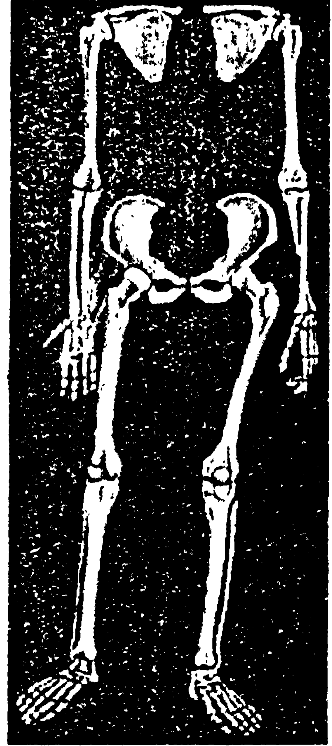
৩নং ছবি

শরীরের উপরদিকে গলার উপরে গোল মাথাটা বসান। মাথার সাম্‌নে দুটো চোখ, আর নাক, আর পাশে দুটো কান আছে। মুখ বিবরের মধ্যে জিভ্ আছে। চোখ্ দেখ্‌বার, কাণ শুনবার, নাক ঘ্রাণ বা গন্ধ নেবার আর জিভ্ আস্বাদন করবার যন্ত্র।

শরীরের প্রথম আস্তরণ বা আবরণ হচ্ছে চামড়া। শরীর থেকে সমস্ত চামড়া বা ছাল ছাড়াইয়া ফেলিলে মাংস বাহির হইয়া পড়ে। মাংস শরীরের অনেক যায়গাতেই গোছা গোছা আকারে থাকে। (১ নং ছবি দেখ।) চামড়া আর মাংসের মাঝে এবং মাংসপেশীর গোছার মাঝে মাঝে চর্ব্বির স্তর দেখা যায়। চামড়া আর মাংসের নীচে যে শক্ত হাড় আছে, তা গা টিপ্‌লেই টের পাই। মাংস সব

তুলে নিলে কেবল শরীরের হাড় কঙ্কাল থাকে।

গলার নীচে বুক আর পেট। বুক আর পেটের মধ্যেই শরীর রক্ষণ আর পোষণের নানা যন্ত্রপাতি আছে। বুকের মাংস আর হাড় কেটে ফেল্লে বুকের গহ্বর বা খোল বেরিয়ে পড়ে, তার মধ্যে থাকে ফুস্‌ফুস্‌ — নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র, আর হৃৎপিণ্ড—শরীরে রক্ত চালাবার যন্ত্র। পেটের মাংস কেটে নিলে পেটের গহ্বর বা খোল বেরিয়ে পড়ে, তার মধ্যে থাকে একটা বড় থলে, তাকে বলে পাকস্থলী বা ভুঁড়ি। খাবার জিনিষ গিলিলে গলার নল দিয়া ঐখানে এসে জড় হয় আর হজম হয়। পাকস্থলী থেকে একটা লম্বা নল বেরিয়েছে সেটা কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে, তাকে বলে অন্ত্র বা নাড়ি। আর পেটের মধ্যে, ডান দিকে থাকে লিভার বা যকৃৎ, বাঁ দিকে থাকে প্লীহা বা পিলে, আর পিছন দিকে পিঠের কাছে দুপাশে থাকে বরবটি বা ৫এর আকারের দুটা পিণ্ড, তাকে ইংরাজিতে বলে কিড়নি। এইখানে প্রস্রাব তৈরী হয়। তারপর সে দুটা থেকে দুটা সরু চোঙ্গ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে মূত্রের থলি বা ব্লাডারে জড় হয়। মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্য্যন্ত একটা নল। তার এক দিক দিয়ে খাবার ঢোকে, মাঝখানে হজম হয়, অপর দিক দিয়ে অসার অংশ মলরূপে বাহির হইয়া যায়। এই নলেরই একস্থান খুব বড় হয়ে মোটা হয়ে পাকস্থলী হয়েছে। এসবের কথা পরে বলিব।



৪নং ছবি

চামড়া, মাংস, চর্ব্বি, অস্থি, স্নায়ু, রক্ত এই সব শরীরের উপাদান বা ধাতু। এই সব দিয়ে আমাদের শরীর তৈয়ারি।

'আমিবা'র কথায় পড়েছ যে নিম্নস্তরের ক্ষুদ্র সামান্য প্রাণীদের দেহ একটা কোষে তৈয়ারি— সেটা কেবল নিউক্লিয়াস্‌যুক্ত এক কণা প্রোটোপ্লাসম্‌। এইরূপ নিম্নতম শ্রেণীর জীব জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এককোষ অবস্থাতেই থাকে। উচ্চশ্রেণীর জীব জন্মকালে এক কোষ পরে বহুকোষের সমষ্টি হয়। পাখীর ডিম একটা কোষ। সেটার নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাসম্‌ একটা কঠিন খোলে ঢাকা। এই কোষে মাংস, হাড়ে

চামড়া বা স্নায়ু নাই। এই একটা কোষই ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে বহুকোষে পরিণত হয়। সেই সব কোষ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হয়ে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র তৈয়ার করে। তাই এক এক দলের কোষের রূপ ও গুণও ভিন্ন হয়। ডিমের একটা কোষ থেকেই পাখীর গায়ের মাংস হাড় প্রভৃতি সব হয়। অস্থি, মাংস চর্ম্ম প্রভৃতি শরীরের উপাদান বা ধাতু সম-জাতীয় কোষের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ মাংসকোষের সমষ্টি-মাংস, চর্ম্মকোষের সমষ্টি-চর্ম্ম, অস্থিকোষের সমষ্টি-অস্থি। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য এই সব ভিন্ন ভিন্ন কোষের দল বা সমষ্টি প্রথমতঃ একটা কোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। একদল যে কাজ করে অপর দল তাহা পারে না। একের কাজের ফল অপরে ভোগ করে। সমস্ত শরীরের জন্য সকল দল মিলে মিশে কাজ করে। শরীরের একদলের কোষ, বা একটা যন্ত্র (যা বিশেষ কোন কাজ করবার জন্য কতকগুলি কোষের সমষ্টি মাত্র) যদি বিকেল হয়ে পড়ে, তাদের কাজ কত্তে না পারে, তবে অপর দলের কোষের বা অপর যন্ত্রের ক্ষতি হয়, সমস্ত শরীর রুগ্ন ও মৃত হয়। শরীরটা যেন একটা সমাজ—আমাদের সমাজে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, চাষী প্রভৃতি দল আছে। তারা সবাই মানুষ, এক এক কাজের জন্য এক এক দল মানুষ। চাষী যদি চাষ না করে, কেউ খেতে পায় না। তাঁতি যদি কাপড় না বুনে কেউ কাপড় পরতে পায় না। কামার আর ছুতার যদি যন্ত্রপাতি তৈয়ার না করে সকলের কাজ বন্ধ হয়।

অস্থি, মাংস, স্নায়ু চর্ম্ম প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন কোষের সমষ্টি মাত্র এইটুকু জেনে রাখ, এদের কথা পরে বলব।

হাড় দিয়াই আমাদের শরীরের কাঠাম বা 'ফ্রেম' গড়া। হাড়ের ফ্রেম থাকাতেই শরীরটাকে শক্ত লম্বা বা খাড়া করে রেখেছে, কাদার তালের মত নরম পিণ্ড হতে দেয় না, আর সামান্য চাপে শরীরটা কাদার তালের মত চেপ্‌টে যায় না, তার আকৃতি বদলায় না। এই হাড়ের ফ্রেম বা কঙ্কালটা দেখ্‌তে কি রকম (২ নং ছবিতে দেখ।) এই কঙ্কালের কথা আগে কিছু জানা দরকার। এর কথা আগামী বারে বল্‌ব।

২

শরীরের হাড়ের কঠিন ফ্রেমটাকে 'অস্থিপঞ্জর' বা 'কঙ্কাল' বলে। সেটা অনেকগুলি বড় আর ছোট, লম্বা আর চ্যাপ্টা, মোটা আর সরু ভিন্ন ভিন্ন হাড়ের খণ্ড একত্র সাজিয়ে তৈয়ারি হয়েছে। দুখানা হাড়ের সংযোগ স্থানকে 'সন্ধিস্থান' বা 'কব্জা' বলে। অধিকাংশ স্থানেই যোডগুলি শক্ত রকমে আঁটা নয়। হাড়গুলি এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে লাগান যে ফ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ঘোরান ফিরান বা মোড়া যায়।

হাড় কি পদার্থে তৈয়ারি? পাখীর পায়ের একটা লম্বা হাড় যদি একটা কাঁচের গেলাসে শির্কা বা ভিনিগারে, অথবা জলমেশান পাৎলা মিউরিয়াটিক এসিডে, দিন


৫নং ছবি

কয়েক ডুবিয়ে রাখ ত দেখবে যে সে হাড়ের আকৃতিটা পূর্ব্বের মতই আছে, কিন্তু ওজনে হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে আর হাড়খানি নরম হয়েছে, সেটাকে রবারের মত গেরো দিতেও পার। শক্ত হাড় এমন নরম হল কেন? হাড়েতে এমন কোনো জিনিস ছিল যা সির্কা বা এসিডে গলে গিয়ে তাতে মিশে গিয়েছে, অপর যে অংশটা এসিডে গলে বেরিয়ে যায় নাই, সেটাই আছে, আর সেটাই রবারের মত নরম হয়েছে, তাকে ধনুকের মত বাঁকান যায়, আর ছেড়ে দিলেই সোজা হয়। যে জিনিস তার ভিতর থেকে গলে বেরিয়ে গিয়েছে সেটা চুণ— কার্ব্বনিক এসিড আর ফস্‌ফরাস্‌ মেশান চূণ। হাড় থেকে চুণ আর ফস্‌ফরাস্‌ বের করা যায়। এই পদার্থ প্রাণীর দেহ ছাড়া অন্যত্র পৃথিবীতে বা ভূমিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য এই জিনিসকে পার্থিব, ভূমিজ বা খনিজ পদার্থ বলা হয়। অপর যে নরম জিনিসটা রইল, সেটা প্রাণী বা জন্তুর শরীর ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না, তাই সেটাকে প্রাণিজ, জান্তব বা শরীরক পদার্থ বলা হয়। কাঁচা হাড় খণ্ড খণ্ড করে যদি অনেকক্ষণ জলে সিদ্ধ করা যায় তবে সে জলটা ক্রমে ঘন সুরুয়ার মত হয়। ঘন সুরুয়া ঠাণ্ডা করিলে জমিয়া থকথকে হয়ে তারপর শুকাইলে শক্ত কাঠের মত হয়। এটাকে 'শিরিষ' আঠা বলে। ইংরাজিতে বলে gelatine 'জিলাটিন'। শিরিষ বা জিলাটিন পদার্থ ঠাণ্ডা জলে গলে না। গরম জলে গলে যায়। অল্প শিরিষ অনেকখানি জলে গুলে গেলেও সে শিরিষের ঝোল ঠাণ্ডা হলে সমস্ত জলশুদ্ধ চাপ বেঁধে যায় আর থক্‌থকে হয়, গরম করলে আবার জলের মত তরল হয়।

সেই লম্বা হাড়খানাকে যদি আগুনে পোড়াও প্রথমে হাড়টা কাল হবে তারপর এই জান্তব পদার্থ বা শিরিষ পুড়িয়া সমস্তটা হাড় হতে বার হয়ে যাবে? তখন সেই হাড়ের রং সাদা হবে আর আকৃতিটা আগের মতই থাক্‌বে, কিন্তু সেটাকে টিপলেই বা চাপ দিলেই গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে। এ জিনিসটা শুধুই চূণ হাড়। পোড়ালে চূণ হয়। হাড়ের উপাদান শিরিষ আর চূণ। আগুনে পুড়াইলে বা জলে সিদ্ধ করিলে হাড়ের শিরিষ অংশ পুড়িয়া বা গিলিয়া যায়, চুণটা থাকে। এসিডে ভিজাইয়া রাখিলে হাড়ের চূণটা গলিয়া যায় শিরিষটা থাকে— কিন্তু আকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। চূণ থাকার জন্য হাড় এত শক্ত হয়।

আমাদের শরীরে এমন হাড়ও আছে যে তাতে শিরিষের ভাগই বেশী, চুণের ভাগ খুব কম এমন কী নাই বলিলেই হয়। সে সব হাড় খুব নরম ও স্থিতিস্থাপক, সহজে

বাঁকান চোরান যায়। যেমন কানের পাতা। এই রকম হাড়কে ইংরাজিতে cartilage কার্টিলেজ্ বলে, বাংলায় বলে উপাস্থি বা তরুণাস্থি। খুব শৈশবকালে সব হাড়েই চূণের ভাগ খুব কম থাকে তাই হাড়গুলোও নরম থাকে, আঘাত লাগিলে বা বাঁকিলে ভাঙ্গে না; পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড়ে চূণ জমতে থাকে আর হাড় শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। শিশুরা কত পড়ে যায় কত আছাড় খায় তাতে তাদের হাড় ভাঙ্গে না, কিন্তু বুড়ো লোক যদি জোরে পড়ে যায় কিম্বা তাদের হাড়ে যদি জোরে চাড় লাগে ত তাদের হাড় ভেঙ্গে যায়।

হাত বা পায়ের একখানা গোল লম্বা হাড় নিয়ে যদি তার মাঝখানটা ভেঙ্গে বা কেটে দুখণ্ড করে ফেল, ত দেখবে যে সেটা বাঁশের পাবের মত ফাঁপা। সে হাড়খানা লম্বালম্বি চিরে ফেল্‌লে দেখবে যে মাঝের সমস্ত অংশ চোঙ্গের মত ফাঁপা হলেও তার দুই মুড়োর অংশ নিরেট। ফাঁপা চোঙ্গটা এক রকম লাল্‌চে পদার্থে পূর্ণ থাকে। তাকে বলে অস্থি মজ্জা। লম্বা হাড়ের দুই মুড়ো নিরেট হলেও ঠিক নিরেট নয়। তাতে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। সে অংশ স্পঞ্জ বা বাতাসার মত ফোঁপ্‌রা বা সছিদ্র। এই সব ছিদ্রের ভিতরেও মজ্জা থাকে। এই মজ্জা থেকেই হাড় তৈয়ার হয়। হাড় ভেঙ্গে গেলে মজ্জা থেকে হাড় তৈয়ার হয়ে সেই ভাঙ্গা যায়গা যুড়ে যায়। আমাদের রক্তের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাক্‌তির মত লাল কণিকা আছে, সে সবও হাড়ের মজ্জা থেকে তৈয়ার হয়।

লম্বা হাড়ের দুই মুড়ার অংশ সছিদ্র বা ফোঁপ্‌রা আর নরম কিন্তু মাঝের অংশ যেটা চোঙ্গের চারিধারে থাকে সেটা নিরেট আর ভারি শক্ত। অন্যান্য যে সব হাড় ফাঁপা নয় সেগুলিও সছিদ্র বা ফোঁপ্‌রা তার তাদের সেই সব ছিদ্রে মজ্জা পোরা থাকে।

কঙ্কাল বা ফ্রেমটাকে ভাল করে দেখ। মাথার তলা থেকে পাছা পর্য্যন্ত পিঠের দিকে একটা লম্বা হাড় নেমেছে, তাকে বলে পৃষ্ঠ বংশ বা মেরুদণ্ড। কঙ্কালটাকে তিনটা প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম মাথা, তারপর বুকের বা পাঁজরার হাড়যুক্ত মেরুদণ্ড, তারপর তৃতীয় অংশ শাখা, বা ডালপালার মত হাত পা। মেরুদণ্ডের উপর আর নীচের দিকের দু পাশ থেকে ডাল বেরিয়েছে। উপর দিকের ডাল যোড়া হচ্চে হাত আর নীচের দিকের ডাল যোড়া হচ্চে পা। হাত পা বাদে মাথা থেকে পাছা পর্য্যন্ত যে অংশ সেইটাই কঙ্কালের প্রধান অংশ। মেরুদণ্ডের সঙ্গে কতকগুলি হাড় লাগিয়ে দুটা গহ্বর বা খোল তৈয়ার হয়েছে। কতকগুলি সরু চ্যাপ্টা হাড়ের শিক্ মেরুদণ্ডের দু পাশ থেকে ধনুকের মত বেঁধে বুকের দিকে এসে বুকের সাম্‌নে একটা হাড়ের সঙ্গে মিশে একটা খাঁচার মত হয়ে প্রথম খোলটা গড়ে। মেরুদণ্ডের নীচের দিকে দু পাশে দুটা চৌড়া, চ্যাপ্টা খোল্-পারা বাঁকা হাড় 'কটিফলক' মিশে তলপেট বা বস্তিকোটর তৈয়ার হয়েছে। ৩নং ছবিতে দেখ মাথা আর তার সঙ্গে বুকের পাঁজরা আর কটিফলকযুক্ত মেরুদণ্ড। ৪নং ছবিতে দেখ, হাত আর পা এই দু যোড়া ডাল পৃথক্ করে সরিয়ে দেখান হয়েছে।

কঙ্কালের প্রধান অংশটা থেকে যদি পাঁজরার হাড়গুলো আর পাছার দুপাশের কটিফলক দুটো, যার সঙ্গে পা দুটো লাগান থাকে যে দুটো, সরিয়ে ফেলা যায় তবে থাকে মাথাযুক্ত মেরুদণ্ড। মাথাযুক্ত মেরুদণ্ড শরীরের আসল অংশ।

মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়াটা যেটা ফ্রেমের মাঝের খুঁটির মত সেটা, একখানি লম্বা গোটা হাড় নয়। অনেকগুলি ছোট ছোট হাড়ের পুরু চাক্‌তি একটার উপর আর একটা বসিয়ে মেরুদণ্ড তৈয়ার হয়েছে। অনেক ছোট ছোট আল্‌গা হাড়ের খণ্ড একত্র বসান আছে বলে আমরা মেরুদণ্ডকে (অর্থাৎ গলা পিঠ কোমর) আশে পাশে সাম্‌নে পিছনে ধনুকের মত বাঁকাতে পারি।

মেরুদণ্ডের এক একখানি ছোট হাড়কে 'কসেরুকা' বলে। কসেরুকার আকৃতি সাম্‌নের অর্থাৎ বুকের দিকে পুরু নিরেট চাক্‌তির মত অংশ, আর তার পিছনে পিঠের দিকে আংটির মত গোল অংশ। সেই আংটিটার দুপাশ দিয়ে দুটো, আর মাঝখান থেকে পিঠের দিকে একটা, এই তিনটা গোঁজ বাহির হয়। পিঠের দিকে দাঁড়ার উপর হাত দিয়ে টিপলে পিঠের দিকের গোঁজগুলি টের পাওয়া যায়। কসেরুকাগুলি একের উপর আর একখানি সাজালে প্রত্যেকের আংটির ছিদ্র মিলে একটা বড় লম্বা চোঙ্গের মত হয়।

বিলের সূতার কাঠিম ২০। ২৫ টা নিয়ে একটার উপর আর একটা দাঁড় করিয়ে তাদের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দড়ি চালিয়ে সবগুলিকে যদি একত্র গাঁথ, ত একটা লম্বা ডাণ্ডার মত হবে, অথচ সেটাকে বেশ বাঁকান চোরান যাবে। মেরুদণ্ডও ঐ ধরণে তৈয়ারি। মেরুদণ্ডের চোঙ্গের ভিতর দিয়ে একটা স্নায়ুরজ্জু মাথা থেকে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত নেমেছে। মেরুদণ্ডের নলের মধ্যের দড়ির মত স্নায়ুকে, মেরু-মজ্জা বলে।

মেরুদণ্ডের উপরে মুণ্ডটা বসান। মুণ্ডটা একটা ফাঁপা শক্ত খোল। হাঁড়িভাঙ্গা খাপরার মত খানকয়েক চওড়া চ্যাপ্‌টা বাঁকা হাড় যুড়ে মুণ্ডের খোল বা 'করোটি' তৈয়ার হয়েছে। সে সব হাড়ের পাশগুলি করাতের দাঁতের মত খাঁজ কাটা। হাড়গুলি সেই সব খাঁজে পড়ে এমন শক্ত হয়ে যুড়ে গিয়েছে, যে সে সব যোড়ের নড়চড় হয় না। মাথায় জোরে লাঠির বাড়ি মারিলে হাড় ভেঙ্গে যায় তবুও যোড় খোলে না। মুণ্ডের হাড়ের যোড়ের দাগগুলি কতকটা হিজিবিজি লেখার মত (৪নং ক চিত্র) তাই আমাদের দেশের লোকে মনে করে ওগুলি বিধাতার লিখন। শিশু জন্মাবার পর ছয় দিনের দিন রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ আসিয়া শিশুর কপালে লিখিয়া যান। যার কপালে যেমন লেখা থাকে তার ভাগ্যে তেমনি ফলে।

মুণ্ডের সাম্‌নের দিকে চোখের কোটর, নাকের কোটর, নাকের ছিদ্র আর দুপাশে কানের ছিদ্র আছে। মুণ্ডের সাম্‌নের দিকের নীচের অংশটা উপরের চোয়ালের হাড়, তাতে উপরের দাঁতের পাতি বা সারি বসান আছে। মুণ্ডের এই সমস্তটা যেন একখানি

হাড় দিয়ে গড়া তার কোন অংশই নড়ে চড়ে না। মুণ্ডের সাম্‌নে উপরের চোয়ালের ঠিক নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একখানি হাড় বসান আছে, সেটা নীচের চোয়াল। তার উপর দিকে নীচের চোয়ালের দাঁতের সারি বসান আছে। মাথার এই হাড়খানিকেই কেবল নাড়াচাড়া যায়। নীচের চোয়ালটা উপর নীচে খেলে তাই আমরা 'হাঁ' করিতে ও মুখবন্ধ করিতে পারি সেটা ডাইনে, বাঁয়েও একটু নাড়া যায়। তাইতে খাবার জিনিসকে দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া পিষিয়া ফেলিবার সুবিধা হয়।

উপরের চোয়াল আর নীচের চোয়াল দিয়ে মুখবিবর তৈয়ার হয়েছে। মুখবিবরের শেষদিকে গলার কণ্ঠনালী, যার ভিতর দিয়ে ফুস্‌ফুসে নিশ্বাস যায়, সেটা এসে মিশেছে। নাকের ছিদ্রের শেষ মুড়াও মুণ্ডের নীচে কণ্ঠনালীর কাছে বেরিয়েছে। তাই নাক বন্ধ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে পারি আর মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ত নিশ্বাস নিয়েই থাকি। গলা নালী, যার ভিতর দিয়ে খাবার পেটে যায়, সেটাও মুখ বিবরের শেষদিকে এসে মিশেছে।

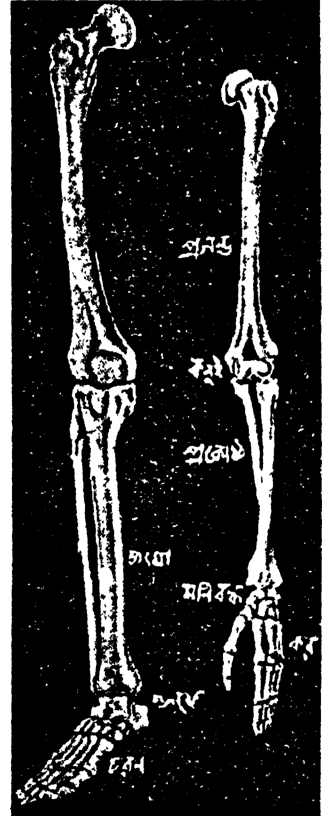
মুণ্ডের খোলের ভিতর থাকে মগজ বা মস্তিষ্ক। মুণ্ডের খোলের তলার দিকে একটা গোল ছিদ্র আছে। মেরুদণ্ডের উপর মুণ্ডটা যখন বসান থাকে তখন মুণ্ডের তলার ছিদ্রটা মেরুদণ্ডের ছিদ্রের উপর পড়ে। সেই পথে সাদা দড়ির মত মেরুমজ্জাটা মস্তিষ্কের তলায় মিশেছে। অথবা মস্তিষ্কটা নীচের দিকে ক্রমে সরু হয়ে মুণ্ডের সেই ছিদ্রপথে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের ছিদ্র বা চোঙ্গের মধ্যদিয়ে বরাবর শেষ পর্য্যন্ত নেমেছে। মুণ্ডের খোলের হাড় আর মেরুদণ্ডের হাড় সব সরিয়ে নিলে মস্তিষ্ক আর মেরুমজ্জাকে, ৫নং চিত্রের মত দেখায়।

মস্তিষ্ক তলার অংশ থেকে আর লম্বা মেরুমজ্জা থেকে সূতার মত স্নায়ুর ডাল পালা বেরিয়ে শরীরের সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কই দেখা শুনার, যন্ত্রণা বোধ করার, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সব খবর পৌঁছে তা টের পাবার বা অনুভব করবার আর ইচ্ছামত শরীরেব নানা অংশ নাড়াচাড়া করবার প্রধান যন্ত্র। এর কথা পরে ভাল করে বল্‌ব।

মুণ্ডের তলা থেকে বুকের আগা পর্য্যন্ত অংশকে গলা বলে। মেরুদণ্ডের গলার অংশকে গলা বলে। মেরুদণ্ডের গলার অংশতে মোটে সাতখানি কসেরুকা হাড় আছে। প্রায় সকল স্তন্যপায়ী জন্তুর গলাতে সাতখানি করিয়া হাড থাকে। হাতীর গলা কত ছোট। তাতেও সাতখানি হাড়, উট আর জিরাফের গলা কত লম্বা, তাতেও সাতখানি করে হাড়— তবে সে হাড়গুলি লম্বা লম্বা।

আমাদের গলার প্রথম কসেরুকা হাড়ের উপর দিকে তার ছিদ্রের দুপাশে দুটা ছোট্ট রেকাবের মত খোল-পারা মসৃণ অংশ আছে। আবার মুণ্ডের তলায় মুণ্ডের ছিদ্রের দুপাশে দুটা ঈষৎ উঁচু ছোট হাড় বেরিয়েছে। সেই উঁচু হাড় দুটো প্রথম কসেরুকার

সেই দুই রেকাবের মত অংশের উপর বসান। তাইতে মুণ্ডটা সাম্‌নে পিছনে হেলে বা দোলে। দ্বিতীয় কসেরুকাটার পিছন ভাগে উপর দিকে একটা ছোট গোঁজ বেরিয়েছে। প্রথম কসেরুকাটার পিছন দিকে একটা ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রটা সেই গোঁজের উপর বসান। মুণ্ডটা প্রথম কসেরুকা সমেৎ দ্বিতীয় কসেরুকার গোঁজের উপর ঘোরে তাইতে আমরা মাথা ডাইনে বাঁয়ে অনেকখানি ঘোরাতে পারি।



৬নং চিত্র

গলার নীচে পিঠের অংশ। পিঠের অংশে মেরুদণ্ডে বারখানি কসেরুকা হাড় থাকে। এই বারটা কসেরুকার প্রত্যেকটার দুপাশ থেকে দুটো ধনুকের মত বাঁকা সরু হাড় বেরিয়ে বুকের দিকে এসেছে। এই বার জোড়া বাঁকা হাড়কে বলে পাঁজরার হাড়। তাই দিয়ে বুকের হাড় তৈয়ার হয়েছে। প্রথমত সাত যোড়া পাঁজরার হাড় বুকের সাম্‌নে একটা লম্বা হাড়ে মিশেছে। এ হাড়টা নরম হাড়। একে বলে বুকের হাড় বা বক্ষাস্থি। তার নীচের তিনজোড়া পাঁজরার হাড় সপ্তম পাঁজরার হাড়ের সঙ্গে বুকের দিকে মিশে বুকের হাড়ের সঙ্গে লেগেছে। শেষ দুযোড়া পাঁজরার হাড় আল্‌গা আছে, বুকের হাড় লাগে নাই।

পিঠের পর কোমর বা কটিদেশ। তাতে পাঁচখানি কসেরুকা, সেগুলোর সঙ্গে অন্য কোন হাড় লাগান নাই। তারপর পাঁচখানি কসেরুকা যুড়ে মিশে গিয়ে একখানি গোটা চ্যাটাল তিনকোণা হাড় তৈয়ার হয়েছে। এইটা শির্‌দাঁড়ায় পাছার হাড়, তাকে বলে 'ত্রিক বা ত্রিকাস্থি'। এই হাড়ের দু পাশ দুটা বড় চ্যাপ্টা হাড় লাগা থাকে তাকে বলে 'কটিফলকাস্থি', সে দুটার সঙ্গে পা লাগা থাকে। ত্রিকাস্থির তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারখানি হাড় যুড়ে পাখীর ঠোঁটের মত একটা ছোট গোঁজ দেখা যায়। এটা লেজ। অন্যান্য জন্তুদের অনেক কসেরুকা একত্র হয়ে লম্বা লেজ তৈয়ার হয়। আমাদের তেমন লেজ নাই, তবে লেজের চিহ্ন আছে।

শরীরের ডাল পালা বা হাত পা'র কথা আগামী বারে বলব।

৩

হাত আর পায়ের গড়ন একই রকম (৬নং চিত্র দেখ)। সমস্ত হাতে যে কয়খানি খণ্ড বা অংশ আছে, সমস্ত পায়েও তাই আছে। কাঁধ থেকে কনুই পর্য্যন্ত হাতের প্রথম অংশকে ''উপর-হাত'' বা 'বাহু' বলে, শুদ্ধ কথায় বলে 'প্রগণ্ড'। তাতে একখানি লম্বা হাড়। কটির তলা থেকে জানু বা হাঁটু পর্য্যন্ত পায়েব প্রথম অংশকে 'উপর-পা' বা 'ঊরু' বলে। তাতেও একখানি লম্বা হাড়। কনুই থেকে হাতের কব্জি বা 'মণি-বন্ধ' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অংশকে 'তল-হাত', বা ''পুরোবাহু'' বলে, শুদ্ধ ভাষায় বলে ''প্রকোষ্ঠ''। তাতে দুখানি লম্বা হাড়। আবার হাঁটু থেকে পায়ের কব্জি বা 'গুল্‌ফ' পর্য্যন্ত পায়ের দ্বিতীয় অংশকে 'তল-পা' বা 'জংঘা' বলে। তাতেও দুটা লম্বা হাড়, একটা মোটা, অপরটা খুব সরু। হাতের কব্জি, করসন্ধি বা 'মণি-বন্ধ', ছোট ছোট আটখানি হাড় দিয়ে তৈয়ার হয়েছে। পায়ের কব্জি, চরণসিদ্ধ বা 'গুল্‌ফ' সাতখানি হাড় দিয়ে হয়েছে। হাতের কব্জির পরের অংশটাকে বলে ''কর''। পায়ের কব্জির পরের অংশটাকে বলে ''চবণ''। করে পাঁচটা 'আঙ্গুল'। করের চ্যাটাল অংশ যেটার সমস্ত মাংস দিয়ে ঢাকা, সেটাকে বলে 'করতল'বা হাতের পাতা। চরণের চ্যাটাল অংশ যেটা মাংস দিয়ে ঢাকা থাকে, তাকে বলে 'চরণতল' বা পায়ের পাতা। চরণেও পাঁচটা আঙ্গুল।

পিঠের দিকে উপরে দুপাশে, কাঁধে, দুখানিতিনকোণা বড় চ্যাটাল হাড় আছে তাকে বলে'স্কন্ধফলক' বা 'পৃষ্ঠফলক'। সে হাড় দুখানা মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে লাগান নয়। পিঠের দিকে মাংস ঢাকা পাঞ্জরার উপর আল্‌গা বসান থাকে। পৃষ্ঠফলকের উপরে বাহিরের দিকের কোনে, অর্থাৎ কাঁধের কোনে, একটা গোল বাটির মত গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তের উপর ধারে পৃষ্ঠফলক হ'তে খানিকটা হাড় উঁচু হ'য়ে বাহির দিকে বেঁকে পড়েছে। বুকের সাম্‌নের নরম হাড়ের অর্থাৎ বক্ষাস্থির, উপর দিক থেকে দুপাশে দুটা সরু লম্বা হাড়, এড়ো ভাবে বেরিয়ে, দুই পৃষ্ঠাস্থির কাঁধের কোনের সেই উঁচু অংশে মিশে, তাকে ঠেলে রাখে। গলার তলায় বুকে প্রথমেই এই এড়ো সরু হাড়টাকে, হাঁসুলির মত রয়েছে, টিপ্‌লে টের পাওয়া যায়। এই হাড়কে বলে 'কণ্ঠাস্থি'। কণ্ঠাস্থিতে পৃষ্ঠফলক লাগান থাকে। পিঠের দুধারের দুখানি পৃষ্ঠফলকের সঙ্গে হাত দুখানি লাগান থাকে। বাহুতে একখানি লম্বা হাড়, তার দুই মুড়া বেশ মোটা। উপরদিকের মুড়োটা গোল। সেই গোল অংশটা স্কন্ধফলকে গর্ত্তের মধ্যে ঢোকান থাকে। গর্ত্তের পাশ থেকে পৃষ্ঠফলকের একটা অংশ সরু লম্বা গোঁজের মত বেঁকে এসেছে। সেই গোঁজটা আর কাঁধের উপরের গোঁজটা, যাতে কণ্ঠাস্থি লাগা থাকে. এই দুটা বাহুর হাড়ের গোল মাথাটাকে ধরে থাকে। বাহুর হাড়ের গোল মাথা বাটীর মত একটা গর্ত্তে বসান বলে বাহুকে আমরা উপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে. চারিদিকে ঘুরাতে ফেরাতে পারি। উরুতের একখানি লম্বা হাড়। আমাদের শরীবের এই হাড়খানাই সব চেয়ে লম্বা। তার উপরদিকের

মুড়োটা মোটা আর গোল। হাতের হাড় যেমন একটা চ্যাপ্টা চৌড়া হাড়ের ফালার সঙ্গে লাগা, পায়ের হাড়ও সেইরকম একটা চ্যাপ্টা চৌড়া হাড়ের ফালার সঙ্গে লাগা। এই হাড়টা হচ্ছে কোমরের নীচে পাশের কটিফলক। পৃষ্ঠফলক দুটা আল্গা থাকে, কটিফলক দুটা নীচের দিকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে মজবুত করে লাগা থাকে। কটিফলকের বাইরের নীচের কোনে একটা বাটীর মত গর্ত্ত থাকে, সেই গর্ত্তে উরুর হাড়ের গোল মাথাটা শক্ত করে বসান থাকে। কটিফলক মেরুদণ্ডের সঙ্গে আঁটা থাকাতে পায়ে শরীরের ভর বইতে পারে। কত লাফ ঝাঁপ করি, তাতে উরুসন্ধি বা কুচকির কব্জার কাছে হাড় নড়ে বা সরে যায় না। হাত কেবল নাড়া চাড়া আর ধরবার জন্য তৈয়ারি, ভার বইবার জন্য নয়। তাই স্কন্ধ-সন্ধি বা কক্ষ-সন্ধি অত মজবুত নয়। আমরা পড়ে যাবার সময়ে শরীর বাঁচাতে গিয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে পড়ি, তাতে অনেক সময়ে পৃষ্ঠফলকের গর্ত্ত হতে বাহুর হাড়ের মূলটা সরে যায়। ইংরাজীতে বলে (dislocation) ডিস্‌লোকেসন্ হয়। আবার অনেক সময়ে কণ্ঠাস্থিও ভেঙ্গে যায় বা ফ্রাক্‌চার (fracture) হয়। আজকাল ফুট্‌বল খেলতে গিয়ে, কাঁধ পেতে পড়ে গিয়ে অনেকেরই কণ্ঠাস্থি ভেঙ্গে যায় অথবা বাহুর হাড় পৃষ্ঠফলকের গর্ত্ত থেকে সরে যায়। পায়ের ওখানে সহজে হাড় সরে না বা ডিস্‌লোকেসন্ হয় না। উরুর হাড়ের গোল মুণ্ডটা কটিফলকের বাটীর মত গর্ত্তে বসান থাকায় পাটা সাম্‌নে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে পারি। তবে হাতটা যতদূর ঘোরাতে ফেরাতে পারি, পাকে ততটা পারি না।

কনুই থেকে হাতের কব্জি বা মণিবন্ধ পর্য্যন্ত অংশকে তল-হাত বা প্রকোষ্ঠ বলে। তল-হাতে দুখানি লম্বা হাড় আছে। বাহুর হাড়ের নীচের মোটা, মুণ্ডটা গোল কিন্তু দুপাশে চাপা। সেই মুণ্ডের সঙ্গে তল-হাতের দুখানি হাড়ের মাথা লেগে কব্জা তৈয়ার হয়েছে। একখানি হাড় 'কড়ে' আঙ্গুলের দিকে মণিবদ্ধ পর্য্যন্ত নেমেছে। তাকে বলে প্রকোষ্ঠাস্থি বা কনুই এর হাড়। এই হাড়টা দিয়ে কনুই এর কব্জা হয়েছে। এর উপরদিকের মাথা থেকে একটা চ্যাপ্টা বাঁকা অংশ বেরিয়েছে। এই অংশটাই কনুইতে শক্ত গোঁজের মত টের পাই। হাত যখন সোজা করি তখন এই বাঁকা বাড়্‌তি অংশটা বাহুর হাড়ের মুণ্ডের পিঠের খোঁজে আট্‌কে যায়। তাই হাতখানিকে ভিতর দিকে ভাঁজ করে কাঁধ ছুঁতে পারি, কিন্তু পিছন বা উল্টা দিকে একটুও বাঁকাতে বা ভাঁজ কর্ত্তে পারি না।

তল-হাতের অপর একখানি হাড় 'বুড়ো' আঙ্গুলের দিকে মণিবন্ধে মিশেছে। তাকে বলে 'অনু-প্রকোষ্ঠাস্থি'। হাতের তেলো উপর দিকে করে অর্থাৎ চিৎকরে, কনুই থেকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত হাতখানি যদি টেবিলের উপর রাখ, তবে তার ভিতরকার লম্বা হাড় দুখানি ঠিক পাশাপাশি থাকে। হাতের তেলো সাম্‌নের দিকে করে হাত ঝুলিয়ে রাখ্‌লেও তাই হয়। হাত বাড়িয়ে কিছু নেবার জন্য হাত পাত্‌লেও তাই হয়। তখন বুড়া আঙ্গুলের দিকের হাড় বাহির দিকে আর কড়ে আঙ্গুলের দিকের হাড় ভিতর দিকে, থাক্‌বে। তারপর টেবিলের উপর যদি হাতের তেলোটা উপুড় করে দাও, (অথবা

ঝুলান অবস্থায় পিছন দিক করে দাও, অথবা হাত বাড়িয়ে কাউকে কিছু দিতে বা আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে যাও), তবে দেখ্‌বে যে বুড়ো আঙ্গুলের দিকের লম্বা হাড়খানি ঘুরে, কড়ে আঙ্গুলের দিকের লম্বা হাড়ের মাঝখানের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে, ভিতর দিকে, অর্থাৎ তোমার গায়ের দিকে, এসে পড়েছে (৩নং চিত্র দেখ)। তল-হাতের এই হাড় খানি অপর হাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে আস্‌তে পারে বলে আমরা হাতের তেলো চিৎ আর উপুড় কর্ত্তে পারি।

হাতে যেমন কনুই,পায়ে তেমনি হাঁটুর সন্ধি। হাঁটু বা জানু সন্ধি থেকে চরণ সন্ধি বা গুল্‌ফ পর্য্যন্ত অংশকে তল-পা বা জংঘা বলে। জংঘায় দুখানি লম্বা হাড়, একখানি মোটা আর একখানি সরু। সাম্‌নের দিকে জংঘায় চামড়া ঢাকা যে হাড়খানি হাতে ঠেকে, সেইটা এই মোটা হাড়। একে বলে 'জংঘাস্থি'। এই হাড়খানির মাথা উরুর হাড়ের শেষ দিকে লেগে, হাঁটু বা জানু সন্ধি হয়েছে। হাঁটুর কব্জা ও এরকমে গুড়া যে, পা ভিতর দিকে মুড়তে পারি আর সোজা কর্ত্তে পারি, বাহির বা উল্টা দিকে একটুও মুড়তে পারি না। জানুসন্ধির সাম্‌নে বা বাহির দিকে একটা ছোট চাক্‌তির মত হাড় আছে। তাকে বলে 'জানুফলক'। এটা কোন হাড়ের সঙ্গে লাগা নয়। উরু থেকে যে মোটা মাংসপেশী দড়ির মত হয়ে জানুর হাড়ে মিশেছে তারই মধ্যে এটা বসান। কনুইতে ওরকম হাড় নাই। জংঘার সরু লম্বা হাড়খানিকে 'অনু-জংঘাস্থি' বলে, সেটা জংঘার মোটা হাড়ের বাইরের পাশে লম্বালম্বি থাকে। তার দুই মুড়ো ঐ মোট হাড়ের সঙ্গে আঁটা থাকে। হাঁটুর নীচে আর গোড়ালির উপরে জংঘার বাহির দিকে যে দুটা সুপারির মত শক্ত ঢিব্‌লে দেখা যায় সে দুটা ঐ হাড়ের দুই মুড়া। এ হাড়টার নড়চড় হয় না। তাই তল-হাতের মত জংঘাকে ঘোরাণ যায় না। পায়ের পাতাও চিৎ করা যায় না।

আগেই বলেছি, হাতের কব্জি, করসন্ধি বা মণিবন্ধে ছোট ছোট আটখানি হাড় আছে। পায়ের কব্জি, চরণসন্ধি বা গুল্‌ফে সাতখানি হাড় আছে। তার মধ্যে বড় হাড়খানি হচ্ছে গোড়ালির হাড়। হাতের শেষ অংশকে বলি কর, আর পায়ের শেষ অংশকে বলি, চরণ। করের যে চ্যাটাল অংশ মাংস দিয়ে ঢাকা তাকে বলি হাতের পাতা বা করতল। সেইরকম পায়ের পাতা বা চরণতল। করের বাকি অংশ করাঙ্গুল। চরণের বাকি অংশ চরণাঙ্গুল। করতলে পাঁচখানি লম্বা হাড়। সে পাঁচটা হাড় পাঁচটা আঙ্গুলেরই শেষ অংশ, মাংস দিয়ে সব-কটা একত্র ঢাকা থাকে বলে তাকে আঙ্গুল বলি না। চরণতলেরও পাঁচটা লম্বা হাড় তার পাঁচ আঙ্গুলেরই শেষ অংশ। হাতের বুড়া আঙ্গুলে দুটা পাব বা হাড়। অপর চার আঙ্গুলের প্রত্যেকটায় তিনটা করে পাব বা হাড়। পায়ের আঙ্গুলেও তাই। হাতের বুড়া আঙ্গুলকে চারিদিকে ঘোরাতে পারি, তা দিয়ে অপর সব আঙ্গুলকে ছুঁতে পারি, কেবল সেটাকে পিছন বা উল্টা দিকে ভাঁজ কর্ত্তে পারি না। হাতের আঙ্গুলগুলার প্রত্যেক গাঁইট ভিতর দিকে মুড়তে পারি, আঙ্গুলগুলি

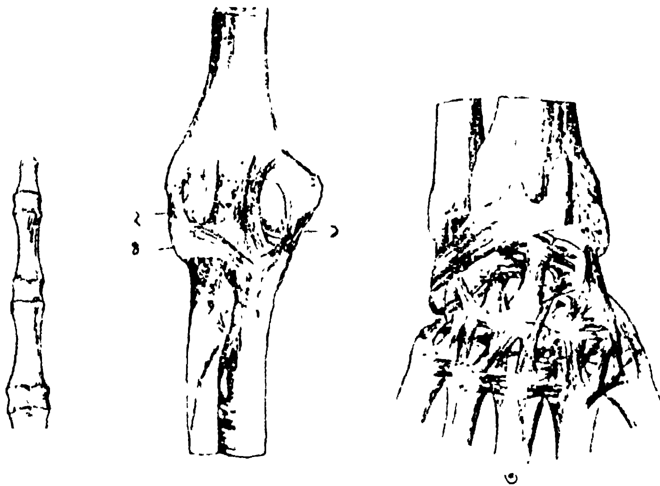
মুড়ে হাতের তেলোর উপর আনতে পারি, হাত মুঠা কর্ত্তে পারি। কিন্তু পায়ের বুড়ো আঙ্গুলকে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মত অপর আঙ্গুলের সাম্‌নে আন্‌তে পারি না। পায়ের তেলো মুঠো কর্ত্তেও পারি না। বানরেরা পারে।

শরীরের হাড়ের কথা শেষ হল। এতগুলি আল্‌গা আল্‌গা হাড়, যার যায়গায় যেটি, লাগা থাকে কি করে? কোন বাঁধন না থাকলে ত নাড়া চাড়া করলেই সব সরে এলোমেলো হয়ে যাবে। দুখানা হাড়ের দুই মুড়া একত্র ঠেকিয়ে বা লাগিয়ে রাখলেই সে যায়গাটায় একটা কব্জা হয় না। হাড় দুখানা যাতে সরে না যায়, যেখানে যেটি থাকবার তা যাতে ঠিক থাকে, তার ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়। দুই হাড়ের সংযোগের স্থানে হাড় দুখানাকে যদি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়, তবে হাড় দুখানাকে ভাঁজ কল্লে বা ঘোরালে ফেরালে হাড় দুখানা আল্‌গা হয়ে যায় না বা যোড়ের মুখ থেকে সরে যায় না। শরীরে তার কি ব্যবস্থা আছে, আর হাড়গুলিকে কি উপায়ে ভাঁজকরা বা ঘুরান ফেরান যায়, তার কথা আগামী বারে বল্‌ব।

৪

হাত-পা নাড়ার অদ্ভুত ব্যবস্থা

আমাদের শরীরে যে সব হাড় নড়ে চড়ে, সেগুলি যোড়ের জায়গায় এক রকম রেঁশা বা আঁশাল পদার্থের চ্যাপ্টা ফিতে বা গোল দড়ি দিয়ে একটা অপরটার সঙ্গে বাঁধা থাকে। হাড়ের এই সব বাঁধনকে 'অস্থিবন্ধনী' বা শুধুই 'বন্ধনী' বলে, ইংরাজিতে বলে (ligaments) 'লিগামেন্টস্‌'। দুখানা হাড়ের দুই মুড়ো বন্ধনী দিয়ে একত্র বেঁধে কব্জা তৈয়ার হলে, সেই কব্জায় হাড় দুখানা হাড়ের দুই মুড়ো বন্ধনী দিয়ে একত্র বেঁধে কব্জা তৈয়ার হলে, সেই কব্জায় হাড় দুখানা খেলে। যোড়ের মুখে হাড় দুখানার গড়ন অনুসারে কব্জা এক দিকে, দু দিকে, অথবা চারিদিকে খেল্‌তে পায়। আবার বন্ধনীগুলির বাঁধনের কায়দা অনুসারে যতটা খেলা, ঘোরা বা মোড়ার দরকার, ততটাই খেলতে বা ঘূর্ত্তে পায়, তার বেশী পায় না। আর হাড় দুখানাও আপন জায়গা হতে সহজে সরে যায় না। খুব বেশী জোরে টান বা চাপ পড়লে, অনেক সময়ে, যোড়ের মুখে হাড় আপন জায়গা থেকে সরে যায়। তাকে বলে 'সন্ধিচ্যুতি' বা 'সন্ধিভ্রংশ', ইংরাজিতে বলে (dislocation) ডিস্‌লোকেসন। এতে হাড় ভেঙ্গে যায় না, আস্তই থাকে; কেবল জোড়ের মুখ থেকে সরে যায় তাই কব্জা আর খেলে না। ডাক্তার হাড়খানিকে টেনে সরিয়ে আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলে কব্জা আবার ঠিক হয়ে যায়। অনেক সময়ে হাড় সরে যায় না, কিন্তু বন্ধনীগুলিতে এমন চাড় লাগে যে তার দুই একটা ছিঁড়েও যায়, ইংরাজিতে বলে (sprain) 'স্প্রেণ'।



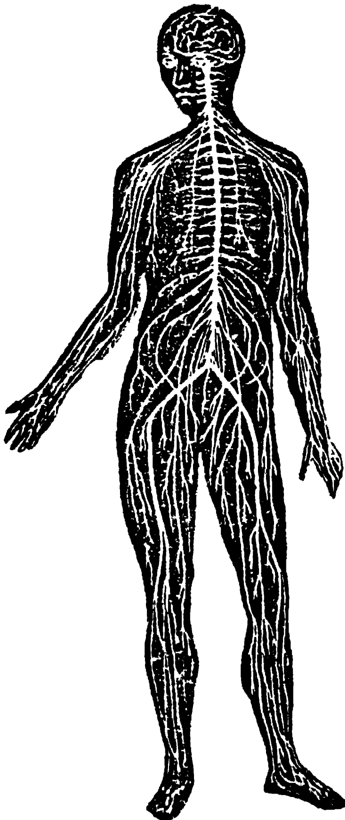
কঙ্কালের হাড়গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই মাংস দিয়ে ঢাকা থাকে। সে মাংস, ইটের উপর মাটীর প্লাষ্টার বা আস্তরের মত, এক টানা জাবড়ান রকমে বসান নয়। ভিন্ন ভিন্ন, ইংরাজিতে বলে (muscle) 'মসল্'। মাংসের ছোট ছোট গোছা একত্র বাণ্ডিল বেঁধে এক একটা বড় গোছা হয়। মাংসের ছোট বা বড় প্রত্যেক গোছা এক রকম আঁশাল পদার্থের খুব পাৎলা স্বচ্ছ আবরণ বা পর্দ্দা দিয়ে মোড়া থাকে। মাংসের গোছা বা মাংসপেশীর সমষ্টি মাংস। মাংসের একটা ছোট গোছা পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে, সেটা অনেকগুলি সরু সরু লম্বা লম্বা মাংসের সূতা একত্র আঁটি বেঁধে তৈয়ার হয়েছে। শুধু চখে সূতার মতন যে মাংস দেখা যায় তার মধ্যেও তার চেয়েও খুব সরু সরু সূক্ষ আঁশের মত অনেক খেই আছে। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে এই সব আঁশ বা খেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মাংসের সে সূতাটাও অনেকগুলি সূক্ষ্ম খেই এর বাণ্ডিল. ছোট্ট একটা পেশী।

কোন কোন মাংসের গোছা বা 'মসল্' এর আকৃতি পটোলের মত--মাঝখানটা বা পেটটা মোটা, আর দুই মুড়ো ক্রমে সরু হয়েছে। আমাদের হাতে ও পায়ে ঐ রকম বড় বড় মসল্ আছে। কতকগুলি মাংসপেশী চওড়া ও চ্যাপ্‌টা—যেমন বুকে থাকে, কতকগুলির এক মুড়ো সরু অপর মুড়ো ক্রমে চওড়া হয়ে হাত পাখার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

হাতের বা পায়ের একটা বড়া গোটা মাংসপেশী নিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, তার দুই সরু মুড়ো থেকে শাদা, শক্ত. মজবুত চক্‌চকে দড়ির মত জিনিস বেরিয়েছে। সে জিনিস মাংস নয়, অন্য এক রকম আঁশাল পদার্থে তৈয়ারি। ঐ দড়িতেও অনেক সরু

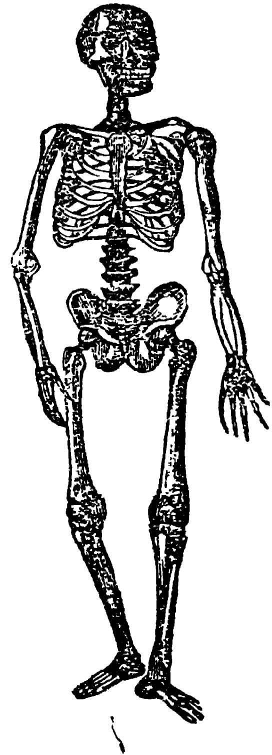
সূতার মত খেই আছে। মাংসপেশীর প্রত্যেক সূতার আগা ঐ রকম সূতায় পরিণত হয়েছে।

মাংসপেশীর দুই মুড়ো দুখানা হাড়ের সঙ্গে আঁটা থাকে। নরম মাংসপেশী নিজে হাড়ের সঙ্গে আঁটা থাকে না। পেশীর দুই মুড়ো থেকে যে শক্ত শাদা দড়ি বেরিয়েছে সেই দড়ি দিয়ে হাড়ের সঙ্গে আঁটা থাকে। পেশীর মুড়োর দড়ি, যা হাড়ের সঙ্গে আঁটা থাকে, তাকে সংস্কৃতে বলে 'স্নায়ু',—ইংরাজিতে বলে (sinew) 'সিনিউ'। কিন্তু আজকাল বাঙ্গলায় 'স্নায়ু' কথায় অন্য জিনিস বুঝায়, তাই আজকাল মাংসের এই দড়িকে 'কণ্ডরা' বল্‌তে হয়। আমাদের গায়ে বাহির হইতে অনেক যায়গায় কণ্ডরার দড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পায়ের নীচে গোড়ালির উপরে একটা মস্ত কণ্ডরার দড়ি আছে। তার পর হাতের পাতা পায়ের পাতা উবুড় করে আঙ্গুল নাড়লে, চামড়ার নীচে কণ্ডরার দড়ি সব দেখতে পাবে (২নং চিত্র দেখ)। হাত চিৎ কবলে তল-হাতের মাঝখানে কব্জার কাছে একটা লম্বা কণ্ডরার দড়ি দেখা যায়। এ সব দড়ি ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশীর শেষ অংশ থেকে বেরিয়ে, যার যার হাড়ে বাঁধা রয়েছে। কোন কোন পেশীর কণ্ডরা খুব লম্বা হয় আবার কোন কোন পেশীর কণ্ডরা এত ছোট হয় যে, আছে কিনা টের পাওয়া যায় না। কণ্ডরা দিয়েই মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকে। মসলের আগার দড়ির বৈজ্ঞানিক নাম (tendon) 'টেণ্ডন'। অস্থিবন্ধনী বা লিগামেণ্ট আর মাংসের টেণ্ডন বা কণ্ডরা এক জিনিস নয়, এটা মনে রেখো।



মাংসপেশীই হাড় নাড়বার যন্ত্র। মাংসপেশীর বা মাংসের প্রত্যেক সূক্ষ্ম খেই বা আঁশের একটা বিশেষ গুণ আছে। সেটা কোন রকমে উত্তেজিত হলে লম্বায় ছোট হয়, আর চৌড়ায় বাড়ে বা মোটা হয়ে যায়। ইহাকে বলে মাংসপেশীর 'সংকোচন' গুণ।

তোমার ডান হাতখানি সোজা করে রেখে, কনুই ও কাঁধের মাঝখানে বাহুটাকে বাঁ হাত দিয়ে মুঠো করে চেপে ধর। তার পর ডান হাত ভাঁজ কর। বাঁ হাতের মুঠার তলায়, ঐ বাহুর মাংসের গোছা বা মসল্‌টা শক্ত আর মোটা হয়ে, একটা পিণ্ডের মত ফুলে উঠেছে, টের পাবে। ঐ মাসল্‌টার মাঝখানটা বা পেট্‌টা কুঁচকে মোটা হয়ে উঠল বলে সেটা লম্বায় ছোট হয়ে গেল, তাইতে তার মুড়োর দড়ি বা কণ্ডরাতে টান পড়ল, আর অমনি তল-হাতখানাও উঠে পড়ল। কণ্ডরার দড়ির ছোট হবার বা কোঁচকাবার ক্ষমতা নাই। মাংসপেশী আপনা আপনি কুঁচকে ছোট হয়ে যেতে পারে বলে আমরা গা হাত পা নাড়তে পারি।



বাহুর ঐ মাংস পেশীটা রেখে, হাতের হাড় থেকে যদি আর সব মাংস পেশী সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তার আকৃতি ৩নং ছবির মত হবে। দেখ ঐ মাংস পেশীর নীচের মুড়োর দড়ি বা কণ্ডরাটা কনুই এর কব্জার নীচে তল-হাতের একখানা হাড়ের সঙ্গে মিশে আঁটা রয়েছে। আর তার উপর দিগের মুড়ো, দুমুখো হয়ে তা থেকে দুটা কণ্ডরা বেরিয়ে, কাঁধের কব্জার উপরে পৃষ্ঠ-ফলকের হাড়ের সঙ্গে দুই জায়গায় আঁটা আছে। হাত তুল্‌তে ইচ্ছা কল্লেই ঐ মাংস পেশীর পেট্‌টা ফুলে উঠে, আর সেটা লম্বায় ছোট হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে তার দড়ি বা কণ্ডরাকে টেনে আনে, তাইতে তল-হাতের হাড়খানাও উঠে আসে। তল-হাত খানা যদি নড়তে না পায়, আর ঐ পেশীটা যদি সঙ্কুচিত হয়, তবে কাঁধ শুদ্ধ বাহুর হাড় খানাই তল-হাতের উপর ভাঁজ হয়ে পড়বে। যদি একটা খুঁটি বা থাম ধরে সেটাকে খুব জোরে টান, তবে খুঁটিশুদ্ধ তল-হাতখানা তোমার দিকে (অর্থাৎ) বাহুর দিকে আসবে না, কিন্তু মাংসপেশী ছোট হয়ে যাবে, তাতে কনুই ভাঁজ হয়ে গিয়ে তোমার কাঁধটাই, খুঁটির দিকে এগিয়ে এসে, তল-হাতের উপর পড়বে। অর্থাৎ তোমার শরীরটা খুঁটির দিকে এগিয়ে যাবে। দু হাতে (হরাইজনটাল্ বার) ধরে, বা ঘরের চালের একটা বাঁশ ধরে, যদি ঝুলে পড়, আর সেই অবস্থায় যদি 'বার্' বা বাঁশ খানাকে তোমার দিকে টেনে আন্‌তে চেষ্টা কর, তবে বাহুর মাংসপেশী ছোট হয়ে যাবে, কিন্তু 'বার' বা বাঁশশুদ্ধ তল-হাতখানা এগিয়ে আসতে পার্ব্বে না; কাজেই কনুই

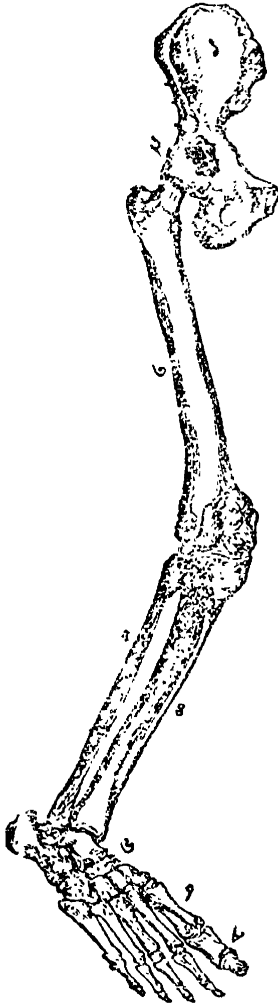
ভাঁজ হয়ে গিয়ে তোমার কাঁধশুদ্ধ সমস্ত শরীরটাই উঠে তলহাতের উপর গিয়ে পড়বে, অর্থাৎ 'বার' বা বাঁশের দিকে এগিয়ে যাবে। কব্জায় একটা হাড়আটক থাক্‌লে মাংসপেশীর টানে অপর হাড়খানা এগিয়ে যায়।

আবার দেখ—কনুই বেঁকিয়ে তল-হাতখানা উপরে তুলেছ, তুলে রাখ্‌তে যেই আর ইচ্ছা হল না, অমনি বাহুর সেই মাংসপেশীর টান চলে গেল, অমনি তল হাতখানা আপন ভারে পড়ে গিয়ে হাত সোজা হল। কিন্তু সেখানে আপন ভারে পড়ে গিয়ে সোজা হতে পারে না বা বাঁক্‌তে পারে না, সেখানে কি করে সোজা হয় বা বাঁকে? মনে কর টেবিলের উপর কনুই ভাঁজ করে, তল-হাতখানাকে তোমার দিকে টেনে এনে, টেবিলের উপর ফেলে বা শুইয়ে রেখেছ। তার পর যদি হাতখানাকে সোজা কত্তে ইচ্ছা কর, ত কি করে সোজা হয়? এখানে ত হাত আপন ভারে পড়ে গিয়ে সোজা হবে না। কিন্তু টেবিলের উপর হাতখানা শুইয়ে রেখেও ত সোজা কত্তে পার। বাহুর পিছন দিকেও ঐ রকম একটা বড় মাংসপেশী আছে, সেটার এক মুড়ো কাঁধের কাছে বাঁধা, আর এক মুড়ো কনুই-এর নীচে তল-হাতের পিছন দিকে অপর এক হাড়ের সঙ্গে বাঁধা আছে। হাত সোজা কত্তে ইচ্ছা কল্লে সেই পেশীটা কুঁচকে যায়, আর তল-হাতের হাড় পিছন দিকে বা উল্টা দিকে সরে গিয়ে হাত সোজা হয়। তারপর আর বেশী বাঁকবার বা মুড়বার যো নাই; কনুই এর হাড়ের আগার গোঁজটা বাহুর হাড়ের নীচের মুণ্ডের একটা খাঁজে পড়ে আট্‌কে যায়।

৫

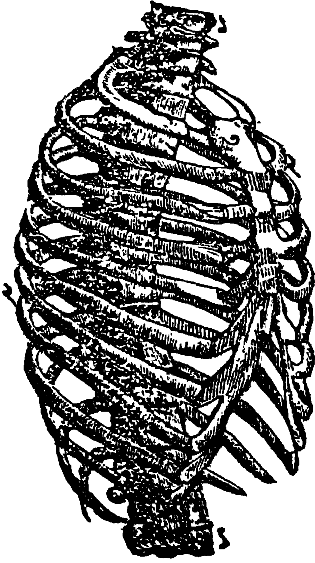
হাতে যে রকম, পায়েও সেই রকম ব্যবস্থা। হাতের পাতা আর পায়ের পাতা, হাতের আঙ্গুল আর পায়ের আঙ্গুল বাঁকান আর সোজা করারও ঐ রকম ব্যবস্থা। তল-হাতের সাম্‌নের একদল পেশী হাতের পাতাকে ভিতর দিকে ভাঁজ করায়, আঙ্গুলগুলিকে মোড়ে, মুঠা করায়। আবার হাতের বাহির দিকের একদল মাংসপেশী হাতের পাতাকে সোজা করায়, পিছনে বাঁকায়, আর আঙ্গুলগুলিকে সোজা করে। আর একদল-পেশী হাতকে ঘুরিয়ে চিৎ করে, অপর এক দল পেশী হাতকে উবুড় করে দেয়। উরুর সাম্‌নের একদল পেশী পা সোজা করায়, উরুর পিছন দিকের একদল পেশী হাঁটু বাঁকায়। জংঘা তলপায়ের পিছন দিকে যে মোটা মসল্‌, যাকে পায়ের ডিম বলে, সেটা গোড়ালিকে উপর দিকে তোলে, পায়ের কব্জিকে সাম্‌নের দিকে বাঁক্‌তে দেয় না। জংঘায় আর একদল পেশী পায়ের পাতা টেনে তোলে। একদল পেশী বাহুকে কাঁধের উপর তোলে, একদল নামায়। একদল পেশী উরুকে পেটের দিকে টেনে আনে আর একদল তাকে সোজা করে দেয়। ঘাড়ের একদল মাংসপেশী মাথাকে ডাইনে, আর একদল বাঁয়ে বাকায়। একদল মাথাকে সাম্‌নে নোয়া, আর একদল তাকে টেনে সোজা

করে বা পিছনে হেলায়। বুক আর পেটের দিকে একদল পেশী পিঠকে সাম্‌নের দিকে বাঁকায়। পিঠের দিকে একদল পেশী পিঠকে খাড়া করে রাখে, বা তাকে পিছনে ধনুকের মত বাঁকায়। মুখমণ্ডলে অনেক মাংসপেশী আছে, তার জন্য আমরা নানা প্রকার মুখভঙ্গী কর্ত্তে পারি, হাঁ করি মুখ বুজি, দাঁতে দাঁতে ঘসি, খাবার চিবাই, জিভ নাড়ি, চোখ নানা দিকে ঘুরাই, ভ্রূ আর কপাল কোঁচকাই। মাংসপেশী বা তার কণ্ডরা কেটে গেলে, যে হাড়ের বা যে জিনিসের সঙ্গে তার বাঁধন বা যোগ থাকে, সেটা আর নাড়তে পারি না।



ইচ্ছা কল্লাম আর হাতের মাংসপেশী কুঁচকে গেল, হাতখানা উঠল। ইচ্ছা কল্লে মাংসপেশী কেন কোঁচকায়? ইচ্ছার সঙ্গে মাংসপেশীর কি সম্বন্ধ বা যোগ আছে? বাহুর সাম্‌নের মাংসপেশীটাকে কাটলে তার মধ্যে শাদা সূতার মত একটা জিনিস রয়েছে, দেখা যাবে। সেটাকে বাঙ্গলায় 'স্নায়ু' বলে, ইংরাজীতে (nerve) 'নর্ভ' বলে। এই স্নায়ুর সুতাটা ধরে চল্লে দেখা যাবে যে, সেটা খানিক উপরে গিয়ে অপর কতকগুলি স্নায়ুর সঙ্গে মিশে একটু মোটা হয়ে চলেছে। আরও খানিক উপরে আরও কতকগুলি স্নায়ুর সূতা তাতে এসে মিশেছে; এই রকমে অন্যান্য কতকগুলি স্নায়ুর সঙ্গে মিশে মোটা হয়ে, গলার কাছে গিয়ে, সেখানকার মেরুদণ্ডের দুই কসেরুকার ফাঁক দিয়ে মেরুদণ্ডের ভিতরের মেরুমজ্জা বা স্নায়ুরজ্জুতে গিয়ে মিশেছে। মেরুদণ্ডের লম্বা স্নায়ুরজ্জুটা উপর দিকে মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশেছে। মেরুদণ্ডে স্নায়ুরজ্জু থেকে যে স্নায়ুসূতা বা 'নর্ভ'টা বাহুর সাম্‌নের মাংসপেশীতে ঢুকেছে, সেটা যদি কেটে দুখণ্ড হয়ে যায়, তবে মাংসপেশী, কণ্ডরা, কব্জা আর হাড়, সব ঠিক থাক্‌লেও, যতই কেন ইচ্ছা কর না, কনুই আর ভাঁজ হবে না, হাত আর উঠবে না। সবই ঠিক আছে, কেবল স্নায়ুটা কেটে গিয়েছে। স্নায়ুটা যখন যোড়া ছিল তখন মাংস পেশীটা সঙ্কুচিত হত।

এতে এই বুঝা যায় যে, যখন ইচ্ছা করি তখন মস্তিষ্ক থেকে এমন একটা কিছু মেরুমজ্জা দিয়ে স্নায়ু সূতা বেয়ে মাংসপেশীতে আসে, যাতে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়। স্নায়ু-সূতাটা কাটা পড়লে ইচ্ছা আর মাংসপেশীর মধ্যে যে যোগ সেটা আর থাকে না। যেমন টেলিগ্রাফের তার কেটে গেলে এক দিকের যন্ত্রটা যতই কেন নাড় না, অপর দিকের যন্ত্রটা আর নড়বে না বা সাড়া দেবে না। সমস্ত লম্বা মেরু মজ্জাটার দুপাশ থেকে কসেরুকাহাড়গুলির যোড়ের কাছের ফাঁক দিয়ে সূতার মত অনেক স্নায়ু বেরিয়ে হাতে, বুকে, পিঠে, আর পায়ের সব মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকে ডাল পালা ছড়িয়ে পেশীর সব সূতায় মিশেছে। যে স্নায়ু যে অঙ্গে যে মাংসপেশীতে গিয়েছে, সেটা কেটে গেলে, সে অঙ্গের সে মাংসপেশীর সঙ্কোচন ক্ষমতা চলে যায়, সে অঙ্গ আর নাড়া যায় না। যদি পড়ে গিয়ে বা অন্য রকমে আঘাত লেগে, কারু কোমর ভেঙ্গে গিয়ে সেখানকাব মেরুমজ্জা বা স্নায়ুরজ্জুটা ছিঁড়ে যায়. তবে সেই ভাঙ্গা জায়গার নীচের অংশের মেরুমজ্জা থেকে যত স্নায়ু বেরিয়ে যত মাংসপেশীতে গিয়েছে, সে সব অকেজো হয়ে যাবে, সে সব অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে, ইচ্ছাধীন আর থাকবে না। সে লোকটা কোমর আর পা দুখানা তুল্‌তে না বা নাড়্‌তে পার্ব্বে না, শুয়ে শুয়েও পা একটুও ফেরাতে বা টান্‌তে পার্ব্বে না; কোমরের নীচের সমস্ত অংশটা যেন তার নিজের শরীরের অংশ নয়, বাইরের একটা কিছু লেগে আছে, এমনি বোধ হবে।



ইচ্ছা কল্লে মস্তিষ্কে এমন একটা কিছু ঘটে যাতে ঢেউ বা প্রবাহের মত একটা কিছু মেরুদণ্ডের মজ্জায় এসে, তা থেকে যে অঙ্গের যে পেশীটাতে যাবার দরকার, সেই পেশীব সঙ্গে পেশীটা সঙ্কুচিত হয় আর তাতে বাঁধা হাড় নড়ে ওঠে। যে সব স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে বা মেরুমজ্জা থেকে বেরিয়ে মাংসে ঢুকেছে আর মাংসকে চালায় বা নাচায়, তাদের বলে 'চালক স্নায়ু' ইংরাজিতে বলে (motor nerves) মোটর নার্ভস। আর যে সব স্নায়ু শরীরের উপরের চামড়া হতে, আর চোক, কাণ, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হতে বেরিয়ে, স্নায়ুরজ্জুতে গিয়ে তারপর, অথবা একেবারে, মস্তিষ্কে মিশেছে, তারা কেবল আমাদের শক্ত নরম, ঠাণ্ডা-গরম. আলো, শব্দ, গন্ধ স্বাদ, প্রভৃতির

অনুভূতি করিয়ে বা টের পাইয়ে দেয়, বাহিরের খবর মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। এই সব স্নায়ুকে বলে 'অনুভাবক স্নায়ু' ইংরাজিতে বলে (Sensory nerves) 'সেন্সারি নার্ভস'। এ সব স্নায়ু কেটে গেলে যেখানে যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাদের যোগ, সে ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়। চোখ থেকে যে স্নায়ু বেরিয়ে মস্তিষ্কে গিয়েছে সেটা কেটে গেলে, অন্ধ হয়ে যাই। কাণ থেকে যেটা বেরিয়ে মস্তিষ্কে গিয়েছে, সেটা কেটে গেলে বধির বা কালা হয়ে যাই। কারু কোমরের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলে তার পায়ে চিমটি কাট্‌লে, পুড়িয়ে দিলে পা কেটে দিলেও তার কোন বোধ থাকে না, সে টেরই পাবে না কি হচ্ছে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কথা পরে বল্‌ব। এ সব স্নায়ু মাংসপেশীকে কোঁচ্‌কাতে পারে না। ইচ্ছা চলে গেলে আমাদের মাংসপেশী কোঁচ্‌কায় না, টান হয় না। দাঁড়ান অবস্থায় যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন তার কোন রকম ইচ্ছা কর্ব্বার ক্ষমতা থাকে না, সে অমনি আপনা ভারে ধপ্ করে মাটীতে পড়ে যায়। বসে থেকে যদি কেউ ঘুমিয়ে বা ঝিমিয়ে পড়ে, অমনি তার মাথাটা সামনে না হয় পিছনে নুয়ে পড়ে, সোজা থাকে না।

আমরা নড়া চড়া না করেও যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে থাকি তবুও হাড়ের সঙ্গে লাগা এই সব মাংসপেশীর দলের বিশ্রাম নাই, তারা সর্ব্বক্ষণই কাজ কচ্ছে, টানাটানি করে শরীরখানাকে সোজা খাড়া করে রাখছে। আমরা ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি বলেই মাংসপেশীগুলো টান হয়ে আমাদের খাড়া করে রেখেছে। অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও পা, পিঠ, ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়, তার মানে ঐখানের সব মাংসপেশী কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর কাজ কর্ত্তে পেরে ওঠে না।

মাংসপেশীর সঙ্কোচন ক্ষমতা কি সকল সময়ে থাকে? কাঁধের নীচে বাহুখানিকে যদি দড়ি দিয়ে কসে বেঁধে রাখ, ত খানিকপরে দেখ্‌বে যে, হাতখানা ক্রমে কাল, হিম আর অসাড় হয়ে যাচ্ছে, সেটা ভার বোধ হচ্ছে। আরও খানিক পরে হাত বাঁকাতে চেষ্টা কল্লে অতি কষ্টে পার্ব্বে, কিম্বা মোটেই পার্ব্বে না। তারপর যদি বাঁধন খুলে দাও, দেখবে হাতখানা ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠ্‌ছে, অসাড় ভাব চলে যাচ্ছে, হাত মুড়বার ক্ষমতা ফিরে আস্‌ছে। দড়ি বাঁধতে মাংসপেশীর জোর কেন কমে গেল?

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে সর্ব্বাঙ্গে যাবার আবার ফিরে আসবার, ধমনী আর শিরার নলের ডাল-পালা সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। বাহুর মাংস-পেশীর মধ্যে একটা বড় ধমনী এসেছে তা থেকে সরু সরু ডাল পালা বেরিয়েছে। সেগুলি থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল বেরিয়ে পেশীর সব সূতায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেতে পেলে না, তাই হাত ঠাণ্ডা আর অসাড় হয়ে গেল। মাংসপেশীতে রক্ত আস্‌তে না পেলে মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। হাতে দড়ির বাঁধন যদি খুলে ফেলা না যেত ত দিন কয়েক পরে হাতের মাংস নির্জ্জীব হয়ে যেত, তারপরে পচে উঠ্‌ত। মাংসপেশীকে কার্য্যক্ষম রাখ্‌তে হলে, তাতে ক্রমাগত রক্তের স্রোত যাওয়া আসা চাই। আরও দেখ, আজ হাত দিয়ে যে ভার তুলতে পাচ্ছে, দু দিন অনাহারে থাক্‌লে সে ভার তুল্‌তে হাতে জোর পাবে না। মাংসপেশীর জোর কি জন্য কমে গেল? স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে খাবার অভাবে। খাবার জিনিসের সঙ্গে মাংসপেশীর

কি সম্বন্ধ? গায়ের মাংসের মধ্যে ত খাবার পুরে দি না, মুখ দিয়ে খাবার গিলি, তা ত পেটের ভিতর যায়। মাংসের ভিতর কি করে খাবার যায়? আমরা যা খাই তা পেটের মধ্যে গিয়ে পেটের রসে হজম হয়ে ভেঙ্গে চুরে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। যেমনটি গিলি তেমনটি আর থাকে না। চিনি বা নুন জলে দিলে যেমন জলের সঙ্গে একবারে মিশে যায়—দ্রব হয়ে যায়, তার ভিন্ন অস্তিত্ব থাকে না, ছেঁকে জল থেকে বের করা যায় না—দ্রব হয়ে যায়,—তেমনি যে জিনিস খাই তা পেটে গিয়ে এমন সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের পদার্থ হয়ে যায়, যা জলে গলে মিশে যায়—দ্রব হয়। জলে দ্রব হয়ে গেলে পেটের নাড়ি ভুঁড়ির গায়ে যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তের নল আছে, তাদের প্রাচীরের ভিতর দিয়ে চুইয়ে, নলগুলির মধ্যে চলে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। রক্তের স্রোত সে সব দ্রব জিনিসকে সর্ব্বাঙ্গে মাংসে বয়ে নিয়ে যায়। মাংসপেশী রক্ত থেকে নিজের দরকারী খাবার বেছে বেছে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের উপাদানের মত জিনিস নূতন করে গড়ে নিয়ে পুষ্ট হয়। মাংসপেশী যত নড়া চড়া করে ততই তার ক্ষয় হয়। সে ক্ষয় পূরণ করবার জন্য রক্ত থেকে খাবার নিয়ে যায়। তাই রক্ততে ক্রমাগত খাবার যোগাতে হয়। আমাদেরও বারে বারে খেতে হয়।

মাংসপেশী যেমন রক্ত না পেলে দুর্ব্বল হয় সেই রকম মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা, স্নায়ু অস্থি, চর্ম্ম এবং শরীরের সব যন্ত্রেরই রক্তের খোরাকের দরকার। রক্ত না পেলে তারাও দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়; এই রক্ত থেকে তাদের যার যেটি দরকার তা নিয়ে নেয়, আর তাদের যা দরকার নয়, বা যা তারা নিজেদের দেহ থেকে বের করে ফেলে, তা সেই রক্তের স্রোতে ঢেলে দেয়। এই সকলের পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন, কাজও ভিন্ন ভিন্ন, তাই খোরাকও ভিন্ন ভিন্ন। একটা যে রসকে অকেজো বলে রক্তে ফেলে দেয় অপরে সেটাকে কাজে লাগায়। আমাদের শরীরে এমন সব যন্ত্র আছে, যারা রক্ত থেকে অকেজো আবর্জ্জনা বের করে নিয়ে শরীর থেকে দূর করে দেয়। ঘাম আর প্রস্রাব সেই আবর্জ্জনা। আবার খাদ্যের যে সব জিনিস জলে গলে না, রক্তের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না তারা মলরূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

শরীরের অস্থি, মাংস, স্নায়ু, রক্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বা ধাতু কেমন কলের মত একটা আর একটার সঙ্গে যোগ রেখেছে। একটা বিগড়ে গেলে সব কটাই বিগড়ে যায়। অল্প স্বল্প বিগড়ে গেলে নিজেরাই মেরামত করে নেয়। নিজের মেরামতের ক্ষমতা— ও রক্ত থেকে খাবার নেবার ক্ষমতা, যদি চলে যায় তবে শরীরের মৃত্যু হয়। শত ঔষধেও তাকে বাঁচান যায় না।

সন্দেশ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮।পৃ: ৩৮-৪৫
" আষাঢ় " । পৃ. ১০০-১০৭
" শ্রাবণ ১৩২৮। পৃ: ৯৮-১০৩
" ভাদ্র " ১৩২৮। ১৪৭-১৫২
আশ্বিন ১৩২৮। পৃ: ১৭২-১৭৭

'আমিবা' বা অনন্ত-রূপী প্রাণী

ভাই সন্দেশ

এমন কোন প্রাণীর কথা কি শুনেছ যে ক্ষণে ক্ষণে তার আকৃতি বা রূপ বদলায়? হাতী, ঘোড়া, ইন্দুর; শকুন, হাঁস, চড়াই; সাপ, ব্যাং; প্রজাপতি, মাছি, মশা; কেঁচো কৃমি—যত রকম প্রাণী সচরাচর দেখতে পাও, তাদের সকলেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি আছে। অনেকের চেহারা বাচ্চা বেলায় এক রকম থাকে, বড় হলে পর ভিন্ন রকম হয়ে যায়, অথবা একই আকৃতি ছোট থেকে বড় হতে পারে; কিন্তু ইহারা কেহই ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে না।

ছোট বড় যত রকমের প্রাণী সচরাচর দেখতে পাও, তাদের সকলেরই শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যন্ত্রতন্ত্র আছে। তাদের সামনের দিক পিছন দিক আছে, মাথা-নেজা আছে, চলাফেরার জন্য পা আছে, খাবার জন্য মুখ আছে হজমের জন্য পেট আছে, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাক বা নাকের মত যন্ত্র আছে।

কিন্তু এমন প্রাণীর কথা কি শুনেছ যে সে চলে—অথচ চল্‌বার জন্য পা বা অন্য কোন বিশেষ যন্ত্র নাই; খায় অথচ খাবার জন্য মুখ নাই; হজম করে—অথচ হজম করবার জন্য পেট বা অন্য কোন বিশেষ যন্ত্র নাই; নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে—কিন্তু তার জন্য নাক বা অন্য কোন বিশেষ যন্ত্র নাই?

এমন প্রাণীও পৃথিবীতে আছে। এই সব প্রাণ এত ক্ষুদ্র যে শুধু চোখে দেখা যায় না। ইহারা জলে পাঁকে থাকে। পুকুরে, খালে বিলে, খানা ডোবায় অনেক আছে। পুকুরের ধারে জলের তলার পাঁক ঘুঁটে, সেই জলের এক ফোঁটা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ৫০০ গুণ বা হাজার গুণ বড় ক'রে দেখলে এই প্রাণী বেশ ভাল দেখা যায়। দু'শ বছর আগে এ প্রাণীর কথা কেউ জানত না। তখন ভাল অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার হয় নাই। ১৭৫৫ খ্রিঃ রাসেল ভন্ হোসেনহফ্ নামে একজন পণ্ডিত এক ফোঁটা পুকুরের ঘোলা জল আতুসি কাঁচ বা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (magnifying glass) দিয়ে দেখছিলেন। তিনি দেখলেন যে সেই জলের ফোঁটার মধ্যে খুব ছোট্ট এক টুকরা ঘাসের পাতা রয়েছে। সেই ছোট্ট গাসের টুকরায় খুব ক্ষুদে এক বিন্দু শ্লেষ্মা বা কফের মত জিনিস লেগে আছে। সেই বিন্দুটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে, আর তার চেহারাটাও বদ্‌লে বদ্‌লে যাচ্ছে। তাই দেখে তাঁর ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। তারপর তিনি সেটাকে একটা সরু কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। অমনি সেটা আরো ছোট্ট আর গোল হয়ে সেই পাতার

টুকরো থেকে গড়িয়ে জলের তলায় পড়ে গেল।

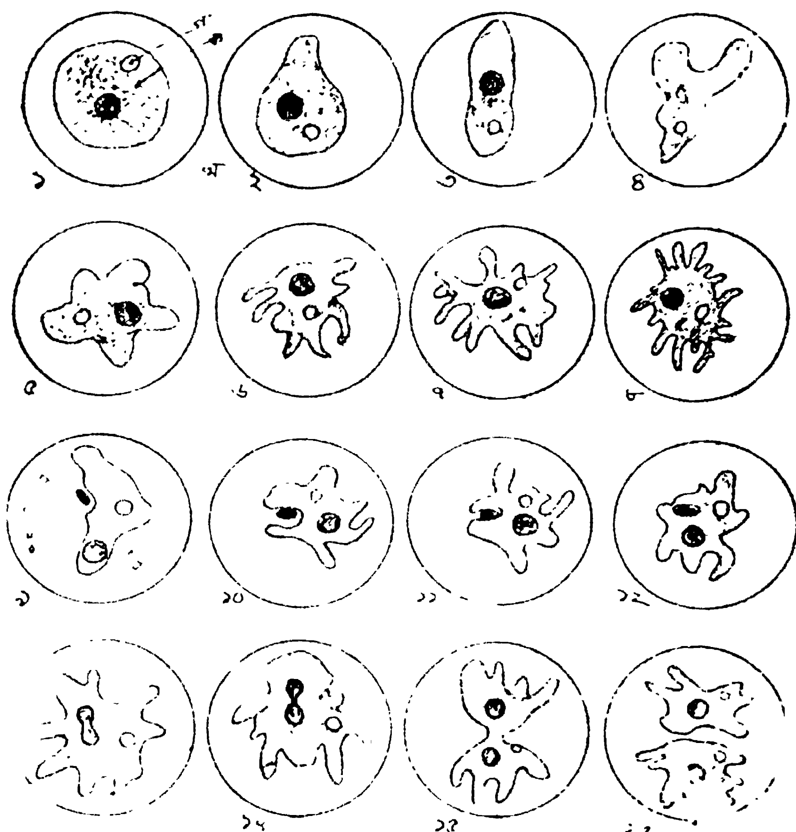
গ্রীস দেশের পুরাণেতে 'প্রোটিয়াস' নামে এক লোক ছিল, তাকে চেপে ধরলে তার ক্রমাগত রূপ বদলে যেত। তাই এই প্রাণীর নাম তিনি রাখলেন 'প্রোটিয়াস্' প্রাণী। তারপর যখন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি হ'ল, তখন অনেক পণ্ডিত এই প্রাণীকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তখন এ প্রাণীর নাম হ'ল (Amoeba) আমিবা। আমিবা অর্থ যা বদ্‌লে যায়, পরিবর্তনশীল। বাঙ্গলা নাম যদি নেহাৎ দিতে হয় তবে এর নাম কর 'অনন্তরূপী'। তার চেয়ে 'আমিবা' বললেই সহজ হয়।

অণুবীক্ষণ দিয়ে ভাল ক'রে দেখলে দেখা যায় যে আমিবা একটা ঘন থকথকে জিনিষ। আমিবার দেহ-পদার্থের উপরিভাগ স্বচ্ছ তরল বস্তু: মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত ঘন তরল বস্তু আর একটু ঘোলাটে, আর তার মধ্যে অনেক গুঁড়া গুঁড়া জিনিস রয়েছে। দেহের মধ্যে এক স্থানে একটা গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকার অংশ আছে, সেটা আরো একটু ঘন। শরীরের মধ্যের সেই ঘন অংশটুকুকে বলে নিউক্লিয়াস (nucleus) অর্থাৎ মধ্যবস্তু, শাঁস বা অন্তঃসার। আমিবার দেহের অপর এক স্থানে একটা ছোট্ট ফোস্কার মত দেখা যায়, সেটা স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। সেই ফোস্কাটা ক্রমে বড় হয়, তারপর আবার হঠাৎ ছোট্ট হয়ে যায় আর সেই সময়ে তার ভিতরের জলটা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই যে ফোস্কাটা, যেটা ক্রমাগত বাড়ছে আর কমছে,—অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায়, যার স্পন্দন আছে—তার নাম "স্পন্দমান স্ফোটক"। বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন (Vacuols) ভ্যাকুয়োল। বোধ হয় এই ফোস্কাটা শরীরের অসার রস জড় করে বাহির করে দেয়।

আমিবা যখন বিশ্রাম করে, তখন সে মটরের মত গোলাকার বা পিণ্ডাকার রূপ ধারণ করে। তাহার যখন চলাফেরা করবার দরকার হয়, তখন যে দিকে যাবে শরীরের সেই দিক হ'তে আঙ্গুল বা জিভের মধ্য একটা লম্বা অংশ বাহির হয়। শরীরের তরল পদার্থ খানিকটা সেই দিকে যাওয়াতে অপর দিকের খানিকটাও সেই দিকে গড়িয়ে আসে। সুতরাং তার তরল দেহটা আগে যেখানে ছিল ঠিক সেখানে থাকে না, একটু সরে যায়। এইরূপ কখন কখন দুই তিনটা, বা চার-পাঁচটা আঙ্গুলের মত বাহির হয়। তার কোনটা মোটা কোনটা সরু, কোনটা বড় কোনটা ছোট। কখন ছোটটা বড়, বড়টা ছোট, সরুটা মোটা, মোটাটা সরু হচ্ছে; কোন আঙ্গুলটা ক্রমে লম্বা হচ্ছে বা তার গায়ে আর একটা ডাল গজাচ্ছে, কোন আঙ্গুলটা বা ক্রমে ছোট হ'য়ে শরীরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ক'রে ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদ্‌লিয়ে যাচ্ছে এবং এক স্থান থেকে অপর স্থানে ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে স'রে যাচ্ছে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তার কত রকম রূপ হয়েছে। কখন কখন ইহার চাইতে শীঘ্র, কখন কখন আরো বিলম্বে রূপ বদলায়।

আমিবার স্পর্শ জ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ। কোন জিনিস তার গায়ে ঠেক্‌লে, সে ভাল কি মন্দ খাবার জিনিস কি অকেজো জিনিস, তা টের পায়। তার গায়ে যদি একটু



এসিড্ (অম্ল পদার্থ), খুব ঠাণ্ডা জল কি একটু গরমজল, কি এক ফোঁটা মদ, কি ক্লোরোফর্ম্ম ঠেকিয়ে দাও ত, সে তৎক্ষণাৎ শরীরটাকে জড় সড় ক'রে গোল পিণ্ডের মত হয়ে মরার মত পড়ে থাকবে। তারপর সে সব জিনিসের তেজ চলে গেলে, সে সাম্‌লে উঠবে, আর আগের মত আঙ্গুল বার করে নড়া চড়া করতে থাকবে। খাবার কোন জিনিস,—যেমন, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র অপর কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ, অথবা বড় কোন মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীরের ক্ষুদ্র এক কণা—যদি তার গায়ে ঠেকে, তবে

আমিবা সেই খাদ্যকণার দুই পাশ দিয়ে আপন শরীর থেকে দুইটা আঙ্গুল বার ক'রে সেই আঙ্গুল দুইটার ফাঁকের মধ্যে সেটাকে পূরে আঙ্গুল দু'টাকে একত্র মিলিয়ে দেয়। তাহাতে সেই জিনিষটা তার শরীরের তরল পদার্থের মধ্যে ঢুকে যায়। বালি বা অপর কোন অকেজো জিনিস গায়ে ঠেক্‌লে সেটাকে শরীরের মধ্যে ঢুক্‌তে দেয় না, সেটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

জলের মধ্যের খাদ্য-কণা যখন আমিবার শরীরে প্রবেশ করে তখন সেই কণার চারিদিক ঘিরে একটু জল থাকে। আমিবার শরীর থেকে এক রকম পাচক রস বাহির হয়ে সেই জলটুকুর মধ্যে মিশে যায় এবং তাতেই খাদ্য-কণার সমস্তটা বা খানিকটাকে অল্পে অল্পে হজম ক'রে ফেলে। এইভাবে খাদ্য দ্রব্যের যেটুকু হজম হয়, তা থেকে আমিবা তার দরকারী জিনিসগুলিকে শরীরের পদার্থে পরিণত করে। সেগুলি দরকারী নয় বা যেগুলিকে হজম করতে পারে না, সেগুলি শরীরের এক পাশ দিয়ে বাহির ক'রে দেয়। এই সমস্ত কাজ আমিবা তার ইচ্ছামত শরীরের যে কোন স্থান দিয়ে করতে পারে।

অন্যান্য প্রাণীর মত আমিবা ডিম পাড়ে না, বাচ্চাও প্রসব করে না। তবে কিরূপে তার বংশ বৃদ্ধি হয়? সে বড় চমৎকার ব্যাপার। আমিবা খেয়ে খেয়ে বড় হয়, কিন্তু বড় হবার একটা সীমা আছে, তার চেয়ে আর বড় হতে পারে না। তখন তার শরীরের মধ্যের নিউক্লিয়াস বা মধ্যবস্তুটার মাঝখানটা সরু হয়ে যায়। ক্রমে সে জায়গাটা আরো সরু হতে হতে নিউক্লিয়াসটা দু'খণ্ড হয়ে যায়। প্রত্যেক খণ্ড আলগা হ'য়ে তফাৎ হ'য়ে যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মাঝখানটাও সরু হয়ে দু'খণ্ড হয়ে যায়। প্রত্যেক খণ্ডে একটা ক'রে নিউক্লিয়াস থেকে যায়।

একটা আমিবা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে দুটা ছোট ছোট পৃথক আমিবা হল। তারা আবার খেয়ে দেয়ে বড় হয়ে প্রত্যেকটা আবার ভাগ হয়ে চারটা আমিবা হল। এই রকমে ক্রমাগত তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়।

তবেই দেখ আমিবার মরণ নাই। আমিবা অমর! তাই বলে মনে কোরো না যে আমিবাকে মেরে ফেলা যায় না। ছেঁচে দিলে, পুড়িয়ে দিলে, সিদ্ধ করলে, বিষ দিলে, অন্য প্রাণীতে খেয়ে ফেল্লে, কিম্বা খাবার না পেলে, আমিবা নিশ্চয়ই মরে। কিন্তু এ সব ত আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনায় মরা, accident বা জবরদস্তি মরা। এ সবের হাত এড়ান যায়। বেঁচে থাক্‌বার জন্য যা যা দরকার—জল, বায়ু, খাদ্য, উপযুক্ত উত্তাপ,—এ সব যদি তাকে, আর কোন রকম বিপদগ্রস্ত না হয়, তবে আমিবা মরে না। আমরা এ সব সত্ত্বেও রোগ না হ'লেও বুড়ো হ'য়ে মরি। আমিবা বুড়ো হচ্ছে না। বুড়ো হবার আগেই নিজেকে দুটো শিশু করে ফেল্‌ছে। যেটা যেই বড় হচ্ছে সেটা অমনি দুটো শিশু হয়ে জীবন চালাচ্ছে, মরার হাত এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমিবার দেহের মধ্য বস্তু বা নিউক্লিয়াস আর তার চারিদিকের দেহবস্তু, এই

দুটিতে মিলে আমিবার জীবনকার্য্য চলে। একটাকে ছেড়ে আর একটা জীবনের কাজ চালাতে পারে না। এই দুটা মিলে একটা গোটা জীব। শরীরের বস্তুকে—অর্থাৎ যে বস্তু দিয়ে শরীর তৈরি, তাকে—বলে জীববস্তু; ইংরাজিতে বলে প্রোটোপ্লাসম (protoplasm)—আদি ধাতু, প্রথম ধাতু বা জীব ধাতু। নিউক্লিয়াসযুক্ত একখণ্ড জীবধাতু বা প্রোটোপ্লাসম একাই একটা গোটা জীব হতে পারে। এই দুটায় মিলে যে একটা ক্ষুদ্র গোটা জিনিস হয়, যাতে জীবনের কাজ চল্‌তে পারে, তাকে বলে সেল (cell) বা কোষ। আমিবার শরীর একটা গোটা কোষ; আমিবা এককোষী জীব। আরও অনেক এককোষী জীব আছে, তাদের দেহের চারিদিকে পাৎলা চামড়ার মত, অথবা খুব শক্ত, একটা আবরণ বা প্রাচীর থাকে। কাজেই তাদের রূপ স্থির থাকে। আমিবার দেহের কোন আবরণ নাই, তাই তারা সহজেই রূপ বদলাতে পারে।

আর একটা কথা জানা খুব দরকার। পণ্ডিতেরা আমিবার শরীর কেটে দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আমিবাকে এ রকম ভাবে দু'খণ্ড করা যায় যে তার অর্দ্ধেকটাতে নিউক্লিয়াস থাকবে না। যে খণ্ডতে নিউক্লিয়াস থাকে, সেটা বাঁচে, খায় দায়, বড় হয়, নড়ে চড়ে, আবার দ্বিখণ্ড হয়ে দুটা আমিবা হয়। যে খণ্ডটায় নিউক্লিয়াস থাকে না, সে খণ্ডটা নড়ে না, খায় না, দু ভাগ হয় না, চুপসে ছোট হয়ে মরে যায়। নিউক্লিয়াসটার ক্ষমতাতেই খাবার খেতে পারে, হজম করতে পারে ও দু'খণ্ড হতে পারে। আবার শুধুই নিউক্লিয়াসটা যদি আলাদা ক'রে নেওয়া যায়, তাতে একটুও শরীরের বস্তু প্রোটোপ্লাসম না থাকে, তবে সেটাও কিছু কর্‌তে পারে না, মরে যায়।

তোমার মেজ দাদামশাই
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশ। বৈশাখ ১৩২৮
পৃ: ২-৭

আমরা কি ঘাস খাই?

মানুষের প্রধান খাদ্য ঘাস। ঘাস খাইয়াই আমরা জীবন ধারণ করি। একথা শুনিয়া তুমি হাসিতেছ। তুমি মনে করিতেছ, আমি মাছ মাংস খাইতে ভালবাসি, তাই শাক সবজি, তরিতরকারি নিরামিষ খাবারকে ঘাস বলিতেছি। নানা রকমের গাছপালা আমরা খাই। কোন কোন গাছের পাতা ডাঁটা খাই, কোন কোন গাছের কন্দ আর মূল খাই, কোন কোন গাছের ফল খাই, কোন কোন গাছের বীজ খাই। কিন্তু এই সমস্ত শাক সবজি তরিতরকারি আমাদের প্রধান খাদ্য নয়। আর তা ছাড়া সব রকম শাক্‌সবজিকে ঘাস বলে না। ঘাস বংশীয় গাছের পাতা সরু ও লম্বা হয়। পাতার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা শিরা সব থাকে। গাছের মাঝখান হইতে ছড়ের মত একটা ডাঁটার আগায় শীষে গোছার আকারে ফুল ও ফল বা বীজ জন্মে। গাছের গোড়া হইতে সূতার মত সরু সরু অনেকগুলি শিকড় বাহির হয়।

অনেক রকমের ঘাস তোমরা দেখিয়াছ। দুর্ব্বা, মাকড়জালি, মুথা, বেণা, গন্ধবেণা, চোরকাঁটা, উলু, লোণা, কাশ, কুশ, মুঞ্জ, শর, খড়ি, খাগড়া বা নল, শ্যামা, মিঠুনে, আরও কত রকমের ঘাস আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীতে ছোট বড় প্রায় তিন হাজার জাতীয় ঘাস আছে। বাঁশও এক জাতীয় ঘাস।

তুমি ব্যস্ত হইতেছ আর বলিতেছ, "তাত বুঝ্‌লাম, কিন্তু ঘাস ত আমরা খাই না। ঘাস খায় গরু মহিষ, ছাগল হরিণ আর ঘোড়া গাধায়" তাত বটেই, ঘাস না থাকিলে, গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ ঘোড়া গাধা—এমনকি হাতী, জলহস্তী আর গণ্ডারও—বাঁচিত না। ঘাস না থাকিলে পৃথিবীর অধিকাংশ পশুই মরিয়া যাইত।

তুমি আবার বিরক্ত হইতেছ আর গজগজ্ করিয়া বলিতেছ, "হাঁ, ভারি ত কথা। ঘাস না থাক্‌লে বাঘ সিংহ, আর যে সব পশু মাংস খায়, তারাও বুঝি মরে যেত?" বাঘ সিংহ প্রভৃতি খায় কি? তাহারাও ত ঐ ছাগল গরু প্রভৃতি ঘাস-খেকো জন্তুর মাংস খাইয়াই বাঁচে। যদি ঘাস-খেকো জন্তুরা ঘাসের অভাবে মারা যায়, তবে বাঘ সিংহ প্রভৃতি বাঁচিবে কি খাইয়া? তাহারাও মরিবে।

এখন তোমার মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, তুমি বলিতেছ "ও বুঝেছি, আমরা গরুর দুধ খাই আর ছাগল ভেড়ার মাংস খাই কিনা, তাই বুঝি বলা হচ্ছে ঘাসই আমাদের প্রধান খাদ্য।" আমি ওরকম ঘোরফেরের কথাও বলিতেছি না। ঘোরফের হিসাবে সকলেই ঘাস খায়, কারণ যে সব লোক মাছ মাংসও খায় না তাহারাও দুধ খায়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই, কেহ গরুর দুধ, কেহ হরিণের দুধ, কেহ ছাগল ভেড়ার

দুধ, আর কেহবা ঘোড়া আর উটের দুধ খায়। কিন্তু আমি বলিতেছি যে জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোককেই সোজাসুজি ঘাসের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ঘাস ত অনেক রকমের আছে। সব রকমের ঘাসই মানুষ খায় না। কোন পশুতেই সব রকমের ঘাস খায় না। অনেক ঘাস আছে গরুতে তা ছোঁয়ও না। কোন কোন ঘাস হরিণে আর ছাগলে খায়, অথচ গরুতে খায় না। অনেক ঘাসখেকো প্রাণী আছে, তারা ঘাসের পাতা খায় না, শিকড় খায়। কোন কোন প্রাণী ঘাসের পাতাও খায় না, শিকড়ও খায় না, ঘাসের বীজ খায়। আবার অনেক প্রাণী, ডাঁটা পাতা বীজ খায়, শিকড় খায় না। মানুষে ঘাসের বীজ খায়।

যে সব ঘাসের বীজ মানুষে খায়, সে সব ঘাস তারা ক্ষেতে চাষ করে। ক্ষেত ভাল করিয়া চষিয়া, তাহাতে সেই সব ঘাসের বীজ বুনিয়া, কত যত্ন করিয়া গাছ জন্মায়। গাছ বড় হইলে তাহার ভিতর হইতে শীষ বাহির হয়, সেই শীষের আগায় লম্বা গোছার আকারে ফুল ও ফল বা বীজ হয়। বীজ পাকিলে পর গাছশুদ্ধ কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া আনে। পরে আঁটিগুলিকে ঝাড়িয়া বীজগুলিকে পৃথক করিয়া লয়। গাছের পাকা বীজকে বলে 'শস্য'। বীজের উপর যে খোলা থাকে তাহাকে বলে 'তূষ'। তূষযুক্ত বীজকে বলে 'ধান্য' বা ধান। ঢেঁকিতে ভানিয়া বা অন্য কোনো প্রকারে নিস্তূষ বা তূষ ছাড়া করিলে সেই দানাকে বলে 'তণ্ডুল' বা চাউল। তণ্ডুলকে সিদ্ধ করিলে হয় 'অন্ন' বা ভাত। সেই ভাত আমরা খাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলের এবং ব্রহ্ম, শ্যাম, ও চীন জাপান দেশের লোকের প্রধান খাদ্য ধানের চালের ভাত। ভাত ছাড়া অন্য রকমেও আমরা ধান খাই। ধানকে স্বল্প সিদ্ধ করিয়া কুটিয়া 'চিড়া' করি, ধান ভাজিয়া 'খই' করি। চাউল ভাজিয়া 'মুড়ি' আর 'চাল ভাজা' করি। চাল গুঁড়া করিয়া সেই ময়দা দিয়া নানা প্রকার পিঠা করিয়া খাই। ধান নানা জাতেব হয়। তাদের বীজও সরু মোটা, লম্বা গোল, সাদা, লাল, নানা রকমের হয়। কোন কোন জাতের ধানে লম্বা শক্ত শূঁয়া থাকে, কোন কোন জাতের বীজে শূঁয়া থাকে না। একবার এক সাহেব বাঙ্গলা দেশের নানা স্থান হইতে প্রায় চার হাজার রকমের ধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যে আরও কত রকমের ধান আছে তার সংখ্যা নাই।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই কোনো না কোনো রকমের ঘাসের বীজ, হয় সিদ্ধ ভাত করিয়া, না হয় গুঁড়াইয়া ময়দা করিয়া রুটি চাপাটি বা পিঠা বানাইয়া, না হয় তপ্ত বালিতে ভাজিয়া খই অথবা ভাজা বীজ গুঁড়াইয়া ছাতু করিয়া খায়।

বুনো ধানকে সংস্কৃতে 'নীবার' বলে। বাঙ্গলায় বলে উড়ি ধান। ক্ষেতে চাষ করা ভাল ধানকে সংস্কৃতে 'শালি ধান্য' বলে।

আমাদের দেশের এই সকল শালিধানকে প্রধান তিন দলে ভাগ করা যায়— আউস, আমোন, আর বোরো। অল্প সময়ের মধ্যে গাছ গজাইয়া যে ধান পাকিয়া উঠে, তাহার নাম আশুধান্য বা আউস ধান। আউস ধানের চাউল প্রায়ই মোটা হয়, সহজে

হজম হয় না। দাম সস্তা, তাই গরীব লোকে আদর করিয়া খায়। 'বাবু' লোকেরা বড় একটা খায় না। উঁচু জমিতে, যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায় না, সেই ক্ষেতে চাষ করিয়া বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টির আরম্ভেই বীজ ছিটাইয়া বুনিয়া দেয়। তারপর গাছ গজাইয়া শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে যখন ধান পাকে, তখন কাটা হয়। বর্ষাকালে ভাল বৃষ্টি না হইলেও এই ধানের ক্ষতি হয় না। আমোন ধানের চাউল সরু হয়, তাহার ভাতও সহজে হজম হয়। আষাঢ় মাসে একটা ক্ষেতে অনেক বীজ ছড়াইয়া ছোট চারা করিতে হয়। তারপর সেই সব চারা তুলিয়া তিন চারিটা একত্র গোছা করিয়া জলা কাদা জমিতে রোপিতে হয়। চারি দিকে আল্ দিয়া ক্ষেতে বর্ষার জল আট্‌কাইয়া রাখিতে হয়। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে বীজ পাকিলে ধান কাটা হয়। বোরো ধান জলা জমিতে জন্মে। ইহার চাউল মোটা ও নিকৃষ্ট। চৈত্র মাসে বোনে, আষাঢ় মাসে কাটে।

নানারকম ধানের নানারকম নাম। কয়েক রকম আমন ধানের নাম বলিতেছি, শুন— সুন্দরশালি, রামশালি, কেলেসরু, গোপালভোগ, বাদশাভোগ, খেজুরছড়ি, বাঁকতুলশী, বাঁশমতি, রাজভোগ, কনকচুর, পেশওয়ারি, গোবিন্দভোগ, কামিনী, রাঁধুণীপাগল, লক্ষ্মীবিলাস, রূপশাল, পাশকাটি, বেগুনবিচি, বাঁকচুর, ভোজরাজ, পবমান্নশালি, লাউপালা, বাঁশগজাল।—আরও কত আছে।

মানুষের আর একটি প্রধান খাদ্য ঘাসের নাম 'গম'— সংস্কৃতে বলে 'গোধূম'। গমও নানা জাতের হয়, তাদের বীজও নানা রকম। গমের চাউল করিয়া ভাত রাঁধিয়া খায় না। উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় লোকের, এবং আরও পশ্চিমে আফ্রিকা পর্য্যন্ত নানা দেশের লোকদের, প্রধান খাদ্য গমের ময়দার রুটি বা চাপাটি। পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইউরোপীয় লোকের বাস, প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদেরও প্রধান খাদ্য গমের ময়দার পাঁউরুটি। যে সব স্থান শুষ্ক, যেখানে বেশী বর্ষা হয় না, সেই সব স্থানেই গম হয়। আমাদের দেশে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বরের মধ্যে গমের বীজ বোনা হয়, আর জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে শস্য কাটিয়া আনা হয়। গমের ময়দা জলে দলিয়া তারপর হাতে সরু সরু করিয়া পাকাইলে তাহাকে 'চষি' বা 'সেমাই' বলে। এই চষি দিয়া বেশ ভাল পায়স হয়। রোদে শুকাইয়া লইলে অনেকদিন থাকে। বাজারে যে নানা আকারের বিলাতি 'ম্যাকারোনি' 'ভার্ম্মিসেলি' প্রভৃতি বিক্রয় হয়, সেগুলিও এই জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমেরিকা হইতে টিনের কৌটায় ভরা রংচঙ্গে লেবেল মারা 'পাফ্‌ট্ রাইস্' (Puffed Rice) পপ্‌কর্ণ্ (Pop-Corn) প্রভৃতির নাম দেওয়া খই আর মুড়ি আজকাল বাজারে বিক্রয় হয়। লোকে দু'তিন পয়সার খই বা মুড়ি বিলাতী নাম দেখিয়া আট আনা বার আনা দিয়া কিনিয়া আনে।

আর এক রকম ঘাস, যাহার চাষ নানা দেশে হয়, তাহার নাম 'যব'— ইংরাজিতে বলে বার্লি (Barley)। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প পরিমাণে যবের চাষ হয়। ইউরোপের লোকেরা যবের তূষ বাহির করিয়া যবের চাউল বা দানা করে। যবের

দানাকে ইংরাজিতে (Pearl Barley) 'পার্ল বার্লি' বলে। এই দানা জলে বা দুধে সিদ্ধ করিয়া নুন বা চিনি দিয়া খায়। আমাদের দেশে যবের ময়দা ও ছাতু করে যবের ময়দা জলে সিদ্ধ করিয়া যে যবের মণ্ড হয়, আমাদের দেশে তাহা রোগীর পথ্য। অসুখের সময়ে যে বার্লির গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড খাও, সেও যবের ময়দার মণ্ড। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যত বার্লি উৎপন্ন হয়, তার অধিকাংশ দিয়া তাহারা মদ তৈয়ার করিয়া খায়।



যবের মত আর একটা ঘাস আছে তাহাকে বলে "জই"; ইংরাজিতে বলে (Oats) ওট্স্। এদেশেও জই এর চাষ হয়। কিন্তু সে দানা ঘোড়াকে খাইতে দেওয়া হয়। জই খুব পুষ্টিকর, কিন্তু সহজে হজম হয় না। ইউরোপের অনেক স্থানে, বিশেষতঃ স্কট্ল্যাণ্ড দেশের লোকেরা জই এর দানা সিদ্ধ করিয়া নুন বা চিনি দিয়া খায়। তাহাকে বলে 'ওট্মীল পরিজ্' (Oatmeal Porridge)।

ভুট্টাও এক রকম ঘাস। ডাঁটার গাঁইট হইতে যে ছোট মোচার মত জিনিষ বাহির হয়, তাহারই গায়ে ফলের দানা সব থাকে। ভুট্টা না পাকিলে মোচা হইতে দানা বাহির করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে অনেক স্থানে ভুট্টার খই করিয়া বা ছাতু করিয়া বা কাঁচা ভুট্টা আগুনে পোড়াইয়া খায়। ভুট্টা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। আমেরিকায় ভুট্টা হইতে যে ময়দা তৈয়ার করে, তাহাকে বলে (Corn Flour) কর্ণ্ ফ্লাওয়ার।

আমাদের দেশে আরও অনেক প্রকারের ঘাসের চাষ হয়, তার বীজ লোকে খায়। যেমন—জুয়ার জোয়ারী বা জনেরা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, মাদ্রাজে, বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইহার চাষ হয়। জুয়ার সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। জুয়ারের ময়দার রুটি বা পিঠা করিয়া অথবা ভাজিয়া খই বা ছাতু করিয়া খায়।

মাণ্ডুয়া, মারুয়া বা রাগি—ইহার ময়দায় রুটি বা পিঠা করিয়া কিম্বা ভাজিয়া ছাতু করিয়া খায়। যে সব স্থানে ধান ভাল জন্মে না, সেই সব স্থানে ইহার চাষ হয়।

চীনা ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। চীনার চাষে বর্ষার জলের বড় দরকার হয় না। চীনা শীঘ্র জন্মে, বৎসরে দুইবার ফলে, তিন মাসেই ফসল তৈয়ার হয়। চীনার চাউলের ভাত অথবা খই করিয়া লোকে খায়। গরীব চাষীর উত্তম খাদ্য।

কুটকি বা মেঞ্জরি—ইহার চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাতের মত খায়।

শামা বা ঘেরি—দেড় মাসের ভিতরেই বীজ পাকে, তাই চাষার বড় সুবিধা। ইহার চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাতের মত খায়। অথবা খই আর ছাতু করিয়া খায়।

কাঙ্গনি, কাওন বা শেয়াল লেজা—বিহার ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার ভাত. খই ও ছাতু খায়।

বাজরা—উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার গরিব লোকেরা বাজরার ময়দার রুটি বা পিঠা করিয়া অথবা ভাজিয়া ছাতু করিয়া খায়।

কোদো ঘাসের চাষ বিহার ও সাঁওতাল পরগনায় বেশী হয়। ইহার চাউলে ভাত ছাতু ও পিঠা হয়।

মানুষের আর একটি খাদ্য ঘাস—আখ। আখের বীজ খাই না, আখের ডাঁটার মিষ্ট রস খাই। আখের ডাঁটা পিষিয়া রস বাহির করিয়া, সেই রস জ্বাল দিয়া গুড় আর চিনি করিয়া খাই। গুড় আর চিনি মানুষে বড় কম খায় না।

সন্দেশ। ভাদ্র ১৩২৭। পৃঃ ১৪১-১৪৪

উই - এর কথা

তোমার মেজ দাদা মহাশয়

ভাই সন্দেশ,

উই-এর দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া গেলাম। বই খাতা কাগজপত্র সব খাইয়া নাশ করিল। বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাঁধান দামী বই কত যত্ন করিয়া আলমারিতে রাখিয়াছি, মাঝে মাঝে সেগুলিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেই, সাত আট দিন না দেখিলেই—সর্ব্বনাশ। বাহির হইতে দেখি বইগুলি বেশ আছে। একটা বই বাহির করিয়া দেখি উপরের মলাটখানি বেশ আছে, ভিতরটা সব মাটীর তাল হইয়া আছে, কাগজ আর নাই। সেই মাটীর মধ্যে নানা গর্ত্তে আর সুড়ঙ্গে উই এর দল বেড়াইতেছে। মেঝের উপর বইখানিকে ঝাড়িলে, উইগুলি মাটীতে পড়িয়া পিল্ পিল্ করে। জুতা দিয়া ঘসিয়া কত যে উই মারি, তাতেও উই কমে না। একটা বই খাইয়া তার মলাট ফুটা করিয়া পাশের অন্য বইএ ঢুকিয়া তার ভিতরের সব খায়। দেয়ালের গায়ে যে সব সেল্ফ আছে, তার বই রক্ষা করা দায়। দেয়ালে আলকাতরা মাখাইয়া, ফেনাইল মাখাইয়া, তাহার উপর সেল্ফগুলি বসাইলাম। মাসখানেক বেশ রহিল, তারপর দেখি সেই আলকাতরা মাখান দেয়ালের এক জায়গায় ফুটা করিয়া দেয়ালের ভিতর হইতে উই বাহির হইয়া, দড়ির মত সরু মাটীর নলের রাস্তা বানাইয়া, দেয়াল বাহিয়া সেল্ফের দিকে আসিতেছে।



সেই মাটীর নল সমস্তটা ভাঙ্গিয়া দিলাম, দেয়ালের ছিদ্রে কার্ব্বলিক এসিড মাখাইয়া দিলাম। দু'দিন পরে দেখি তার পাশে অন্য এক স্থানে ছিদ্র করিয়া উই বাহির হইয়া মাটীর নলের রাস্তা বানাইয়া আবার সেল্ফের দিকে আসিতেছে। ইতি মধ্যে, অন্য দল

সেল্‌ফের আড়ালে পিছন দিক হইতে বাহির হইয়া বইতে ঢুকিয়া সব খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তারপর দেয়াল থেকে একটু তফাতে, চার আঙ্গুল দূরে, সেল্‌ফটা বসাইলাম। অনেকদিন তাহাতে উই লাগিল না, মনে করিলাম এইবার উই বই নষ্ট করিতে পারিবে না। একদিন তাড়াতাড়িতে একতাড়া কাগজ সেল্‌ফের মাথায় রাখিয়াছিলাম। সেই কাগজের একমুড়া দেয়ালে ঠেকিয়াছিল। কয়েকদিন পরে সেই কাগজের তাড়া নিতে গিয়া দেখি, কাগজের পাশের দেয়াল থেকে উই রাস্তা করিয়া কাগজের উপর আসিয়া সে তাড়াটা ত খাইয়াছেই, সেখান হইতে আবার অন্য বইতে গিয়া তারও দু চারিটা খাইয়াছে।



মসৃণ 'টিন্' ও কাচের পাতের উপর বই বসাইয়া দেখিয়াছি। উই টিন ও কাচের উপর দিয়া মাটীর রাস্তা বানাইয়া চলিয়া আসিয়া বই খাইয়াছে। কোন জিনিষের উপর দিয়া চলিবার সময়ে ঠিক সেই জিনিষের গায়ের উপর দিয়া হাটে না। যে পথে চলিবে সে পথে সেই জিনিষটার উপর মাটী পাতিয়া একটা আস্তরণ করিয়া লয়। সেই আস্তরণের উপর সুড়ঙ্গ পথ বানাইয়া চলে। তাতে চলিবার সুবিধা হয়, পা পিছলাইয়া যায় না। কাচের বোতলের উপর উই ঐরকমে উঠে। আমার সেল্‌ফের উপরের একটা বোতলে উই লাগিয়াছিল। ছবিতে দেখ বোতলের গায়ে উইয়ের মাটী কেমন লাগিয়া আছে। ঝাড়িলে রগড়াইয়াঁও সে মাটী তুলিতে পারা যায় না। (২নং ছবি দেখ)। একবার এক কাগজে পড়িয়াছিলাম নুন দিলে উই আসে না, নোনা যায়গায় উই থাকে না। বইগুলো ত আর নুনের জলে ডুবাইতে পারি না। তাই সেল্‌ফের কাঠে নুনগোলা জল মাখাইলাম। ব্লটিং কাগজ, নুনজলে ভিজাইয়া শুকাইয়া, বই এর তলে আর আশে পাশে দিলাম। নুন মাখান ব্লটিং কাগজের উপর দিয়া উই, মাটীর রাস্তা বানাইয়া, আসিয়া বই ধরিয়াছে। বিষ খাইলে উই মরে। বই এর পাতাগুলি যদি বিষ মাখান হয়, হয়ত উই তা খাইবে না। কিন্তু সেরকম করায় যে নিজেরও বিপদ। আমাদের বাড়ীর দরজা জানলা, চৌকাঠ, বীম বরগায় যে সবুজ রং মাখান থাকে তাহা বিষ। অথচ উইরা তাহার উপর দিয়া রাস্তা বানাইয়া চলিয়া যায়। যেখানে সুবিধা পায় সেখানে ফুটা করিয়া কাঠের মধ্যে ঢুকিয়া, কাঠের ভিতরটা খাইয়া ফেলে।

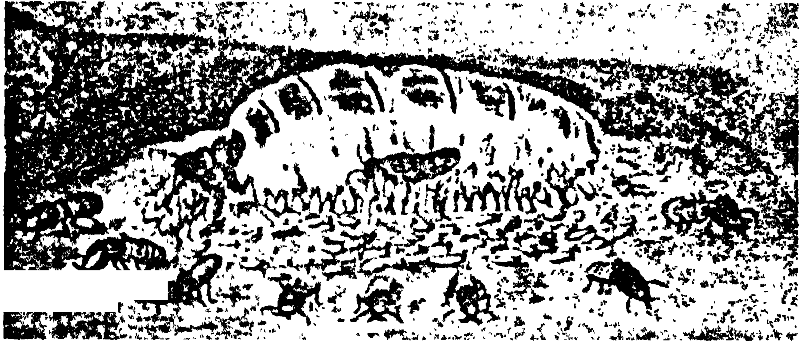
দড়ির মত, দেয়াল বা কাঠ বাহিয়া যে উই এর মাটীর নল যাইতে দেখা যায়, তাহা

উই এর বাসা নয়। সেগুলি উইদের খাবার সন্ধানে যাইবার আসিবার ঢাকা পথ। উই দেখিতে অনেকটা পিঁপড়ার মত। তাদের বাসা ও ঘরদুয়ারও পিঁপড়ার মত তাই ইংরাজিতে উইকে বলে 'হোয়াইট আন্টস্' (white ants) অর্থাৎ সাদা পিঁপড়ে। ইহারা মোটেই পিঁপড়ার জাত নয়। ভিন্ন জাত। বৈজ্ঞানিক নাম—টার্মাইট্ (termite)। অন্ধকারে থাকে বলিয়া ইহাদের গায়ের রং সাদা হইয়াছে। দেহটাও খুব নরম। পিঁপড়া আলোয় ঘুরিয়া বেড়ায় বলিযা পিঁপড়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। উই বাহিরে আলোতে বেড়ায় না, আলো পছন্দ করে না, অন্ধকারেই থাকে, অন্ধকারেই চলা ফেরা করে। মাটীর মধ্যে, প্রাচীরের মধ্যে, কাঠের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া যাতায়াত করে ও সেই অন্ধকারেই তাহারা খায়। যদি বা খাবার খোঁজে বাহিরে আসিতে হয়, তবে মাটীর সরু চোঙ্গ বা নলের মত ঢাকা পথ বানাইয়া সেই অন্ধকার পথে যাতায়াত করে।

উই এর বাসা থাকে মাটীর নীচে। সেই বাসায় অনেক কুঠরি ও সুড়ঙ্গ পথ থাকে। বাসার ভিতরে মধ্যস্থলে এক ঘরে সাধারণতঃ একটি পূর্ণাবয়ব স্ত্রী ও একটি পুরুষ থাকে। ইহাদের পাখা হয়েছিল, খসিয়া গিয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকটি 'রাণী' ও পুরুষটাকে 'রাজা' বলে। উই রাণীর পেটে এত ডিম জন্মায় যে পেটটা বেজায় বড় হইয়া যায়। রাণী নড়িতে চড়িতে পারেন না। একস্থানে পড়িয়া কেবলই ডিম পাড়েন। রাজা কেবল খান ও রাণীর সঙ্গে থাকেন। বাসায় কতকগুলি অপূর্ণ-দেহ স্ত্রী ও পুরুষ উই থাকে। আর একরকমের অনেক উই থাকে তাদেরও দেহ অপূর্ণ; তাদের কখনও পাখা গজায় না। তাদের বলে 'কর্ম্মী' উই। দু'রকমের কর্ম্মী উই দেখা যায়। একরকম একটু ছোট আর একরকম একটু বড় হয়। বড় কর্ম্মীদের মাথা ও চোয়াল বেশ বড় হয়, তাদের বলে 'সৈনিক'। এদের কাজ পাহারা দেওয়া। ছোট কর্ম্মীদের চোয়াল ছোট হইলেও শক্ত ও ধারাল তা দিয়া কাঠ কাটিয়া খাইতে পারে। কোন কোন জাতির সৈনিক উইদের চোয়াল এত বড় ও বাঁকা হয় যে তাহারা কাঠ কাটিতে পারে না। তাহারা অনেক সময়ে অনাহারে থাকে। মাঝে মাঝে ক্ষুধার জ্বালায় হঠাৎ রাগিয়া গিয়া নিজেদের মধ্যের উইদের কামড়াইয়া মারে ও খায়। ইহারা যে কি কাজ করে বোঝাই যায় না। ছোট 'কর্ম্মীর' দলই বাসায় সব কাজ করে। তারা বাসা বানায়, বাসা মেরামত করে, খাবার সংগ্রহ করে, রাণী ডিম পাড়িলে, সেগুলিকে মুখে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখিয়া দেয়, যত্ন করে; ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলে তাহাদের খাওয়ায়; রাণীমাকে খাওয়ায়, তার সেবা করে, সৈনিকদের খাবার যোগায়, অপর পুরুষ ও স্ত্রী উইদের খাওয়ায় ও যত্ন করে। এই কর্ম্মী উই এর দলই আমাদের জিনিষপত্র খাইয়া নাশ করে। স্ত্রী ও পুরুষেরা কোন ক্ষতি করে না, তাহাবা বাসার বাহিরেও আসে না। ডিম ফুটিয়া যে সব বাচ্চা বাহির হয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের খাবার খাওয়াইয়া, তাদের নানারকমের ভেদ ও পূর্ণতা সম্পাদন করে। একরকম খাবার দিলে বাচ্চারা আর বাড়িতে পারে না, আজন্মই তাহারা বাল্যাবস্থায় থাকিয়া

যায়। অন্যরকম খাবার দিলে বাল্যাবস্থা হইতে তাহাদের যৌবন ও পূর্ণাবস্থা হয়। কর্ম্মীরাও বাড়ে না, তাদের শরীরে আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, আজন্ম একইরকম থাকিয়া যায়। কর্ম্মীরা জানে কখন কাহাকে কিরূপ খাদ্য দিতে হইবে, বাসায় কোন্‌রকমের কতগুলি পুষিয়া রাখিতে হইবে; কখন স্ত্রী ও পুরুষদের দলকে বাসা হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। বৎসরের কোন কোন সময়ে দেখা যায়, বাগান, উঠান, বা ঘরের মেঝের কোণ বা দেওয়ালের ছিদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখাওয়ালা উই বাহির হইতেছে। ইহারাই স্ত্রী ও পুরুষ উই, পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাদের পাখা গজাইয়াছে। বই আর কাঠ-খেকো কর্ম্মী উইদের কখনও পাখা গজায় না। পুরুষ আর স্ত্রী উইদের পাখা গজাইলে তাহারা মাটীর নীচের বাসা হইতে কোন সুড়ঙ্গ পথে মাটীর উপরের ছিদ্র দিয়া সকলে বাহির হইয়া যায়। যখন এই উই এর দল বাহির হয় তখন দেখিতে ভারি চমৎকার। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত বাহির হইতেছে। পরে বাহির হওয়া শেষ হইলে কর্ম্মী উইরা অনেক সময়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়। গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই কতকগুলি কিয়ৎকাল উড়িতে পারে না, সেইখানেই মাটিতে ঘুরিতে থাকে, তখন দলে দলে ব্যাং, পিঁপড়ে, গিরগিটি, টিক্‌টিকি, পাখী প্রভৃতি সেইখানে আসিয়া জড় হয় আর তাহাদের ধরিয়া খায়। যাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িয়া যায় তাহাদেরও নিস্তার নাই। কাক, দোয়েল, ফিঙ্গা আরও কত রকমের পাখী, চামচিকা প্রভৃতি তাহাদের আকাশেই ধরিয়া খায়। যাহারা উড়িয়া আবার মাটিতে পড়ে তাদেরও অনেকে মাটীতে শত্রুর হাতে মারা পড়ে, অনেকে জলে পড়িয়া মরে, অনেকে আগুনে পড়িয়া মরে। অতগুলির মধ্যে দৈবাৎ দু চারিটি স্ত্রী ও পুরুষ উই বাঁচিয়া যায়। মাটীতে পড়িয়াই ইহারা নিজের পাখা নিজেরাই টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। তখন পাখার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তাহা কেবল ভার ও বাধাই জন্মায়। পাখা ছিঁড়িয়া যোড়া যোড়া স্ত্রী ও পুরুষ উই আবার নূতন জায়গায় মাটীতে গর্ত্ত করিয়া ঢুকিয়া পড়ে ও সেখানে নূতন বাসা ও পরিবার স্থাপন করে। কেহ কেহ বলেন পাখাওয়ালা স্ত্রী ও পুরুষ উই যখন মাটীতে পড়ে তখন সেখানে কাছে যদি সেই জাতির কর্ম্মী-উইরা থাকে তবে তাহারা ইহাদিগকে যত্ন করিয়া টানিয়া তাহাদের বাসায় লইয়া যায় বা ইহাদের লইয়া নূতন বাসা স্থাপন করে ও আপনাদের নূতন বাসার 'রাজা' ও 'রাণী' বলিয়া গ্রহণ করে। এটা কতদূর সত্য ও সম্ভবপর বলা যায় না। প্রথমত: স্ত্রী উই, পুরুষের মতই বড় থাকে। ক্রমে তার পেটে ডিম জন্মাইতে থাকিলে তার পেটটা মাথা ও বুকের তুলনায় বেজায় বড় হইয়া উঠে। যে স্ত্রী উই প্রথমতঃ পৌণে এক ইঞ্চ ছিল সেটা জাতিভেদে ৩ ইঞ্চ ৪ ইঞ্চ এমন কি ৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া যায়। 'রাণী' খুব বড় হওয়াতে নড়িতে চড়িতে পারে না একস্থানেই পড়িয়া থাকে। কর্ম্মী উইরা তাহার জন্য মাটীর মধ্যে একটা ঘর করিয়া দেয়। সেই ঘরেই রাণী থাকে, সেই ঘরে যাইবার জন্য অনেকগুলি সরু পথ বা সুড়ঙ্গ থাকে। সে পথ এত সরু যে তাহাতে কেবল কর্ম্মীরাই

যাতায়াত করিতে পারে। পুরুষ বা রাজাটা রাণীর ঘরেই থাকে বা পাশের কোন ঘরে থাকে। প্রয়োজন হইলে সে ঘর হইতে সুড়ঙ্গ পথে রাণীর ঘরে আইসে। রাণীকে যত্ন করিবার জন্য ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই ঘরে সর্ব্বদা একদল সৈনিক ও কর্ম্মী হাজির থাকে। (৩ নং ছবি দেখ)। অন্য কর্ম্মীর দল কেহ খাবার আনিয়া দেয়, কেহ ডিম বহন করিয়া লইয়া যায়, কেহ ঘর পরিষ্কার করে, আবর্জ্জনা দূর করে। অপর দল খাবার খোঁজে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বা মাটীর নলের রাস্তা করিয়া অনেক দূরে



নানাস্থানে যায়।

কোন গতিকে রাণী মারা গেলে ভাবি বিপদ, সমস্ত সংসারটাই লোপ পায়। তাই ইহারা বাসাতে রাজা রাণী ছাড়াও কয়েকটা স্ত্রী আর পুরুষ উই ধরিয়া রাখে। তাদের ডানা ঈষৎ গজায়, পূরা গজায় না। তারা তখন অপূর্ণ-দেহ থাকে। হঠাৎ দরকার হইলে তাড়াতাড়ি বাড়িয়া রাজা রাণীর মত দেহের পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। বোধ হয় খাবারের গুণেই কোন সময়ে তাহাদের কি খাওয়াইতে হইবে।

যাঁকে 'রাণী' বলিতেছি, তিনি মোটেই রাণী নন। তাঁর কোন হুকুম নাই। তিনি এক যায়গায় আটক থাকেন আর ডিম পাড়েন। যখন যেখানে যাহা করিবার দরকার তাহা কর্ম্মীরাই করে। তবে রাণী যদি মরে তবে সে দলটির ধ্বংস হয়।

আমরা ঘরের যত কর্ম্মী উই মারি না কেন, উই এর উৎপাত কমাইতে পারি না, তাহার কারণ ঘরের মেঝের তলায়, দেয়ালের ভিতর, উঠানে বা বাগানে মাটীর তলায় উই এর বাসা আছে। 'রাণী' ও সেখানে ক্রমাগত হাজার হাজার ডিম পাড়িতেছেন আর বংশ বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি মিনিটে ষাট-টা, আর দিনে আশি হাজার ডিম পাড়েন। উই এর দু-যোড়া পাখা গজায়। পাখা দু-যোড়া খুব পাৎলা, স্বচ্ছ ও শিরাল। উপর আর নীচের দুটি পাখাই সমান। তাই এই দলের পতঙ্গের নামহইয়াছে 'সমপত্রী' (Isoptera)। উই নানা জাতির। একটা সরু কাঠিতে কতকগুলি গোল মুক্তা গাঁথিলে

যেমন দেখায় উইয়ের শূঁয়া দুটি অনুবীক্ষণের তলায় সেই রকম দেখায়। ইহাদের শূঁয়া মালার আকার। কোন কোন জাতির শূঁয়ায় ১৩টা ছোট পুঁথির মত গোল অংশ থাকে, কোন জাতির ১৫টা কোন জাতির ১৭টা কোন কোন জাতির ২১টা পর্য্যন্ত থাকে। কোন কোন জাতির উই এর সৈনিকদের মাথা চৌকোণা, কোন কোন জাতির গোল, কোন কোন জাতির ডিম্বাকার হয়। তাদের চোয়াল দাঁতও ভিন্ন ভিন্ন। এই সব দেখিয়া তাদের জাতি স্থির করা যায়।



কোন কোন জাতির উই, বাসার উপর উঁচু মাটীর 'ঢিবি' তৈয়ার করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ঢিবিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। কারু ঢিবি গুম্বজের মত, কারু মোচার মত, কারু মন্দিরের সরু চুড়ার মত। কারু ঢিবিতে ফাঁক বা গর্ত্ত থাকে, কারু ঢিবি বন্ধ থাকে। কারু ঢিবির মাটী নরম, চাপিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। কারু ঢিবি এত শক্ত যে তার উপরে চড়িয়া লাফাইলেও ভাঙ্গে না। তা থেকে ইটের মত থান কাটিয়া লইয়া ঘরের দেয়াল তৈয়ার করা যায়। কারু ঢিবি ছোট ছোট হয়, কারু ঢিবি ৮/১০ ফুট উঁচু হয়। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে ঐ রকমের উই এর ঢিবি ১৪/১৫ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। একই জাতির ঢিবি পতিত মাঠে খুব উঁচু হয়, চাষ জমিতে খুব ছোট ছোট হয়, অথবা হয়ই না। কোন কোন জাতি ঢিবি তৈয়ার করে না।

আমি উড়িষ্যায় থাকিবার সময়ে আমার বাগানের এক উই এর ঢিবি খুঁড়িয়া মাটীর ৩/৪ ফুট তল থাকে, রাণী-মা শুদ্ধ রাণীমার বাসা পাইয়াছিলাম। সে বাসার পাশে একটা খোপে স্পঞ্জের মত গর্ত্ত গর্ত্ত করা একটা নরম মাটীর দলা পাইয়াছিলাম। সেটা উইদের চাষবাগান। ইংরাজিতে বলে 'ফঙ্গস্ বেড্' (fungus bed) অর্থাৎ এর গায়ে একরকম ছোট্ট জাতের 'ছাতা' (ছত্রক) জন্মে, উইরা তাহা খায়। রাণীমার ঘরের মাটী শক্ত ও শুকনা। এ দলাটার মাটী নরম ও স্যাঁতসেঁতে। বোঁধ হয় উহারা ঘাস পাতা খড়

কাঠ খাইয়া উগ্‌রাইয়া দিলে যে পদার্থ হয়, তাই দিয়া এই দল বা 'বাগান' তৈয়ারি। এ জিনিষে নানা জাতের 'ছাতা' জন্মিতে পারে, কিন্তু উহারা আর সব বেছে ফেলে, বিশেষ এক জাতের 'ছাতা', যা তাদের প্রিয় খাদ্য, তাই আবাদ করে। সব জাতের উই (fungus bed) করে না। যে সব জাতের উই ঢিবি তৈয়ার করে তারাই প্রায় এরূপ fungus bed করে।

দেয়াল বা কাঠের গায়ে দড়ির মত যে উইয়ের সুড়ঙ্গ পথ যায়, তার কোন জাতির সরু, কোন জাতির একটু মোটা হয়। উইতে কাঠ খাইলে কাঠের ভিতরে, যেসব গভীর গর্ত্তযুক্ত খাঁজ পড়ে সে সবের একটা বিশেষ ধরণের আকৃতি বা নক্সা হয়। তাকে ইংরাজিতে বলে ফীডিং ফিগার্স (feeding figures) অর্থাৎ খাওয়ার দরুণ নক্সা। ভিন্ন ভিন্ন উই কাঠ খাইলে, গর্ত্ত বা খাঁজের নক্সা- (feeding figures) ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন জাতির শুক্‌না কাঠ প্রভৃতি খায়। কোন কোন জাতি বাগানে চাষ জমির ...ে থাকিয়া কাঁচা জিনিষ খায়। ইহারা ক্ষেতের আখ্, আলু, চীনেবাদাম, কন্দমূল প্রভৃতি খাইয়া কৃষকের ক্ষতি করে। কোন কোন জাতির উই মাঠের উপরের শুক্‌না ঘাস পাতা গোবর খায়। একবার, উড়িষ্যায় এক পরিষ্কার মাঠে সভা করিবার জন্য চাঁদোয়া টাঙ্গান হইয়াছিল। তার নীচে মাঠে সতরঞ্জি পাতিয়া তাহার উপর চেয়ার ও বেঞ্চ পাতা হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৫টার সময়ে সতরঞ্জি পাতা হয়, রাত্রি ৮ টার সময়ে সভাভঙ্গের পর তোলা হয়। তখন দেখা যায় যে, এক পাশের সতরঞ্জি উই-এ খাইয়া সাবাড় করিয়া দিয়াছে।

এক এক যায়গায় দেখি, উই, শালকাঠের খুঁটির উপর বা বাক্সের কাঠের উপর, দড়ির মত সুড়ঙ্গ বানাইয়া উঠিয়াছে। তারা খুঁটি বা তক্তার কোন ছিদ্রপথে ঢুকিয়া কাঠের ভিতর বা মধ্য হইতে খাইয়াছে। খুঁটির বা বাক্সের তক্তার বাহিরটি ঠিক আছে। আবার কোন কোন জায়গায় দেখি, শালকাঠের খুঁটির উপর, বীম বরগার উপর, বাক্সের তক্তার উপর, উয়ের মাটী, 'প্ল্যাষ্টার' বা চাদরের মত বিছান আছে, দড়ির মত নল করে নাই। ইহারা ভিন্ন জাতির। দেখিয়াছি, ইহারা মাটির চাদরের তলে, উপর থেকেই কাঠ খাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির উই এর ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে সাড়ে চারিশত জাতির উই এর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ২০/২৫ জাতির উই দেখা যায়। ইহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বা গণে বিভক্ত।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, পাখা ধরিয়া গর্ত্তের বাহির হয়। আমাদের দেশে কোন কোন জাতির উই, প্রথম বর্ষায় দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে, সকালবেলা ৮টার মধ্যে দলে দলে বাহির হয়। কোন কোন জাতি জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় বাহির হয়। কোন কোন জাতি জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় বাহির হয়। কোন কোন জাতি বর্ষার পরে সেপ্টেম্বর মাসে পাখা ধরিয়া সন্ধ্যার পর প্রথম রাত্রিতে গর্ত্তের বাহির হয়। কোন্ সময়ে পাখাওয়ালা উই

বাহির হইতেছে জানিলে, কোন্ জাতির উই ঠিক করা যায়।

কোন কোন জাতির উইদের সৈনিক, এমন কি কর্ম্মীরাও হাতে কামড়াইয়া দেয়। আমার বাসায় যে সব উই আছে তাদের আমার হাতে ও গায়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি কামড়ায় নাই। আমার ঘরে যে সব উই আছে তারা কাঠ বড় খায় না, কাগজ পত্রই খায়। এমন কি নরম দেবদারু কাঠের কয়েকটা বাক্স আছে তার কাঠ খায় নাই, তার ভিতরের কাগজ খাইয়াছে। নরম জিনিষ পাইলে শক্ত জিনিষ নাও খাইতে পারে। ঘরে দু'তিন জাতির উই দেখা যায়, তারা মাঠে থাকে না। খোলা যায়গায় মাঠে কাঠের গাদা করিয়া রাখিলে সেখানে তাতে যে সব উই লাগে তারা ভিন্ন জাতির।

সন্দেশ। অগ্রহায়ণ ১৩২৮
পৃ: ২৩৭-২৪৭

ফুলের রং ও ভ্রমর

ফুলের এত সৌন্দর্য্য কেন, এত বিচিত্র বর্ণ কেন? মানুষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে, তাই সে ফুলের আদর করে; কত যত্ন করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে ফুলগাছ লাগায়। কিন্তু লোকালয়ে বাগানে মানবচক্ষের সমক্ষে ক'টা ফুল ফোটে? নিবিড় বনে বা মরুভূমিতে যেখানে মানবের যাতায়াত নাই, সেখানেই ত যত সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। সেখানে সৌন্দর্য্যগ্রাহী কে আছে যে, এত বহুল সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হয়? ফুলের এত বর্ণবৈচিত্র্য এত সৌন্দর্য্য তবে কি অনর্থক?

বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, এ সৌন্দর্য্যের সার্থকতা আছে। উদ্ভিদ্ জাতির সন্তানোৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে পুষ্পের উজ্জ্বল বর্ণ বা সৌন্দর্য্য প্রধান সহায়। পুষ্পের যে সকল অঙ্গ উজ্জ্বলবর্ণ, সেগুলি তাহার অত্যাবশ্যক অঙ্গ না হইলেও, খুব প্রয়োজনীয় বটে।

জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও স্ত্রী পুরুষ আছে। ফুলগুলি যেন সেই স্ত্রী পুরুষের আবাসগৃহ। কোন কোন গাছের স্ত্রী পুরুষ একত্র এক বাড়ীতে থাকে, অর্থাৎ একই ফুলে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন গাছের স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক বাড়ীতে বাস করে, অর্থাৎ তাহাদের স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল পৃথক। গোলাপ, শিয়ালকাঁটা, কুমুদ, পদ্ম, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের মধ্যে দলবেষ্টিত কতকগুলি সরু সরু কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে পরাগ-কেশর বলে। পরাগকেশরবেষ্টিত পুষ্পমধ্যস্থ উন্নত অংশকে গর্ভকেশর বলে। পরাগকেশরগুলি পুরুষ। গর্ভকেশর স্ত্রী। কোন কোন গাছে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর একই ফুলে থাকে; যথা, গোলাপ, শিয়ালকাঁটা, পদ্ম, চাঁপা, বাকস, নিসিন্দা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি। আবার কোন কোন গাছে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর সেই গাছের ভিন্ন ভিন্ন ফুলে থাকে; যথা, লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গে, ভুট্টা। আবার এমনও হয় যে, একগাছে শুধু পরাগকেশরবিশিষ্ট পুরুষ ফুল ফোটে, আর অন্য গাছে শুধু গর্ভকেশর-বিশিষ্ট স্ত্রী-ফুল ফোটে। যথা, পেঁপে, পিঠুলি ইত্যাদি।

পরাগ-কেশরের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র কোষে পরাগ বা রেণু জন্মে। গর্ভকেশরের কোষে বীজাণু জন্মে। পরাগ বা রেণু গর্ভকোষের উপর পড়িলে কোষস্থিত বীজাণু পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাতে নূতন বৃক্ষোৎপাদনক্ষম বীজের উৎপত্তি হয়। পুষ্পের এই নিষেকক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়? কীট পতঙ্গ, মধুপায়ী পক্ষী ও পবন দ্বারা এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভকোষে নীত ও নিষিক্ত হইয়া ফুলের গর্ভাধানকার্য্য সম্পন্ন হয়। বহুকাল পূর্ব্বে বার্লিনের নিকট স্পাণ্ডো নগরে স্প্রেঙ্গাল নামক এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক

ছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনায় এতই মত্ত থাকিতেন যে, স্বীয়পদোচিত ধর্ম্মযাজকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার অবহেলা লক্ষিত হইত। এই দোষে তিনি পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ফুলের গর্ভাধানকার্য্যে ভ্রমর[১] যে প্রধান সহায়, তদ্বিষয়ে এই স্প্রেঙ্গাল সর্ব্বপ্রথমে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ বিষয়টা চাপা পড়িয়াছিল। পরে ডার্বিন ও তাঁহার শিষ্যেরা নূতন করিয়া ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের আলোচনা করেন। তার পর যত শুকবৎ পঠিত-পঠনের আবৃত্তি। নানা লোকে নানা ভাবে আপন আপন কল্পনা ও কবিত্বশক্তির সাহায্যে নানা রং চড়াইয়া এই কথার প্রচার করিয়াছেন। ডার্বিন ও তাঁহার শিষ্যদের আলোচনার ফল এই যে, ফুলের উজ্জ্বল বর্ণে বা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে, পরে মধুলোভে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রবেশ ও নির্গমপথে বা মধুপানসময়ে তাহার দেহে পুষ্পপরাগ লাগিয়া যায়। ভ্রমর তথা হইতে অন্য ফুলে গমন করিলে, তাহার দেহস্থিত পরাগ সেই ফুলের গর্ভকোষে নীত ও তদ্দ্বারা ঐ ফুলের গর্ভসঞ্চার হয়। আবার তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় ভ্রমর স্বদেহে সেই পুষ্পের পরাগ বহন করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে ভ্রমরেরা মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া পুষ্পের গর্ভাধানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ফুলের উজ্জ্বল বর্ণ ভ্রমরকে পথ দেখাইবার জন্য; ভ্রমর যাহাতে ফুলের নিকট আইসে, তজ্জন্য ফুল যেন সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে। আসিয়া দেখে, মধু রহিয়াছে। লুব্ধ ভ্রমর মধুপান করিবার জন্য ফুলের মধ্যে প্রবেশ করে, আর অমনি ফুলের যাহা উদ্দেশ্য (গর্ভাধান) তাহা সফল হইয়া যায়। সব ফুলের ভ্রমর সমান নহে। যে ফুলে যে ভ্রমর সচরাচর যায়, সে ফুলের আকৃতি ও গঠন সেই ভ্রমরের অনুরূপ হয়। সুতরাং একজাতীয় ফুলে অন্যজাতীয় ফুলের পরাগ পড়িবার তত সম্ভাবনা থাকে না। আবার একই ভ্রমর বহুপুষ্পগামী হইলেও ফুলগুলির এরূপ গঠন যে, তাহাতে ভ্রমরদেহে দুই তিন-জাতীয় ফুলের পরাগ থাকিলেও, যে জাতীয় ফুলে যে পরাগ পড়া উচিত, তাহাই পড়ে।

যাহা হউক, ফুলের গর্ভাধানকার্য্যে ভ্রমর প্রধান সহায়। ফুলের গর্ভাধান হইল না হইল, ভ্রমরের তাহাতে মাথা-ব্যথা কেন? ভ্রমরকে দিয়া ঐ কার্য্যসাধন করাইয়া লইবার জন্য ভ্রমরকে লোভ দেখাইতে হয়, বা ঘুস্ দিতে হয়। সেটা মধু। মধু আবার এমন ভাবে রাখিতে হয় যে, তাহা খাইতে আসিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মধু যে আছে, তা ভ্রমর জানিবে কি করিয়া? সে জন্য মোটা মোটা অক্ষরে বিজ্ঞাপনের দরকার। সেটা ফুলের উজ্জ্বল রং, অথবা সুগন্ধ। তেজালো উজ্জ্বল রং চোখে পড়িলেই ভ্রমর নিকটে আইসে। হয় পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে নিকটে মধু আছে, নতুবা শুধু সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া আইসে, যেমন পতঙ্গ দীপশিখার নিকটে আইসে; পরে মধু দেখিয়া তাহার পানে রত হয়, এবং অজ্ঞাতসারে ফুলের শুভ বেগার খাটিয়া দেয়।

ইহাই মোটামুটি প্রচলিত মত। আজকাল বিবর্ত্তনবাদ বা বিকাশবাদের দিন! ফুলের বিচিত্র বর্ণের ক্রমবিকাশ হইল ভ্রমরের পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া। ফুলের সহিত ভ্রমরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য যত লোকে যত পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্লাটোর পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষার ফলে ইহাই নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভ্রমরেরা পুষ্পের বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার এই সকল পরীক্ষার বিবরণ সময়ে সময়ে Bulletin de L'Academic Regale de Belgique নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

একহারা ড্যালহিয়া ফুলের কয়েকটা গাছে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল; অধ্যাপক প্লাটো সেই সব ফুলের উজ্জ্বলবর্ণ পাপড়িগুলি সবুজ পাতা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। তাহাতে ভ্রমরের আগমন কমিল না। ভ্রমরেরা পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে যাতায়াত করিতে লাগিল। ভ্রমরেরা ফুলের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হয়, ইহাই প্রচলিত মত। কিন্তু প্লাটো যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা সে মতের বিরুদ্ধই দাঁড়াইল। সুতরাং এ বিষয়ের আরও বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক মনে করিয়া তিনি বহুবিধ পবীক্ষার আয়োজন করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষার ফলে, পূর্ব্বের ব্যাপারই প্রতিপন্ন হইল। উজ্জ্বল বর্ণ ভ্রমরকে পুষ্পের দিকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে বিশেষ সক্ষম নহে। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমর ফুলের কাছে আসে না, তবে বৈজ্ঞানিক কবির কি দশা হইবে! তাঁহারা কত মিঠেমিঠে কথা বলিতেন।— নির্লজ্জ ফুলকুমারীদের ভ্রমর ভুলাইবার জন্য নানা সাজগোজ করা, রঙ্গ বেরঙ্গের বসনভূষণ পরা, ভ্রমরের মাথা ঘুরাইযা দিয়া তাহাকে প্রেমপিঞ্জরে বন্দী করিবার প্রয়াস,— এ সবই কি তবে পণ্ডশ্রম হইল? এ সব কল্পনা করিতেও কবির কত সুখ হইত! কবির অপেক্ষা ত দেখিতেছি ভ্রমর অনেক অধিক বুদ্ধিমান। অনেক কবি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হন, রূপের নিকট আত্মবিক্রয় করেন; ভ্রমর রূপের ভিখারী নহে।

প্লাটোর মনে প্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, ফুলের যে অংশটা সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত, সেই অংশটা ফেলিয়া দিয়া যদি অন্যান্য অংশ রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে কি ভ্রমব এইরূপ হৃতসৌন্দর্য্য লুণদল পুষ্পে আসিবে? তিনি ফুটন্ত লোবেলিয়া ফুলের গাছ-বসান দুটি টব লইলেন, তাহার প্রত্যেকটিতে ৩০।৪০ টি লোবেলিয়া ফুল ফুটিয়াছিল। একটি টবের সমস্ত ফুলের নীল পাপড়িগুলি অতি সাবধানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। অপর টবের ফুলগুলি যেমন ছিল, তেমনই রহিল। এই দুটি টব পরস্পর হইতে একটু পৃথকভাবে বাগানের এক স্থানে রাখিয়া দিলেন। তার পর নিকটে বসিয়া ভ্রমরের আগমনের হিসাব রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে গণনার ফল এই দাঁড়াইল যে, সুন্দর নীলবর্ণের সম্পূর্ণ ফুলগুলিতে ৩৩টি ভ্রমর আসিয়াছিল, আর সৌন্দর্য্যহীন ছিন্নদল ফুলে ২৫টি আসিয়াছিল।

এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ডারবিন যখন এই ফুল লইয়া এইরূপ পরীক্ষা

করিয়াছিলেন, তখন বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। লোবেলিয়ার নীল দল (বা পাপড়ি) ছিন্ন করাতে ভ্রমরের আসা বন্ধ হইয়াছিল। প্লাটো কনভলভিউলস্ (কমলজাতীয় ফুল), লার্কস্পর, ফক্সগ্লভ্, প্রিমরোজ প্রভৃতি ফুল লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা করেন, তাহার ফলও পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছিল।

উজ্জ্বল বর্ণের এমন অনেক ফুল আছে, যাহাতে ভ্রমরেরা যায় না। কেবল বর্ণ দ্বারাই যদি ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়, কোন্ ফুলে মধু আছে, তাহা জানিবার যদি তাহার অন্য উপায় থাকে, তবে ঐ সকল মধুহীন ফুলে মধু দিলে ভ্রমরের আসা উচিত। এই মনে করিয়া প্লাটো বাগানের কতকগুলি লাল রঙ্গের জিরেনিয়াম ফুলের মধ্যে একটু একটু মধু রাখিয়া দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আটটি ভোম্‌রা আসিয়া মধুমাখান ফুলগুলির উপর বসিয়া মধু খাইয়া চলিয়া গেল। পার্শ্বস্থিত মধুহীন জিরেনিয়াম ফুলগুলিতে একবার বসিলও না। ফ্লক্স, আনিমোনি, বাইণ্ডউইড্ প্রভৃতি ফুল লইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করিলেন, তাহার ফলও পূর্ব্বানুরূপ হইল।

আর এক কথা; তাঁহার মনে হইল যে, ভ্রমরেরা যদি প্রধানতঃ বর্ণসৌন্দর্য্যের দ্বারাই আকৃষ্ট না হয়, তবে তাহারা যে সকল সুন্দর ফুলে মধুপান করিতে যায়, সে সব ফুলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া অভ্যন্তর হইতে মধুকোষ উপড়াইয়া তাহাদিগকে মধুহীন করিয়া দিলে ত ভ্রমরের আগমন রহিত হইবে।

প্লাটো কতকগুলি একহারা ডালিয়া ফুলের মধ্যস্থিত মধুনিঃসারী সমস্ত উপদলগুলি সাবধানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং সেইগুলির পরিবর্ত্তে হল্‌দে রঙ্গের পাতা কুচি কুচি করিয়া সেই আকারে কাটিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন।

তিনি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, এরূপ ফুলে কোন ভ্রমরই আসিল না। পরে ঐ সকল ফুলের কৃত্রিম উপদলের উপর এক এক ফোঁটা মধু মাখাইয়া দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দলে দলে ভ্রমর আসিতে লাগিল।

এমনও ত দেখা যায় যে, যে সব গাছের ফুল খুব সামান্য ও সাদাসিদে, তাহাদের ফুলের পরাগ প্রধানতঃ বায়ুসঞ্চালনে বাহিত হইয়া গর্ভকোষে পতিত হয়। তাহাতেই বীজোৎপত্তি হয়। এই সব ফুল মনোজ্ঞদর্শন নহে, এবং ইহাদের মধু বা পরাগের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য আড়ম্বর নাই; উজ্জ্বল বর্ণের পাপ্‌ড়ি বা দল নাই। তথাপি এই শ্রেণীর অনেক ফুলে, যথা নলখাগড়া, ঘাস, চিনোপডিয়ম্ প্রভৃতিতে ভ্রমর আসে। ভ্রমরকে ফুলে আকর্ষণ করিবার পক্ষে উজ্জ্বল বর্ণ যদি একমাত্র বা প্রধান উপায় হইত, তবে এই সকল ফুলে ভ্রমর যাইত না।

প্লাটো আবার ভাবিলেন, সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইয়া যদি মধুতে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমরেরা ফুলের কাছে যায়, তবে অনুজ্জ্বল অমনোহর ফুলে মধু মাখাইয়া দিলে তাহাতে ভ্রমরের যাওয়া উচিত। তিনি পরীক্ষায় ঐ প্রকার সতের রকম ফুলে (ভাঙ্গ, বিছুটী,

চিনোপোডিয়ম, তৃণ প্রভৃতিতে) মধু মাখাইয়া দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেক রকমের ফুলেই দলে দলে ভ্রমর আসিয়াছিল।

হেলিবোর, আইভি, ফিগ্ ওয়ার্ট, সাইকামোর, র‍্যাস্পবেরি প্রভৃতির সবুজ বা মেটেরঙ্গের ফুলের ও ভ্রমর খুব যায়। ইহাতেও বুঝা যায় যে, ভ্রমরেরা সৌন্দর্য্যের দ্বারাই যে বিশেষ আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে।

অধ্যাপক প্লাটো বাগানের গাছে ফুটন্ত উজ্জ্বল বর্ণের আসল ফুলের মধ্যে কাগজ ও কাপড়ে নির্ম্মিত কৃত্রিম ফুল বসাইয়া দিলেন। এই ফুলগুলিকে দেখিয়া আসল কি নকল বুঝা যাইত না। এইরূপ ভ্রমোৎপাদক কৃত্রিম ফুলে একটিও ভ্রমর আসিল না। এই সব ফুলে মধু দেওয়া হইল, তবুও কিন্তু কোন ভ্রমর আসিল না। বোধ হয়, কাগজ বা কাপড়ের ফুলকে ইহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে, অথবা তাহা হইতে এমন একটা গন্ধ বাহির হয়, যাহা তাহাদের তত পছন্দসই নয়।

অবশেষে প্লাটো গাছের সবুজ পাতা কাটিয়া তাহা দ্বারা নানা প্রকার অভিনবদৃশ্য কৃত্রিম ফুল প্রস্তুত করিয়া সেগুলিতে একটু একটু মধু দিয়া গাছে ঝুলাইয়া দিলেন। এই সকল কৃত্রিম ফুলে অনেক ভ্রমর আসিল।

অধ্যাপক প্লাটোর এই সকল পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকা যায় না যে, "ভ্রমরেরা ফুলের উজ্জ্বল রঙ্গিন অংশ থাকা না থাকা বড় একটা গ্রাহ্য করেনা; তাহারা মধু অথবা পরাগের আকাঙ্ক্ষী, এবং ঘ্রাণশক্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়। দৃষ্টিশক্তির দ্বারা চালিত হইলেও অতি সামান্য ভাবে হয়।"

পুষ্পের উজ্জ্বলবর্ণ ভ্রমরের পথপ্রদর্শক—এ কথা যদি অস্বীকার করা যায়, আর তাহা স্বীকার করিবারও উপায় নাই,—তবে বিবর্ত্তনবাদিগণ প্রধানতঃ যাহা অবলম্বন করিয়া এত দিন খুব আড়ম্বর পূর্ব্বক জনসাধারণে ভ্রমরনির্ব্বাচন-মূলক পুষ্পোৎপত্তিবাদের প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাহার মূলে কুঠারাঘাত হয়। এই ভিত্তির উপর তাঁহারা যে Insect selection theory of the origin of flowers রূপ এক সুশোভন বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রখরপ্রভাকরকিরণসম্পাতে বাষ্পবৎ বিলীন হইয়া যায়।

সাহিত্য । বৈশাখ ১৩০৭ । পৃ. ৪২-৪৭

১. 'ভ্রমর' কথা এই প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ভ্রমর বলিলে ভোমরা, মৌমাছি, বোলতা, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি ছোটবড় সব।

আলোক—দৃশ্য ও অদৃশ্য

আলো কি? চক্ষু রূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঞ্জাত এক প্রকার অনুভূতি বা জ্ঞান। অন্ধকার ঘরে বসিয়াছিলাম, দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; ল্যাম্পটা জ্বলিল, অমনি ঘর আলোকময় হইল, যেখানে যে জিনিস সব দেখিতে লাগিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ব্যাপারখানা কি?

পদার্থ-বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক পদার্থের অণু সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে। এবং প্রত্যেক পদার্থই বিশ্বব্যাপী এক অত্যন্ত কঠিন অথচ অদৃশ্য পদার্থের মহা সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এই পদার্থের নাম 'ঈথর' বা আকাশ। পদার্থ সকলের অণুর কম্পনের ধাক্কায় 'ঈথর' বা আকাশ-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গান্দোলন সঞ্চালিত হইয়া অপর পদার্থে ধাক্কা দিলে সে পদার্থের অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠে, তাহাদের কম্পন-আঘাত পুনরায় ঈথরসমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সে তরঙ্গাঘাত আবার অন্য পদার্থের পরমাণুতে কম্পন উপস্থিত করে। এইরূপ আণবিক কম্পন ও ঈথর-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত, হ্রাস, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন পরাবর্ত্তন সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই সকল ছোট বড়, ধীর দ্রুত, নানাজাতীয় ঈথর-তরঙ্গ আমাদের ইন্দ্রিয়ে আসিয়া প্রতিহত হইয়া স্নায়ু সকলকে আঘাত করে; সেই আন্দোলন স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় ও সেই সঙ্গে মানসিক অনুভূতি জন্মে। মস্তিষ্কের আণবিক কম্পনের প্রকারভেদে মানসিক অনুভূতিরও প্রকারভেদ হয়।

ল্যাম্পের শলিতার উপরের তৈল বাতাসের অক্সিজেনের সহিত অতিবেগে মিলিত হইতেছে, তজ্জন্য অণুগুলিও খুব কম্পিত হইতেছে। তাহার ধাক্কা ঈথরে লাগিয়া তাহাতে নানাপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। সেই সকল তরঙ্গ আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিহত হইয়া তথাকার স্নায়ুসকলকে নানা প্রকারে কম্পিত করিতেছে, সেই সকল কম্পন মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ল্যাম্পের আলোকের অনুভূতি জন্মিতেছে। দীপশিখার নানাপ্রকার আণবিক কম্পন নানাপ্রকার ঈথর-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল; এই সকল তরঙ্গ টেবিল, চেয়ার, ছবি, গেলাস, বাক্স প্রভৃতির উপর প'ড়িয়া প্রতিহত হইতেছে। এই সকল পদার্থ সকল প্রকারের তরঙ্গকেই ফিরাইয়া দেয় না। প্রত্যেক আপন আপন প্রকৃতি-অনুসারে বাছাই করিয়া কতকগুলি ঢেউকে ফিরাইয়া দেয়। এই বাছাই-করা ফেরৎ-পাঠান ঢেউর প্রকারানুসারে আমাদের বর্ণবৈচিত্র্যের অনুভূতি হয়।

ঢেউ নানা প্রকারের হয়। সকল ঢেউ আমাদের সকল স্নায়ুকে সমান উত্তেজিত করিতে পারে না। কতকগুলি ঈথর-তরঙ্গ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণের অনুভূতি জন্মাইতে পারে। অনেক ঈথর তরঙ্গ আছে, যাহার আঘাতে আমাদের চক্ষুর স্নায়ু কম্পিত হয় না, তাহাতে আলোকেরও অনুভূতি হয় না। উত্তাপ, ঈথরের একপ্রকার তরঙ্গজনিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্নায়ু-কম্পনসঞ্চালিত মস্তিষ্কের আণবিক কম্পনবিশেষের আনুষঙ্গিক অনুভূতিবিশেষ। যে ঈথর-তরঙ্গে আমাদের উত্তাপের অনুভূতি জন্মায়, সে তরঙ্গে আলোকের অনুভূতি জন্মায় না। যে তরঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কম্পিত করিয়া আলোকের অনুভূতি জন্মায়, সে তরঙ্গ স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্নায়ু কম্পিত করিতে পারে না, সুতরাং তাপেরও অনুভূতি জন্মায় না।

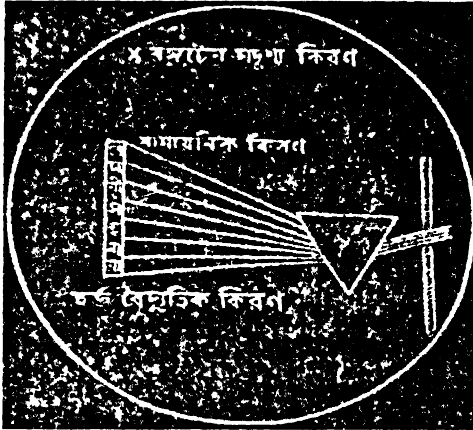
দর্শনেন্দ্রিয়ে অসংখ্য স্নায়ু আছে। সকল স্নায়ুই ঈথরের সকল তরঙ্গে কম্পিত হয় না। একজাতীয় তরঙ্গে কয়েকটিমাত্র স্নায়ু কম্পিত হইয়া পীত বর্ণের অনুভূতি জন্মায়। আর এক জাতীয় তরঙ্গে অপর কয়েকটি স্নায়ু কম্পিত হইয়া লাল বর্ণের অনুভূতি জন্মায়। অন্য একজাতীয় তরঙ্গে অন্য কয়েকটি স্নায়ু কম্পিত হইয়া নীল বর্ণের অনুভূতি জন্মায়, আবার পাঁচ রকমের তরঙ্গ আসিয়া এক সঙ্গে পাঁচ গোছা স্নায়ুকে কম্পিত করিলে পাঁচবর্ণ-মিশান এক বর্ণের অনুভূতি জন্মে। বিশেষ বিশেষ তরঙ্গমালা বা রশ্মির আঘাতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুচ্ছ "সাড়া" দেয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ বর্ণানুভূতি জন্মে। তোমার চোখে যদি এমন স্নায়ু না থাকে, যাহা নীল আলোক তরঙ্গের আঘাতে কম্পিত হইতে পারে, তবে তোমার নীলবর্ণের অনুভূতি জন্মিবে না, তুমি "নীল-কাণা" হইবে। এইরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা "লাল-কাণা" বা তোমার চোখের স্নায়ুগুলি ঈথরের কোনও প্রকার তরঙ্গের আঘাতে কম্পিত না হয় বা "সাড়া" না দেয়, তবে তুমি অন্ধ, তোমার কোনও বর্ণানুভূতি হইবে না। তোমার নিকট সবই অন্ধকার।

ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জন্মে। এমোনিয়া বা নিশাদল রসনায় ঠেকিলে তথাকার স্নায়ু সকল এক প্রকারে কম্পিত হয়, তাহাতে লবণ-স্বাদের অনুভূতি হয়। সেই এমোনিয়া নাসারন্ধ্রে ঠেকিলে তথাকার স্নায়ুগুলি অন্য প্রকারে কম্পিত হয়, তাহাতে এমোনিয়ার তীব্র ঝাঁজাল গন্ধের অনুভূতি হয়। সেই এমোনিয়া চক্ষে বা কোন ক্ষতস্থানে ঠেকিলে তথাকার স্নায়ুগুলি আর এক প্রকারে কম্পিত হইয়া জ্বালারূপ অনুভূতি উৎপন্ন করে। কোন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু যদি পীড়া প্রাপ্ত হয় বা বিকৃত হইয়া যায়, যখন তাহাতে কোন 'সাড়া' দিবার ক্ষমতা থাকে না; তখন সেই ইন্দ্রিয়পথে আমাদের মনের মধ্যে যে বিশেষ অনুভূতি জন্মিত, তাহা আর জন্মে না।

আমাদের ইন্দ্রিয় সকলই বস্তুগণের অস্তিত্বের প্রকাশক। পদার্থ সকলের আণবিক কম্পন ঈথরের তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ আসিয়া আমাদের কোনও এক ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুকে কম্পিত করে, সেই কম্পন মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইয়া মনে এক বিশেষ অনুভূতি

জন্মে, তাহাতেই পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এমন অনেক আণবিক কম্পন ও তজ্জনিত এমন অনেক ঈথর-তরঙ্গমালা বা রশ্মি থাকিতে পারে, যাহার আঘাতে আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুই কম্পিত হয় না, সুতরাং সে সকলের অস্তিত্বও আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

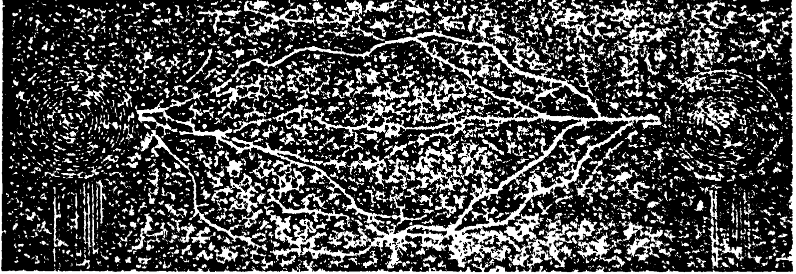
দুইটা তানপুরা বা সেতার আনিয়া এক সুরে বাঁধিয়া ঘরের দুই কোণে দুইটাকে মুখোমুখি করিয়া রাখিয়া দাও। একটা তানপুরা বা সেতারের কোনও একটা তার টানিয়া ছাড়িয়া দাও, তারটা কাঁপিতে থাকিবে ও শব্দ শুনা যাইবে। তারের কম্পনে ঘরের বায়ুতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে, সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে পরিচালিত হইতেছে, সেই বায়বীয় তরঙ্গ আঘাত আমাদের কর্ণের স্নায়ুকে কম্পিত করিলে শব্দের অনুভূতি জন্মে। তানপুরা বা সেতারের সব তার সমান কাঁপে না, সুতরাং তাহাদের কম্পনে বায়ুতে সমান বা একইরূপ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় না। আমাদের কর্ণেও অনেক স্নায়ুগুচ্ছ আছে। এক এক স্নায়ুগুচ্ছ এক এক প্রকার তরঙ্গে কম্পিত হয় ও এক এক প্রকার শব্দের অনুভূতি জন্মায়। মানুষ যেমন 'রাতকাণা' হয় তেমনি আবাব ''সুরকালা' হয়, তাদের কাণ এমনই ভোঁতা যে, নানা সুরের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে পারে না।



ঘরের এককোণের সেতারের একটা তার টানিয়া ছাড়িয়া দাও, শব্দ হইবে। অপর কোণে দ্বিতীয় সেতারের নিকট গিয়া দেখ, সে সেতারের একটি তার আপনা-আপনি কাঁপিতেছে ও তাহা হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। অন্য সব তার স্থির আছে। এবার প্রথম সেতারের অন্য একটি তার বাজাও, দ্বিতীয় সেতারের আর একটি তার বাজিয়া উঠিবে। প্রথম সেতারের দুটি, তিনটি,বা সকল তারগুলি বাজাইয়া দাও। দ্বিতীয় সেতারেরও দুটি, তিনটি, বা সকল তারগুলি আপনা-আপনি বাজিয়া উঠিবে। এক সেতারের যে তার বাজাইবে. সেই তারের অনুরূপ বা সেই সুরে বাঁধা অপর সেতারের সেই তার বাজিয়া উঠিবে, অন্য তার বাজিবে না।

দ্বিতীয় সেতারটার যদি চেতনা থাকিত, তবে তাহার একটা তার বাজিয়া উঠিলেই সে বুঝিতে পারিত যে, ঘরের মধ্য হইতে এক রকম শব্দ আসিতেছে। পাঁচ সাতটা তার

বাজিয়া উঠিলে বুঝিতে পারিত, পাঁচ সাত রকমের শব্দ আসিতেছে। যদি তাহার তিনটা তার ছিঁড়িয়া যায় বা ঢিল হইয়া যায়, তবে প্রথম সেতারে তদনুরূপ তার যতই কেন আন্দোলিত হইতে থাকুক না, তাহার শব্দে তোমার কাণ যতই কেন ঝালাপালা হউক না, সচেতন সেতার বেচারা তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না। সে মনে করিবে,



তিন রকম শব্দ আর হইতেছে না। যদি তাহার সব তার ছিঁড়িয়া বা ঢিলা হইয়া যায়, তবে তাহার আশে পাশে ভীষণ তরঙ্গান্দোলন, প্রচণ্ড বজ্রনিনাদ হইলেও, সে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেই বাস করিবে।

আমাদের কাণও ঐ সেতারের মত। গোটাকয়েক তরঙ্গাঘাতে সাড়া দেয়, সব তরঙ্গে সাড়া দিবার ক্ষমতা নাই। এমন ধীর গম্ভীর শব্দ আছে, যাহা আমরা কাণে ঠাহর করিতে পারি না। এমন তীব্র শব্দ আছে, যাহা আমরা কাণে ধরিতে পারি না। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বায়ুর তরঙ্গ-কম্পন এক সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম হইলে তাহার আর শব্দের আনুভূতি জন্মে না। আবার এক সেকেণ্ডে ৪০,০০০ হাজার বারের অধিক হইলেও শব্দ বলিয়া শুনা যায় না। সঙ্গীতে যে আওয়াজ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কম্পনসংখ্যা সেকেণ্ডে ৩২ বার হইতে ৪,০০০ বারের মধ্যে। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের অনুভূতি জন্মে। বায়ুশূন্য স্থানে শব্দের উৎপত্তি হয় না। ঈথরের তরঙ্গে আলোক, উত্তাপ প্রভৃতিব উৎপত্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর এইরূপ অনেক ঈথর-তরঙ্গমালা, রশ্মি বা কিরণ আছে, যাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা অন্য প্রকারে পাই। সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মায় না বটে, কিন্তু সেগুলির রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্ত্তনের শক্তি আছে। তাহারা কোন কোন যৌগিক পদার্থের মূল উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া দিতে পারে, আবার একত্রসংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থকে সংশ্লিষ্ট করিয়া এক যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারে। অথবা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের উপর পড়িয়া তাহাদের অণুগুলিকে এরূপ ভাবে কম্পিত করিয়া দেয় যে, অন্ধকারে সেই পদার্থগুলি আপনা-

আপনি জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে। চক্ষুর দ্বারা ঈথরের আলোকতরঙ্গের অনুভূতি হয়। ত্বক্ দ্বারা উত্তাপ-তরঙ্গের অনুভূতি হয়। তাড়িত ও ঈথরের তরঙ্গভেদ। তাড়িত-তরঙ্গ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। তাড়িত-তরঙ্গ ধরিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবশ্যক। সেই সব যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত-তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যায়।

উত্তাপ, আলোক, তাড়িত, সবই ঈথরের তরঙ্গ বা পদার্থকণার আন্দোলন। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য বা অনুকম্পনের দ্রুততার পার্থক্য ভিন্ন ইহাদের মধ্যে অন্য কোনও বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সকলেই জানে, ত্রিপার্শ্ব কাচফলকের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিলে সেই শুভ্ররশ্মি বিশ্লিষ্ট হইয়া নানা রংবিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। সেই বর্ণচ্ছত্রের এক প্রান্তে লাল রং, অপর প্রান্তে বেগুনি রং থাকে। পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা স্থির

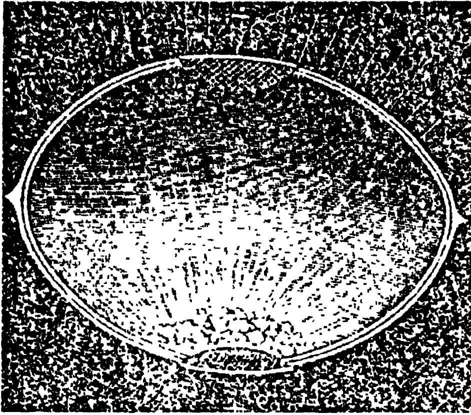


করিয়াছেন যে, লালবর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং বেগুনিবর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। লাল আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ., ০০০০২৬ ইঞ্চ অর্থাৎ এক ইঞ্চের দশলক্ষভাগের ২৬ ভাগ বা প্রায় ১/৩৯,০০০/ ইঞ্চ। বেগুনিরঙ্গের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য , ০০০০১৬ ইঞ্চ বা প্রায় ১/৬০০০ ইঞ্চ; অন্যান্য বর্ণোৎপাদক তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য এই দুই সীমার মধ্যে। লাল আলোর তরঙ্গ এক সেকেণ্ডের কোটী ভাগের একভাগে চল্লিশ কোটী বার কম্পিত হয়। হল্‌দে আলোর তরঙ্গ পঞ্চাশ কোটী বার কম্পিত হয়, নীল আলোর ষাট কোটী বার, ও বেগুনে আলোর তরঙ্গ সত্তর কোটী বার কম্পিত হয়।

বর্ণছত্রের লাল আলোর পর কি আছে, চোখে ঠাহর হয় না। বেগুনে আলোর পর কি আছে, তাহাও চোখে ঠাহর হয় না। তরঙ্গকম্পন সেকেণ্ডে ৪৫০,০০০,০০০.০০০,০০০ বার হইতে ৭২৭, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ বারের মধ্যে হইলে আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য হয়। আমাদের দর্শনযন্ত্র এমনই ভাবে গঠিত যে, এই সীমার অতীত দ্রুততর বা ধীরতর কম্পন ধরিতে পারে না। বর্ণচ্ছত্রেব লাল আলোর পরেও যে অপেক্ষাকৃত ধীরতর কম্পমান দীর্ঘতর তরঙ্গ সকল আছে, এবং বেগুনি

আলোর পরও যে অপেক্ষাকৃত দ্রুততার কম্পমান ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ সকল বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায় না থাকিলেও, তাহাদের অন্যান্য অনেক পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার যে ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে তাহাদিগের অস্তিত্ব অবগত হই।

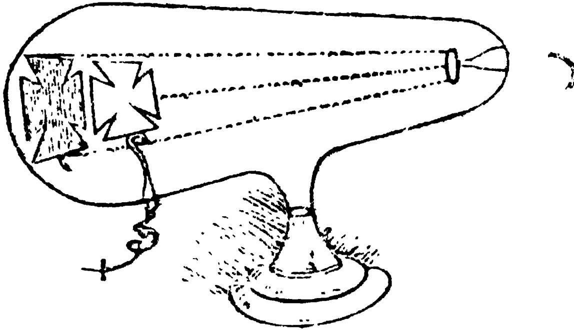
সূর্য্যমণ্ডলের পদার্থ সকলের আণবিক কম্পন ঈথরসমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বেগে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং আমাদের চক্ষে লাগিয়া উজ্জ্বল শুভ্র আলোকের অনুভূতি জন্মায়। এই শুভ্রালোকের অনুভূতি কি মৌলিক, বিশুদ্ধ, বা অমিশ্র অনুভূতি? অর্থাৎ, শুভ্রালোকের অনুভূতি কি একই প্রকার তরঙ্গাভিঘাতের ফল, না বহুবিধ তরঙ্গের যুগপৎ আঘাতসঞ্জাত বহুবিধ অনুভূতির সমষ্টি বা যৌগিক ফল? ত্রিপার্শ্ব কাচ দ্বারা শুভ্রালোকের বিশ্লেষণ ঘটে। বিভিন্ন তরঙ্গমালা (অর্থাৎ বিভিন্ন মূলবর্ণ) তাহাদের কম্পনের সংখ্যানুসারে অথবা তরঙ্গের দৈর্ঘ্যানুসারে যথাক্রমে পৃথক হইয়া পড়ে। বর্ণ চ্ছত্রের বিভিন্নবর্ণের সংযোগেই যে শুভ্রালোকের উৎপত্তি, তাহা নানা পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। বিস্তৃত বর্ণচ্ছত্রকে যদি দৃষ্টিকাচ বা আতুসি কাচ, অথবা পুটাকার দর্পণ দ্বারা এক কেন্দ্রে সংনিপাতিত বা প্রতিফলিত করা যায়, তবে সেই কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন বর্ণের সমাহারে শুভ্রালোক দৃষ্ট হইবে। একখানি মণ্ডলাকার সাদা কার্ড বোর্ড (কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে) বৃত্তখণ্ডাকারে সাত ভাগ করিয়া বর্ণচ্ছত্রের সাত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া যদি খুব বেগে চক্ষের সমক্ষে ঘুরান যায়, তবে চক্ষে আর বিভিন্ন বর্ণ দেখা যাইবে না, সব রং মিশিয়া সাদা রঙ্গের অনুভূতি জন্মিবে।



সূর্য্যের শ্বেত রশ্মি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ। সূর্য্য হইতে নানাপ্রকার তরঙ্গ আসিয়া এক সঙ্গে পড়ে; তাহাতে সাদা আলোর অনুভূতি হয়। সকল প্রকার তরঙ্গকে এক সঙ্গে পড়িতে না দিয়া এক এক প্রকার তরঙ্গকে এক এক সময়ে পড়িতে দিলে এক এক বর্ণের অনুভূতি জন্মে। চক্ষুর গ্রাহ্য বা বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ সকল, যাহা বর্ণচ্ছত্রের একপ্রান্তে লাল ও অপর প্রান্তে বেগুনি ও মধ্যস্থলে অপরাপর বর্ণের সৃষ্টি করে, তাহা ব্যতীত কি আর কোনও ঈথর-তরঙ্গ নাই?

২

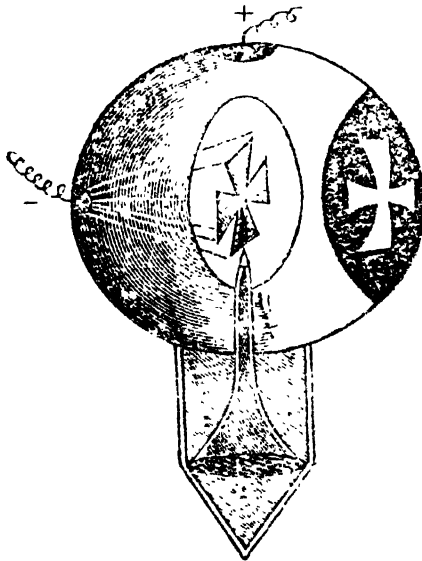
বর্ণচ্ছত্রের লাল আলোর পরবর্ত্তী অন্ধকার স্থানে কোনও সূক্ষ্ম তাপমাপক যন্ত্র ধরিলে, তথায় যে তাপ কিরণ বর্ত্তমান আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। দৃশ্য আলোক-কিরণ যেমন দর্পণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও আতুসিকাচ বা দৃষ্টিকাচ দ্বারা এক কেন্দ্রে সমাহৃত করা যায়, এই অদৃশ্য তাপ-কিরণও ঠিক সেইরূপ করা যায়। কোনও ধাতুখণ্ডের উপর এই কিরণ কেন্দ্রীভূত করিলে সেই ধাতু খণ্ড তাতিয়া লাল হইয়া উঠিবে, অথাৎ সেই ধাতুখণ্ডের অণুগুলি অদৃশ্য ঈথরতরঙ্গের কম্পন গ্রহণ করিয়া কম্পিত হইতে থাকিবে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত উপায়ে ইহাদিগের কম্পনসংখ্যা পূর্ব্বোক্ত তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা হইতে অধিকতর (ও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হ্রস্বতর) হইয়া যাওয়াতে আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য হইল ও লাল বলিয়া অনুভূত হইল।



বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে আলোর পর কি কিছুই নাই? কুইনাইন জলে গুলিয়া ব্লটিং কাগজে মাখাইয়া লও; সেই কাগজখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের বেগুনি রঙ্গের পর অন্ধকার স্থানে ধর, দেখিবে, কাগজখানি জ্যোতিষ্মান হইয়া উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই বুঝা গেল, বেগুনের পর অন্ধকার স্থানে এমন কিছু আছে, যাহাতে কাগজে মাখান কুইনাইনের অণুগুলিকে কাঁপাইতে লাগিল; কিন্তু ইহাদের কম্পনসংখ্যা সেই কিরণের কম্পনসংখ্যা হইতে অল্পতর হওয়াতে দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া নীলবর্ণের অনুভূতি জন্মাইল। এই অন্ধকার অংশে রৌপ্যলবণ-মাখান ফটোগ্রাফের সাদা কাগজ ধরিলে তাহা কাল হইয়া যাইবে। জলে কুইনাইন গুলিয়া তাহা দ্বারা একখণ্ড সাদা কাগজের উপর কোন নক্সা বা আকৃতি অঙ্কিত কর। জল শুকাইয়া গেলে কাগজের উপর যে কিছু আঁকা আছে, তাহা একেবারেই বুঝা যাইবে না। কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে যদি ঐ কাগজখণ্ডের ফটো উঠান যায়, তবে সেই ফটোতে কাগজের সাদা জমির উপর পূর্ব্ব অঙ্কিত অদৃশ্য কাল রেখাঙ্কিত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। চক্ষে যাহা অদৃশ্য আকৃতি ছিল, ফটোগ্রাফির সাহায্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। কুইনাইনাঙ্কিত রেখা হইতে এমন রশ্মি বাহির হইতেছিল, যাহা আমাদের চক্ষের স্নায়ুর কোনও

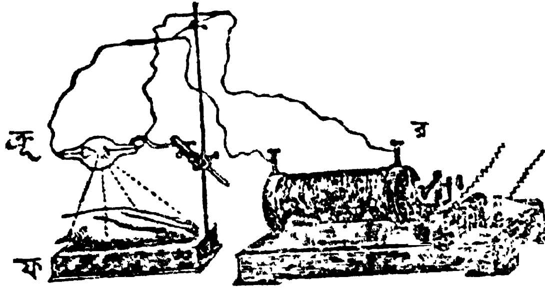
পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দৃষ্টিগোচর হইতে পারিল না; অথচ ফটোগ্রাফের রাসায়নিক পদার্থে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হইল। সূর্য্যের দৃশ্যকিরণের সহিত এই অদৃশ্য কিরণ জড়িত রহিয়াছে। ত্রিপার্শ্ব কাচের সাহায্যে তাহাকে পৃথক করা গেল। উজ্জ্বল শুভ্র সূর্যালোকে যে নীল বেগুনে বা বেগুনের পর অদৃশ্য কিরণ আছে, তাহাতেই ফটোগ্রাফের কাচফলকে মাখান রৌপ্যলবণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ফটোর ছবি ওঠে। লাল ও হলুদে আলোকের ঐরূপ রাসায়নিক ক্ষমতা নাই, তাই লাল ও হল্‌দে আলো খুব উজ্জ্বল হইলেও তাহাতে ফটো উঠান দুষ্কর। সাধারণ ফটোগ্রাফের কাচের নিকট লাল আলো ও অন্ধকারে কোনও প্রভেদ নাই।

সাধারণ আলোক-রশ্মি জল, কাচ, প্রভৃতি পদার্থের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, এই জন্য ইহাদের ভিতর দিয়া আলো দেখিতে পাই। ইহাদিগকে স্বচ্ছপদার্থ বলে। ধাতু, কাঠ, ইঁট, পাথর, মোটা কাল কাগজ বা চামড়ার ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে না, এই জন্য আলো ও চক্ষুর মধ্যস্থলে ধাতু বা কাষ্ঠফলক ধরিলে আলোক দেখিতে পাই না।



সূর্য্যালোকে স্থূল-মধ্যে দৃষ্টিকাচ বা আতুসিকাচ ধরিলে তাহার উপর যতটা সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, সমস্তটা সেই কাচ ভেদ করিয়া অপরপার্শ্বে এক মধ্যবিন্দুতে আসিয়া একত্রিত হয়। এই কেন্দ্রীভূত আলোকবিন্দু অতিশয় উজ্জ্বল। উজ্জ্বল বিন্দুতে হাত দিয়া দেখ কত উত্তপ্ত! ফট্‌কিরী জলে গুলিয়া সেই স্বচ্ছ জল যদি কোনও সমপার্শ্ব কাচপাত্রে পূরিয়া এই রশ্মিপথে ধরা যায়, দেখিবে সেই কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল আলোকবিন্দু আর উত্তপ্ত নহে। সূর্য্যরশ্মির উজ্জ্বল আলোক কিরণের সহিত সংমিশ্রিত অদৃশ্য উত্তাপ-কিরণ যাহা কাচ ভেদ করিয়া আসিতেছিল, তাহা আর ফটকিরি-গোলা-জল ভেদ করিয়া আসিতে পারিল না। অথচ দৃশ্য আলোককিরণ তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া আসিল। 'বাইসলফাইড্‌-অব-কার্ব্বণ' নামক তরল পদার্থে 'আওডিন' গুলিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ যদি ফটকরির জলের পরিবর্ত্তে সেই রশ্মি-পথে ধরা যায়,

তবে তাহার মধ্য দিয়া কিঞ্চিমাত্রও আলোক নির্গত হইবে না। সুতরাং সেই মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রস্থানেও কোনও আলোক থাকিবে না, কিন্তু মধ্যবিন্দুর যে স্থানে পূর্ব্বে উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছিল, সেই স্থানে হাতখানি ধর, কেমন উত্তাপ অনুভব করিবে। সেই স্থানে এক খণ্ড কাগজ বা একখানা টিকে ধর, তাহা পুড়িয়া উঠিবে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, উত্তাপের অদৃশ্যকিরণের পক্ষে কাচ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ এবোনাইট অধিকতর স্বচ্ছ। আওডিনযুক্ত-বাইসলফাইড অব

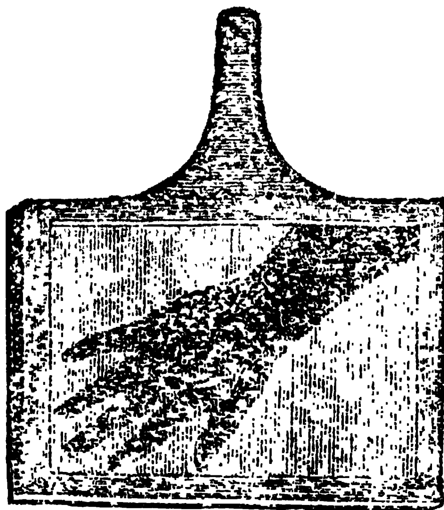


কার্ব্বন ও এবোনাইট উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। ইহারা দৃশ্যকিরণের পক্ষে অস্বচ্ছ, (লালের পর) অদৃশ্য উত্তাপকিরণের পক্ষে স্বচ্ছ। একের পক্ষে যাহা স্বচ্ছ, অপরের পক্ষে তাহা অস্বচ্ছ। দৃশ্যকিরণ নানা প্রকারের, অদৃশ্যকিরণও নানা প্রকারের। এক কিরণের নিকট যাহা স্বচ্ছ, অপর প্রকার কিরণের নিকট তাহা অস্বচ্ছ। নীল আলোকের নিকট নীলকাচ স্বচ্ছ; লাল বা হল্‌দে আলোকের নিকট লালকাচ অস্বচ্ছ। বেগুনের-পর-অদৃশ্য রাসায়নিক কিরণের নিকট যাহা স্বচ্ছ, লালের পর-অদৃশ্য উত্তাপকিরণের নিকট তাহা অস্বচ্ছ।

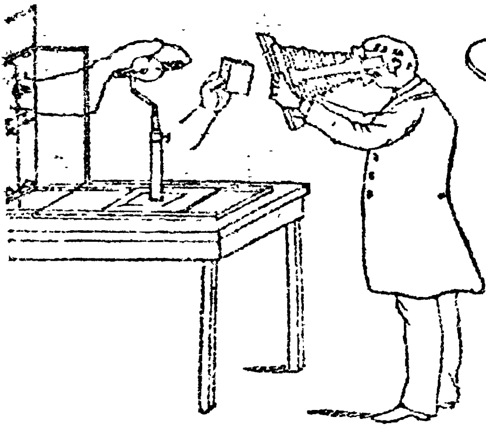
রুদ্ধ-দ্বার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছি, বাহির হইতে ভিতরে কোনও রশ্মি আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। হয় ত কত ঈথর-তরঙ্গ কাষ্ঠ-কপাট ও ইষ্টক-প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিতেছে, এমন কোনও ইন্দ্রিয় বা দিব্যচক্ষু আমাদের নাই, যাহা তাহাদের অভিঘাতে "সাড়া" দিতে পারে। যে চক্ষু আছে, তাহা ত ভোঁতা,—ক'টা কিরণই বা গ্রহণ করিতে পারে? আমাদের চক্ষু যদি এরূপভাবে গঠিত হইত যে, সেকেণ্ডে ৪০০. ০০০, ০০০, ০০০, বারের কম কম্পন গ্রহণ করিতে পারিত বা দেখিতে পাইত, তবে আমাদের ঘরের দরজা জানালায় কাচের সার্শির পরিবর্ত্তে এবোনাইটের সার্শি বসাইতে হইত।

তাড়িত যন্ত্রে প্রচুর তাড়িত উৎপন্ন করিলে সেই যন্ত্রের দুই কেন্দ্রের ব্যবধানস্থলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হয়। ভল্‌টজ্ বা উইমস্‌হার্ট তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র বা রুমকর্ফ কুণ্ডলী যন্ত্র, যাহাতে উৎপন্ন তাড়িতপ্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধতি অত্যন্ত অধিক —এরূপ কোনও যন্ত্রের দুই কেন্দ্রের মধ্যে দুই ইঞ্চ দশ ইঞ্চ দীর্ঘ সূত্রবৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু বায়ু-শূন্য স্থানে দুই কেন্দ্রের ব্যবধানস্থলে তাড়িত প্রবাহে সেরূপ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় না। দুই পার্শ্বে ধাতু-তার সংযুক্ত

কাচের কোনও ফাঁপা গোলকের বা নলের ভিতর হইতে অনেকটা বায়ু বাহির করিয়া তাহার দুই প্রান্ত যদি উইম্‌সহার্ট বা রুমকর্ফ যন্ত্রের দুই কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করা যায়, তবে দুই তারের ব্যবধানস্থলে সেরূপ সূত্রবৎ উজ্জ্বল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে না। আলোকরেখা সরল ও রজ্জুবৎ প্রশস্ত হয়, এবং তাহার তেজেরও হ্রাস হয়। নির্গমকেন্দ্র বা ঋণ-কেন্দ্রের নিকট (Cathode বা negative pole) একটু ফাঁক বা অন্ধকার অংশ দেখা যায়। নল বা গোলকের নিকট চুম্বক ধরিলে ভিতরের আলোকরেখা তাহার দিকে ঝুলিয়া পড়ে। আরও বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে আলোকের উজ্জ্বলতা আরও কমিয়া যায়। নির্গমকেন্দ্রের চতুর্দ্দিক এক ক্ষুদ্রায়তন ক্ষীণ নীলালোকের মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয়; এবং অপর পার্শ্বের প্রবেশ-কেন্দ্র (Anode বা positive pole) হইতে ঈষৎ গোলাপী রঙ্গের আলোকস্রোত বাহির হইয়া নল বা গোলকের প্রায় সমস্ত অংশকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। নির্গমকেন্দ্রস্থিত নীলাভ ক্ষুদ্রায়তন আলোকমণ্ডল এবং প্রবেশকেন্দ্রোদ্গত প্রশস্ত লালাভ আলোকাংশের মধ্যে খানিকটা অন্ধকার ব্যবধান থাকিলেও, সমস্তটাকে এক অবিচ্ছিন্ন আলোকপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। আরও বায়ু বাহির করিয়া লইলে নির্গম-কেন্দ্রস্থিত নীলাভমণ্ডল ও তৎপরবর্ত্তী অন্ধকার অংশ আরও বিস্তৃত হয়, এবং প্রবেশকেন্দ্রোদ্গত স্ফীত আলোকাংশ কাটা কাটা বা বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোক ও অন্ধকার পর্য্যায়ক্রমে থাক্‌বন্দী হয়। আরও যতই বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়, ততই অন্ধকার অংশ প্রবেশকেন্দ্রের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং থাক্‌বন্দী আলোকাংশ প্রবেশ-কেন্দ্রের নিকটেই থাকে। অবশেষে প্রবেশ-কেন্দ্রের আলোক একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং নির্গম কেন্দ্রোত্থিত প্রায়-অদৃশ্য অতি ক্ষীণ রশ্মি প্রবেশ-কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাচনল বা গোলকের যে অংশে বা দিকে প্রবেশ-কেন্দ্র স্থাপিত করা যায়, এই রশ্মিও সেই দিকে সেই পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। নলকে আরও বায়ুশূন্য করিলে এই রশ্মি প্রবেশ-কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নির্গম-



কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া সোজা ধাবিত হয় ও সম্মুখবর্ত্তী কাচপ্রাচীরে পড়িয়া তাহাকে অতিশয় উজ্জ্বল করিয়া তুলে, এবং কাচের প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিকাশ করে। নির্গম-কেন্দ্র হইতে যে অদৃশ্য-রশ্মি বাহির হয়, তাহাতে জ্যোতিষ্মান পদার্থ সকল দীপ্তিমান হইয়া উঠে। গোলকের মধ্যে নির্গম-কেন্দ্রের সম্মুখে হীরক ও অন্যান্য মণি, খড়ি, পোড়া ঝিনুক বা শামুক প্রভৃতি রাখিলে তাহারা অত্যন্ত দীপ্তিমান হইয়া উঠে ও নানা বর্ণের উজ্জ্বল আলোকের বিকাশ করে। গোলকের ভিতর কিরণপথে যদি কোন পদার্থ ধরা যায়, তবে সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল কাচপ্রাচীরে তাহার ছায়া পড়িবে। একখণ্ড খুব পাৎলা অভ্র বা আলুমিনিয়ম পাত, ক্রস্ বা ত্রিশূলের আকারে কাটিয়া, নলমধ্যে কিরণ-পথে রাখিলে, উজ্জ্বল কাচদেহে ক্রস বা ত্রিশূলের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িবে। এই নির্গম-কেন্দ্রোত্থিত রশ্মির নিকট (cathode rays) অধ্যাপক হর্জ দেখিয়াছিলেন, অভ্র অপেক্ষা আলুমিনিয়ম ধাতুর খুব পাৎলা অধিকতর স্বচ্ছ। একখণ্ড পাৎলা অভ্রের চাক্‌তির মধ্য হইতে "ক্রস্" আকারে খানিকটা কাটিয়া বাহির করিয়া সেই স্থানে, ঠিক এই আকারের একটা খুব পাৎলা আলুমিনিয়ম পাত বসাইয়া দিয়া সমস্তটা নলমধ্যে নির্গমকেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া তাড়িত পরিচালন করিলে সম্মুখবর্ত্তী কাচদেহে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মধ্যে উজ্জ্বল 'ক্রস' আকার দৃষ্ট হইবে। নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মি অভ্রপত্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিল না বলিয়া, সম্মুখস্থ কাচদেহের সে অংশ অভ্রপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রহিল, সেই অংশ জ্যোতিষ্মান হইতে পারিল না, কিন্তু তন্মধ্যবর্ত্তী ক্রসাকার অংশে সে রশ্মি আলুমিনিয়ম পত্র ভেদ করিয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। গোলকের মধ্যে নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মিকে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সরল পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যাওয়া যায়।



এই ত গেল গোলকের মধ্যের অবস্থা। গোলকের বাহিরেও ঐ অবস্থা। ক্রুকস, হিটর্ফ, হর্জ ও লিনার্ড, নির্গম-কেন্দ্রনির্গত রশ্মির বিষয় অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃঃ অধ্যাপক লিনার্ড নির্গম-কেন্দ্রের সম্মুখে কাচাংশের পরিবর্ত্তে একখণ্ড

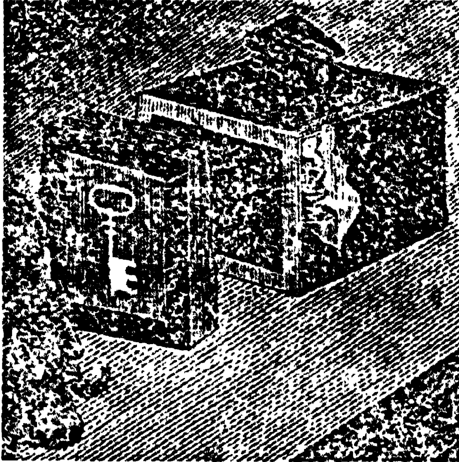
১/১০০০ ইঞ্চ পুরু আলুমিনিয়ম পত্র বসাইয়া এক ক্রুক্‌স নল নির্ম্মাণ করেন। তিনি দেখিলেন, যে নির্গম-কেন্দ্র রশ্মি কাচ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। একখণ্ড কাগজে "পেণ্টাডিসিল-পারাটোলিল-কিটোন" নামক রাসায়নিক পদার্থ মাখাইয়া নলের বাহিরে রশ্মিপথে ধরিবামাত্র তাহা জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। এই বাহিরে নির্গত রশ্মি চুম্বক দ্বারা মার্গভ্রষ্ট করা যায়। এই রশ্মির দ্বারা ফটোগ্রাফের কাচফলক বিকৃত হইয়া যায়। এই রশ্মির দ্বারা ফটোগ্রাফের কাচফলক বিকৃত হইয়া যায়। এই রশ্মি কাঠের তক্তা ও পুরু কাল কাগজ ভেদ করিয়া যায়। লিনার্ডের এই সকল আবিষ্কারের ফল ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে সাধারণের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। এই সময়ে লিনার্ডের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইঁহার এই আবিষ্কারের ফলে আকৃষ্ট হইয়া দু' এক জন পণ্ডিত ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য-নির্ণয় ও নূতন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাভেরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত উর্জবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক উইলিয়াম কনরাড রো এণ্টেন ১৮৯৬ খৃঃ ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার ক্রুকস নলটি কাল কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অথচ নিকটস্থ বেঞ্চের উপর জ্যোতিষ্মান পদার্থ-মাখান কাগজখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ক্রুকসনলমধ্যে তাড়িত প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন, কাগজখানি নিভিয়া গেল। আবার তাড়িত সঞ্চালন করিলেন, আবার কাগজখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবার এক নূতন আবিষ্কার হইল। লিনার্ডের নির্গম-কেন্দ্রীয় রশ্মি কাচনলের বাইরে আসিতে পারে না। আলুমিনিয়ামের সূক্ষ্মপাতযুক্ত নল হইলে তবে সেই পাত ভেদ করিয়া বাইরে আইসে। রঙ্গটেনের "ক্রুকস নল" ত সেরূপ নয়। এ ত সমস্তই কাচনির্ম্মিত। আরও পরীক্ষা করিলেন। এ রশ্মি ত চুম্বক দ্বারা বিপথে সরান যায় না। অন্যান্য অদৃশ্য রশ্মিব ন্যায় ইহাকে দর্পণ দ্বারা পরাবর্ত্তিত করা যায় না, পুটাকার দর্পণ বা আতুসি কাচ দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা যায় না। লিনার্ড রশ্মির তেজ নলের বাইরে অতি অল্পদূরব্যাপী। রঙ্গটেনের অদৃশ্য রশ্মির তেজ অধিকদূরব্যাপী। রঙ্গটেনে ইহার নাম দিলেন Xrays বা অজ্ঞাত রশ্মি।

এই অদৃশ্যালোকে ফটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠান যায়। কাঠের তক্তা, পুরু কাল কাগজ, আলুমিনিয়ম ধাতুপত্র ভেদ করিয়া ফটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠাইতে পারে। এই আলোক শরীরের মাংস ভেদ করিয়া যায়, হাড় ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অধিকাংশ ধাতুদ্রব্যই ভেদ করিয়া পারে না, বিশেষতঃ পুরু হইলে।

যাহার ভিতর দিয়া একেবারে আলো যায় না, তাহার ছায়া গভীর হয়। যাহার ভিতর দিয়া অল্পপরিমাণে যায়, তাহার ছায়া অপেক্ষাকৃত কম গভীর হয়। যাহার ভিতর দিয়া বেশ চলিয়া যাইতে পারে, তাহার ছায়া পড়ে না। এই রূপ নানা বস্তুর ভিতর দিয়া নানা পরিমাণে যাইতে পারে বলিয়া, এই অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে ফটোগ্রাফের জন্য তৈয়ারি কাচের উপর বাক্স বা থলিয়ার বা শরীরের মধ্যস্থিত পদার্থের ছায়ার ছবি উঠান যাইতে পারে, ও স্থায়ীভাবে তাহার একটা record রাখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহাদের উপর বেগুনির পর অদৃশ্য রশ্মি পড়িলে তাহারা দীপ্তিমান হইয়া উঠে। ঐ সকল পদার্থের প্রকৃতিভেদে তাহাদের দীপ্তিমত্তা বা আলোক-বিকীরণক্ষমতা অল্পাধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। কোনও কোনওটা যতক্ষণ সেই রশ্মি তাহাদের উপর পড়িতে থাকে, ততক্ষণই দীপ্তিমান হয়, রশ্মিপাত বন্ধ করিলেই দীপ্তিমত্তা চলিয়া যায়। কোনও কোনওটাকে উত্তেজক রশ্মির প্রভাব হইতে সরাইয়া লইলেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আলোক বিকীরণ করে।

এই পদার্থগুলির এরূপ ক্ষমতা আছে যে, যে সকল তরঙ্গকম্পন মানব চক্ষুর গ্রাহ্য হয় না, সেই সকল তরঙ্গাভিঘাতে ইহাদের অণু সকল তদপেক্ষা এইরূপ ধীরতর বা দ্রুততর কম্পিত হইতে থাকে যে, মানবচক্ষুর গ্রাহ্য হয়। অনেক সময়ে এই জাতীয় অনেক পদার্থের অণুর কম্পনও বহুকালস্থায়ী হয়।



সলফাইড অব ক্যালসিয়াম (বা ঝিনুকের খোলা গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কোন পাত্রে পুরিয়া মুখবন্ধ করিয়া আগুনে লাল করিয়া পুড়াইয়া লইলেই হইল) বা "বাল্‌মেনস্ লুমিনাস্ পেণ্ট" কোন পদার্থে মাখাইয়া রৌদ্রে ধরিলে জ্যোতিষ্মান হয় ও রাত্রিতে বা অন্ধকার ঘরে উজ্জ্বল দেখায়। ইহার দীপ্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

"বেরিয়াম-প্লাটিনো-সাইনাইড্" "ক্যালসিয়াম প্লাটিনো সাইনাইড্," "পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম বা ষ্ট্রনসিয়াম সলফাইড্" "ইউরেনিয়াম ফ্লু রাইড" ও "ইউরেনিয়াম-সলফেট" প্রভৃতির উপর সামান্য আলো পড়িলেই দীপ্তিমান হইয়া উঠে। সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রের বেগুনের পর অন্ধকার কিরণে খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। একখণ্ড পুরু পোষ্টকার্ডে যদি পূর্ব্বোক্ত কোন পদার্থ মাখাইয়া লওয়া যায়, তবে বাক্স বা থলিয়ার ভিতর কি আছে না আছে, শরীরের অভ্যন্তরস্থিত অস্থিকঙ্কাল কিরূপ ভাবে আছে, বা শরীরের বন্দুকের "গুলি" প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া কোন্ স্থানে কি অবস্থায় আটকাইয়া আছে, তাহা দেখিবার যন্ত্র তৈয়ার হল। ইহাকে দীপনক যবনিকা বলা যায়।

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরকে অন্ধকার কর। এখন রুজকর্ফ বৈদ্যুতিক

যন্ত্রের সহিত ক্রুকসনল (foinstube) সংযুক্ত করিয়া তাড়িত সঞ্চালিত কর। ক্রুকসনলের নির্গমকেন্দ্র হইতে রশ্মি বাহিরে হইয়া সম্মুখস্থ কাচপ্রাচীরে লাগিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিবে ও সেই সঙ্গে রঙ্গটেন আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মি বাহির হইবে। নলের সম্মুখে কিছু দূরে দীপনক যবনিকাখানি রাখিয়া দুই এর মধ্যে তোমার হাতখানি ধর। হাতের মাংসপেশী প্রায় স্বচ্ছ, হাড় অস্বচ্ছ, সুতরাং মাংসের অর্দ্ধকৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে হাড়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িবে। সমস্ত হাড়গুলির বাহ্যিক আকৃতি বেশ বুঝা যাইবে। বাঁকা বা ভাঙ্গা হাড় থাকিলে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মাংসপেশীর মধ্যে বাহিরের কোন বস্তু প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে ছায়াপাতে তাহাও বুঝা যাইবে। হাতের পরিবর্ত্তে যদি তোমার purse বা "মনি-ব্যাগটি" ধর, তবে যবনিকার উপর যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে ব্যাগে কি আছে, বেশ বুঝিতে পারিবে।

খোলা ঘরের ভেতর এত আলো থাকে যে, তাহাতে যবনিকা উজ্জ্বল হইল কি না, কিছুই বুঝা যায় না। এইরূপ যবনিকা অন্ধকার ঘরেই ব্যবহার করা চলে। একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই দিবালোকের মধ্যে দেখিবার উপযোগী হয়। কাল কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স করিয়া তাহার এক ধারের প্রাচীর কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে দীপনক যবনিকা বসাইয়া দাও, অথবা সেই প্রাচীরের ভিতরের দিকে কোন জ্যোতিষ্মান পদার্থ মাখাইয়া লও। এবং তাহারই সম্মুখস্থ প্রাচীরে একটা ছিদ্র করিয়া লও। বাক্সর ভিতরটা সর্ব্বদাই অন্ধকার থাকিবে, সুতরাং ছিদ্রপথে চক্ষু দিয়া বাক্সটাকে ক্রুকস নলের দিকে নির্দ্দেশ করিলে ভিতরের সম্মুখস্থ যবনিকা উজ্জ্বল হইল কি না দেখা যাইবে, এবং তাহাতে কোনও ছায়া পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রঙ্গটেন অদৃশ্যকিরণের নিকট কাচ ভারি অস্বচ্ছ, হীরক স্বচ্ছ। অন্যান্য মণিও স্বচ্ছ। এই কিরণ দ্বারা আসল বা নকল, সাচ্চা বা ঝুটা জহরৎ অনায়াসে ধরা পড়ে। কাঠ, চামড়া, আলুমিনিয়ম ধাতু, মাংস, এবোনাইট, কাগজ, ইষ্টক প্রভৃতি সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থ এই অদৃশ্যকিরণের নিকট স্বচ্ছ। সীস, রাং, তামা, প্রভৃতি অনেক ধাতু অস্বচ্ছ, রঙ্গটেন অদৃশ্য-কিরণের প্রভাবে কাচ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। খুব অন্ধকার ঘরে ক্রুকস্ নলে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া রঙ্গটেন রশ্মি বাহির করিলে. নিকটস্থ যাবতীয় কাচ নির্ম্মিত পদার্থ উজ্জ্বল দেখায়। ক্রুকস্ নলকে যদি কাল কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও ত ব্যাপার আরও চমৎকার দেখায়। কোথায়ও কিছু নাই, হঠাৎ গেলাস ঝাড় লণ্ঠন, চসমার কাচ প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ কর, আবার সব অন্ধকার। আবার তাড়িত সঞ্চালিত কর, আবার সব কাচদ্রব্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন প্রকারের কাচ বিভিন্ন বর্ণে উজ্জ্বল দেখাইবে।

অধুনা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, তাড়িতপ্রবাহের স্পন্দনের দ্রুততার তারতম্যে ও তাড়িতের বলের তারতম্যে, ক্রুকস-নলোদ্গত অদৃশ্য রশ্মির পদার্থভেদিনী প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ১৫০, ০০০ ভোলট্ বৈদ্যুতিক চাপে সঞ্চালিত তাড়িতপ্রবাহে উৎপন্ন

অদৃশ্যরশ্মিতে যে দ্রব্য অস্বচ্ছ ছিল, ৩০০,০০০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপ সঞ্চালিত প্রবাহের উৎপন্ন অদৃশ্যরশ্মির নিকট তাহা স্বচ্ছ হইয়া যায়। সুইন্টন ও পোর্টার সাহেব দেখিয়াছেন যে, ঘনীভূত ও কঠিনীকৃত কার্বণিক এসিড ঈথরের দ্বারা অতিশয় শীতলীকৃত ক্রুকস নল হইতে এরূপ অদৃশ্যরশ্মি বাহির করা যায় যে, তাহাতে মাংস অস্বচ্ছ ও হাড় স্বচ্ছ দেখায়। পোর্টার সাহেব এমন যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, ইষ্টকপ্রাচীরের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান মানুষের শরীরমধ্যস্থ কঙ্কালের ছবি অপর পার্শ্বে রক্ষিত দীপনক যবনিকার উপর স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখা যাইবে। রঙ্গটেন-আবিষ্কৃত অদৃশ্যকিরণ নানা প্রকারের বলিয়া x I rays, x 2 rays, x 3 rays, ইত্যাদি নাম রাখা হইয়াছে।

৩

রঙ্গটেনের অদৃশ্য-কিরণ সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া যায়। ইহার প্রভাবে দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল (phosphorescent and flourescent) পদার্থ সকল অন্ধকারে দীপ্তিমান হইয়া উঠে, এবং ইহার দ্বারা ফোটোগ্রাফের জন্য প্রস্তুত কাচ-ফলকে ছবি উঠান যায়।

রঙ্গটেন কিরণ তাড়িতপ্রবাহ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। তাহাও কেবল নিঃশেষিতবায়ু কাচগোলক বা ক্রুকস্ নলের অভ্যন্তরেই হয়। বায়ুশূন্য ....প্রভৃতি ইউরেনিয়াম-ধাতুঘটিত কতিপয় লবণ, আলোকেই হউক বা অন্ধকারেই হউক, সর্ব্বত্র একপ্রকার অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করে, তারা অস্বচ্ছ আলুমিনিয়াম ধাতুপাত্র ভেদ করিয়া ফোটোগ্রাফের কাচনলকে কিরণপথবর্তী অন্যান্য ধাতুদ্রব্যের ছায়া-ছবি উঠাইতে পারে। বাল্‌মেনস্ লুমিনাস পেন্ট বা সলফাইড অব ক্যাল্‌সিয়াম যেরূপ সূর্য্যকিরণপাতের পর বহুঘটিকা পর্য্যন্ত জ্যোতিস্মান থাকিয়া আলোক বিকীরণ করে, তদ্রূপ ইউরেনিয়াম লবণও বহু দিবস, এমন কি, বহু মাস পর্য্যন্ত এক প্রকার অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে। ইহাকে অতি-উদ্দীপনা (hyper phosphorescence) বলে। লুমিনাস পেন্ট একবার উজ্জ্বল হইবার কয়েক দিবস পরেই নিভিয়া যায়; তখন তাহা হইতে আর কোন প্রকার দৃশ্য কিরণ বাহির হয় না। তথাপি তাহা হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এক প্রকার অদৃশ্য-কিরণ বাহির হইতে থাকে। এমন কি, ছয় মাস পরেও সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ইহার সম্মুখস্থ ফোটোগ্রাফের কাচফলক সেই অদৃশ্য কিরণপাত জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এইরূপ অনেকদীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল পদার্থ আছে, যাহাদের দৃশ্যদীপ্তি অপেক্ষা অদৃশ্যদীপ্তি বহুকালস্থায়িনী হয়।

যেমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের উপর সূর্য্যালোক বা তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক পড়িলে দীপ্তিমান হইয়া উঠে ও দৃশ্য-কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে, সেইরূপ অনেক দ্রব্য আছে, যাহারা সেরূপ দীপ্তিমান হইয়া না উঠিলেও অদৃশ্য-কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে। ইহাদের অদৃশ্যদীপ্তি চক্ষুর অগোচর হইলেও ফটোগ্রাফের কাচফলকের নিকট ধরা পড়ে। ইউরেনিয়াম ধাতুঘটিত লবণ দুই প্রকার আছে। এক প্রকারকে

ইউরানিক্ সল্টস্ (uranic salts) ও অপর প্রকারকে, ইউরেনাস্ সল্টস্ (uranous salts) বলা যায়। ইউরানিক সল্টস এর ন্যায় ইউরেনাস সল্টস্ দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল নহে, অর্থাৎ আলোক লাগিলে ইহারা জ্যোতিষ্মান হয় না। তথাপি ইহাদের দ্বারা ফোটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠান যায়।

স্যাগ্নাক্, বেক্কুইরেল, নিওয়েনগ্লাউস্কি, হেনরি ও ট্রষ্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সকল অদৃশ্য কিরণের নিকট জল, মোম ও গন্ধক স্বচ্ছ। আলুমিমিয়াম অপেক্ষা রাং অস্বচ্ছ, রৌপ্য ও দস্তার পাতের ভিতর দিয়াও কিরণ যাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা পাৎলা সীসের পাতের ভিতর দিয়া একেবারেই যাইতে পারে না। রঙ্গটেন অদৃশ্যকিরণ অপেক্ষা এই সকল অদৃশ্যকিরণ অবাধে ধাতুদ্রব্য ভেদ করিয়া যায়। রঙ্গটেনের অদৃশ্য কিরণ পড়িলে ইলেক্ট্রোস্কোপ্ বা তাড়িত-দর্শক যন্ত্রের তাড়িতভার অপসৃত হয়। কিন্তু তাড়িত-দর্শক যন্ত্রটি যদি তাম্র বা প্লাটিনামপাতনির্ম্মিত যবনিকার অন্তরালে রাখা যায়, তবে সে যবনিকা ভেদ করিয়া রঙ্গটেন কিরণ যাইতে পারে না। কিন্তু সেরূপ যবনিকার অন্তরালে থাকিলেও, বেক্কুইরেলের অদৃশ্য কিরণ তাহা ভেদ করিয়া তাড়িত-দর্শক যন্ত্রের তাড়িতভারের অপসরণ করিয়া দেয়। দৃশ্যকিরণের ন্যায় বেক্কুইরেলের অদৃশ্য-কিরণ সমতল দর্পণ দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা যায়। ত্রিপার্শ্ব কাচ দ্বারা বক্রীভূতও করা যায়।

অন্য সকল পদার্থ অপেক্ষা ইউরেনিয়াম ধাতু অতি সহজে এই অদৃশ্য কিরণ বিকীরণ করে। সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও বহু মাস ধরিয়া অদৃশ্য রশ্মি উদ্বমন করিতে থাকে। ইউরেনিয়াম কিরণ যে বর্ণচ্ছত্রের বেগুনের পর অতি দূরস্থিত একপ্রকার কিরণমাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

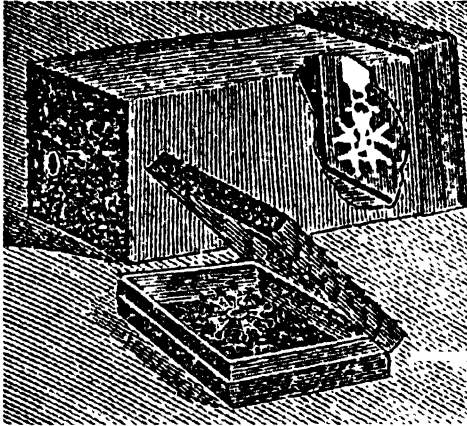
অধ্যাপক সিল্ভেনাস্ টম্সন্ দেখিয়াছেন যে, ফস্ফরসের নিষ্প্রভ আলোকের সহিত এক প্রকার অদৃশ্য আলোকও বাহির হয়, যাহা কাল কাগজ ও সেলুলইড ভেদ করিয়া যায়, কিন্তু অ্যালুমনিয়াম ধাতুপাত ভেদ করিতে পারে না। বাইসল্ফাইড্ অব কার্ব্বন্ জ্বলিলেও তাহা হইতে ঐরূপ অদৃশ্য কিরণ বাহির হয়।

জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক ডাক্তার মারুকা জোনাকী পোকার আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা কার্ড বা তাম্রপাত ভেদ করিয়া ফোটোগ্রাফের কাচফলকে ছবি উঠাইতে পারে। তিনি একটি অগভীর বাক্সের মধ্যে এক হাজার জোনাকি পোকা পুরিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহাদের অণু সকল সূর্য্যালোক বা অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের তরঙ্গাভিঘাতে দীপ্তিমান হইয়া উঠে, এবং উত্তেজক রশ্মির প্রভাব হইতে সরাইয়া লইলেও সেই সকল পদার্থ আপন আপন প্রকৃতিভেদে অল্পাধিক কাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বল থাকে। এই সকল পদার্থকে দীপ্তিপ্রবণ বা উদ্দীপনশীল (phosphorescent and flourescent) পদার্থ বলা যায়।

অধ্যাপক বেক্কুইরেল ও ডিওয়ার এতৎসম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, জ্যোতিষ্মান সল্‌ফাইড্ অব ক্যাল্‌সিয়ামকে উত্তপ্ত করিলে, উত্তাপবৃদ্ধির সহিত তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। শীতল করিলে উজ্জ্বলতার হ্রাস হয়, এবং ৮০° ডিগ্রিতে একেবারে নিভিয়া যায়। যদিও—৮০° ডিগ্রিতে উদ্দীপিত সল্‌ফাইডের আলোক উদ্গীরণ করিবার ক্ষমতা থাকে না,—তথাপি ৮০° ডিগ্রিস্থিত অনুদ্দীপ্ত সল্‌ফাইডে একবার সূর্য্যালোক পড়িলে, সেই আলোক শোষণ করিয়া তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবার ক্ষমতা থাকে। কারণ, পরে অন্ধকারে তাহাকে গরম করিলে জ্যোতিষ্মান হইয়া আলোক উদ্গীরণ করে। পূর্ব্বে কোনও প্রকার উত্তেজক রশ্মিপাত হয় নাই, এরূপ সল্‌ফাইডকে উত্তপ্ত করিলে জ্যোতিষ্মান হয় না।

অধ্যাপক ডিওয়ার দেখিয়াছেন যে, প্রায় সকল পদার্থই অতি শীতল অবস্থায় উদ্দীপনশীল হয়। বৈদ্যুতিক আলোকের কিরণপাত দ্বারা উত্তেজিত করিলে ১৮০° শৈত্যে জিলাটিন বা শিরিশ, গজদন্ত, শৃঙ্গ, রবর, প্যারাফিন্ প্রভৃতি বিলক্ষণ উজ্জ্বল হইয়া নীল বা সবুজ আলোক বিকীরণ করে। আবার যে সকল পদার্থের দীপ্তিমত্তা ক্ষণস্থায়িনী, তাহারা অতি শৈত্যে বহুকাল কিরণ বিকীরণ করিতে থাকে।



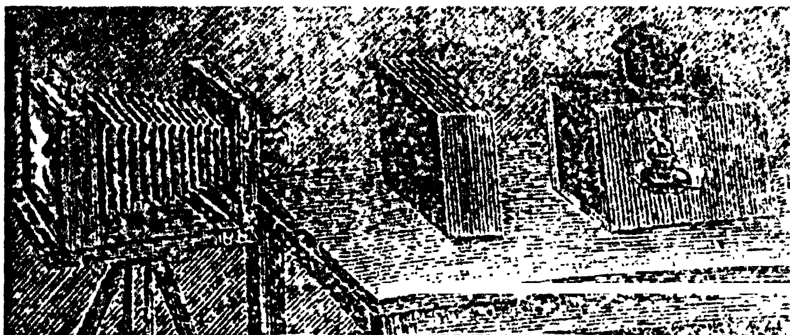
সুরা-সার, গ্লিসরিন, সল্‌ফুরিক্ ও নাইট্রিক এসিড্ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে ও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। —১৮০° ডিগ্রিতে উত্তেজিত করিলে এসিটিফিনোন্, বেন্‌জোফিনোন্, ইউরিয়া, স্যালিসিলিক্ এসিড্ ও গ্লাইকোজেন প্রভৃতি অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়। ডিম্ব ও পাখীর পালক অন্ধকার ঘরে উজ্জ্বল নীল আভা বিস্তার করিয়া অতি সুন্দর দেখায়। তুলা, পশম, কাগজ, চর্ম্ম, কাছিমের খোলা ও স্পঞ্জ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ সকল অতি শৈত্যাবস্থায় কিরণাভিঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

ফরাসী পণ্ডিত গাষ্টাভ্‌লিব দেখিয়াছেন, এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, সূর্য্যালোক লাগিলে তাহা অত্যল্পকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আবার সূর্য্যালোকে ঐরূপ অদৃশ্য কিরণ আছে, যাহা অন্য কিরণ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া সেই উজ্জ্বলীকৃত

পদার্থের উপর পাতিত করিলে সেই পদার্থের উজ্জ্বলতা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

অধ্যাপক ডার্সনভ্যাল্ (D'arsonval) ১৮৯৯ খৃঃ ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব সায়ান্সেস্ নামক বিজ্ঞানসভায় লিবনের এই আবিষ্কারের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং লিবনের পরীক্ষিত ব্যাপার উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে প্রদর্শিত করেন।

লিবঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্য, এমন কি, সাধারণ কেরোসিন বা অন্য যে কোন ল্যাম্পের আলোক হইতে দৃশ্য কিরণের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অদৃশ্য কিরণও বাহির হইতে থাকে। এই অদৃশ্য কিরণ পাৎলা কাঠের তক্তা কাল পুরু কার্ডবোর্ড



ভেদ করিয়া যাইতে পারে। লিবঁ ইহার নাম রাখিয়াছেন Black Light বা কৃষ্ণ আলোক।

তাঁহার আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ একখণ্ড পুরু কার্ডবোর্ডে মাখাইয়া লইয়া সূর্য্যালোকে জ্যোতিষ্মান (phosphorescent) হইয়া উঠে। এইরূপ উদ্দীপিত অবস্থায় সেটা একটা অগভীর কার্ডবোর্ডের বাক্সের উপর রাখিয়া বাক্সের বিপরীত দিক ল্যাম্পের দিকে ধরিলেন। এই ল্যাম্পটিও কৃষ্ণবর্ণের পুরু কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতর রুদ্ধ ছিল। তন্মধ্য হইতে বাহিরে কিছুমাত্র আলো নির্গত হইতেছিল না। এইরূপ রুদ্ধ ল্যাম্পের দিকে সেই বাক্সটা ফিরাইবামাত্র তদুপরিস্থিত রাসায়নিক পদার্থ মাখান উজ্জ্বল কাগজখণ্ডের প্রায় সমস্ত অংশই নিষ্প্রভ হইয়া গেল, কেবলমাত্র সেই বাক্সের অভ্যন্তরে স্থাপিত একটি লোহার চাবির অবিকল আকৃতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত রহিল (১নং চিত্র দেখ)। এ ব্যাপারে বড় আশ্চর্য্য, এবং রঙ্গটেন রশ্মি দ্বারা দীপনক যবনিকার যেরূপ ছায়াছবি দেখা যায়, তাহা তদনুরূপ হইলেও, ঠিক তাহার বিপরীত। রঙ্গটেন রশ্মির প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থ মাখান যবনিকা উজ্জ্বল হইয়া উঠে; যে সকল পদার্থ ভেদ করিয়া

রশ্মি যাইতে পারে না, তাহাদের ছায়াস্থান উজ্জ্বল হইতে পারে না, সুতরাং উজ্জ্বল ক্ষেত্রের উপর সেই সকল পদার্থের কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি দেখা যায়। লিবনের পরীক্ষিত ব্যাপারটিও ঠিক সেইরূপ। উদ্দীপিত যবনিকার উপর "কৃষ্ণ আলো" পড়িবামাত্র যবনিকার উজ্জ্বলতা চলিয়া গেল। কেবল যে পদার্থ ভেদ করিয়া সেই "কৃষ্ণ আলোক" রশ্মি আসিতে পারিল না, তাহারই ছায়াস্থান উজ্জ্বল রহিল। রঙ্গটেন রশ্মিতে অনুজ্জ্বল রাসায়নিক যবনিকা উজ্জ্বল হয়, লিবনের রশ্মিতে উজ্জ্বলীকৃত রাসায়নিক যবনিকা দীপ্তিহীন হইয়া যায়। রঙ্গটেন রশ্মির বেলায় অনুজ্জ্বল যবনিকার ছায়াস্থান অনুজ্জ্বলই থাকে।

লিবনের রশ্মি ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া পদার্থ সকলের ছায়া-ছবি উঠান যায় (৩নং চিত্র দেখ)। লিবনের উদ্দীপনশীল রাসায়নিক পদার্থের দীপ্তিমত্তা অতি ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই সকল চমৎকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিশেষ সাবধানতাপূর্ব্বক খুব শীঘ্র দেখিয়া লইতে হয়। অন্ধকার ঘরেই এই সকল পরীক্ষা দেখিবার সুবিধা। লিবঁ দিবালোকে ঘরের মধ্যে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য এক যন্ত্র তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলেন। একটা কাল কার্ডবোর্ডের বাক্সের এক ধারের প্রাচীর কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে তাঁহার রাসায়নিক পদার্থ মাখান যবনিকা বসাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তাহারই সম্মুখে বাক্সের অপর দিকে একটা ছিদ্র করিয়া লইলেন। যবনিকাটিতে ক্ষণকাল সূর্য্যালোক বা তাড়িতালোক পাতিত করিয়া উদ্দীপিত করিয়া বাক্সের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করিতে হইবে।

এখন কোন কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে মুদ্রা মেডেল প্রভৃতি দ্রব্য রাখিয়া সেই বাক্সটা এই যন্ত্রের যবনিকার পার্শ্বে রাখিয়া কোন ল্যাম্পের দিকে ফিরাইলে, যন্ত্রের ছিদ্রপথ দিয়া যবনিকার উপর সেই বাক্সস্থিত মুদ্রা বা মেডেলের উজ্জ্বল ছায়া দৃষ্ট হইবে (২নং চিত্র দেখ)।

সাহিত্য । ভাদ্র ১৩০৭ । পৃ. ২৯২-২৯৮
আশ্বিন ১৩০৭ । পৃ. ৩৫১-৩৬১
চৈত্র ১৩০৭ । পৃ ৭৩৯-৭৪৫

উদ্ভিদের বংশবিস্তার

সূচনা ;—আত্মরক্ষা

জীবন-সংগ্রামে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মূলনীতি অপরিহার্য্য। আত্মরক্ষার জন্য জীবকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যাহার শরীরে বল অধিক, সে শত্রুর বিনাশ-সাধন করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লয়। যাহার শারীরিক বল নাই, সে বুদ্ধিবলে শত্রুর সংহার করে। যে শত্রুর বিনাশসাধনে অক্ষম, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাধান্যে পরাজিত হইয়া এমন স্থানে পলাইয়া যায়, যেখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, বা থাকিলেও তদপেক্ষা দুর্ব্বল। যাহাদের শারীরিক বল নাই, বুদ্ধি-চাতুরী বা ছলনাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। যাহাদের বল অধিক, আত্মরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনের ক্ষমতা অধিক, তাহারাই রক্ষা পায়; যাহারা অক্ষম বা অযোগ্য, তাহারা নির্ব্বংশ হয়।

সংসার-ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় অন্নের সংস্থান করিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক জীবকেই সর্ব্বদা বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ধরণীতল সীমাবদ্ধ; জীবসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল। সংসারে যে পরিমাণ আহার্য্য মিলে, বিবর্দ্ধনশীল জীব-পরিবারের ভোক্তার সংখ্যার অনুপাতে তাহা প্রচুর নহে। তাই সকলকেই অন্নের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নিজের দেশে জন্মস্থানে যাহাবা পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারাই অতিকষ্টে আপনাদের আহারের সংস্থান করিতেছে;— নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে। সুতরাং সকলের পক্ষে 'দেশে' থাকা সুবিধাজনক নহে; অনেককে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে অন্ন খুঁজিতে যাইতে হয়। শ্বেতদ্বীপে অন্নলাভ অতি কষ্টসাধ্য, তাই শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণদ্বীপে উড়িয়া গিয়া জুড়িয়া বসেন! শ্বেতাঙ্গের বাহুবল অধিক না থাকুক, বুদ্ধিবল ও 'সাধন' অধিক। ফলে আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও আফ্রিকায় ধবল আগন্তুকের সবল সন্তানের প্রচুর বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি, এবং তত্রত্য শ্যাম অধিবাসীর দুর্ব্বল বংশের দ্রুতক্ষয় ও আচিরভাবী উচ্ছেদ।

মধ্যভারতের উপলবন্ধুর প্রান্তর ও বালুকাময় মরুভূমে অন্ন সহজলভ্য নহে, তাই লোটা ও কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া মারওয়াড়ী বহুদূরবর্ত্তী বিদেশে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে

যায়। বহুজনাকীর্ণ জাহ্নবীকূল হইতে হিন্দুস্থানী আসামের চা বাগানে, ব্রহ্মদেশের খনিতে, দেমারারা ও মরিশসের ইক্ষুক্ষেত্রে মজুরী খাটিতে যায়। বন্যাপ্লাবিতা বা শুষ্কসলিলা মহানদীর চিরদুর্ভিক্ষক্লিষ্ট তীরভূমি হইতে দারিদ্র্যপীড়িত উড়িয়া দলে দলে বঙ্গদেশে আসিয়া নানা উপায়ে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে। চীনদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক, তাই চীনা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে আসিয়া অন্নের সংস্থান করে। বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত ধনী, অন্নের অভাব এখনও অত্যন্ত অধিক বোধ করে নাই, তাই বাঙ্গালীকে দলে দলে বিদেশে অন্নের চেষ্টায় এখনও যাইতে হয় নাই। তাঁহাদের এ অবস্থাও অধিক দিন থাকিবে না!

মানুষের যে অবস্থা, জীবরাজ্যের প্রত্যেক প্রাণীরাই সেই অবস্থা। আফ্রিকায় যে বনে বেবুনের দল ফল মূল খাইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিল, এখন আর সে বনে তাহাদের যথেষ্ট আহার্য্যের সংস্থান হইতেছে না, তাই তাহারা সদলে অন্য বনে আশ্রয় লইতেছে। দলমধ্যে সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং সেই দলে জাত অনেক তরুণ-বয়স্ক স্ব-দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গিয়া নূতন দলের গঠন করিতেছে। হস্তিযূথ বহুকাল একই গিরিবনে বিচরণ করে না, আহারের অন্বেষণে পর্ব্বতান্তরের আশ্রয় লয়। যে সকল প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদিগকে প্রায়ই এক বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনস্থলীতে যাইতে হয়। যে সকল পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদিগকেও আহারের অন্বেষণে এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া বহুযোজন দূরে অন্য স্থানে যাইতে দেখা যায়। এইরূপ, বাদুড়, কোন কোন জাতীয় মূষিক, এমন কি, পিপীলিকা, পঙ্গপালাদি নিকৃষ্ট প্রাণী কীটপতঙ্গাদিকেও জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া বিদেশে 'উপনিবেশ-স্থাপন' করিতে যাইতে দেখা যায়।

পশুপক্ষীদের মধ্যে এরূপ দেখা যায় যে, শিশুসন্তান যতদিন অসহায় থাকে ও উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তত দিন মাতা নিজের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া সন্তানের লালন পালন করে। সন্তান একটু বয়োধিক ও আহার অন্বেষণে সক্ষম হইয়া উঠিলে তাহার সহিত জননীর সমস্ত সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া যায়। তখন খাদ্য লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। যে অপেক্ষাকৃত বলবান, সে দুর্ব্বলকে তাড়াইয়া খাদ্য ভক্ষণ করে। কুকুর, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, হরিণ, বানর প্রভৃতি সকল পশুর সন্তানই যথা কালে পিতামাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। জননীরাও, যাহাতে সন্তানের শীঘ্র শীঘ্র নিজে 'করিয়া খাইতে পারে' সেই বিষয়ের শিক্ষাদানে তৎপর হয়।

প্রাণী সম্বন্ধে যে কথা, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধেও সেই কথা। উদ্ভিদের জীবনবৃত্তিও প্রাণীরই অনুরূপ। জীবনধারণের জন্য তাহাকেও আহার্য্যের আহরণ করিতে হয়, বংশরক্ষার জন্য তাহাকেও সন্তান-উৎপাদন করিতে হয়। প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক এক বৃক্ষে কত ফল ও কত বীজ জন্মে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে।

অহিফেন বা পোস্তগাছের এক একটি 'ঢেঁড়ি' বা বীজকোষে এক হাজার পর্য্যন্ত বীজ থাকে। শিয়ালকাঁটার এক একটি বীজকোষে দুই তিন শত বীজ থাকে। ভুট্টার এক একটি কাণ্ডে দুই হাজার বীজ থাকে। কুকুরশোঁকার একটি গাছে, বা হোগলাজাতীয় ঘাসের একটি শীষে ছয় সাত হাজার বীজ থাকে। একটি তামাক গাছে তিন লক্ষ বীজ জন্মে। একটি বটগাছে কত ফল জন্মে! সেই একটি ফলে কত বীজ জন্মে! সমস্ত গাছটিতে একবারে কত বীজ জন্মে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, সকলগুলির সকল বীজই যদি মৃত্তিকায় অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইত, তাহা হইলে স্থানাভাবে ও রসাভাবে সকলগুলিই বিনষ্ট হইত। কিন্তু সকল বীজই ভূমিতে পতিত হয় না, হইলেও অঙ্কুরিত হইবার মত অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কত বীজ শুকাইয়া ও পচিয়া নষ্ট হয়। কত বীজ কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ও মানবের উদরসাৎ হইয়া তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে। অতি অল্পসংখ্যক বীজই অঙ্কুরিত হয়; আবার যতগুলি অঙ্কুরিত হয়, তাহাদের সবগুলিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। নানাপ্রকার প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত যে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতে সনাতন নিয়মানুসারে সবল ও যোগ্যতমেরা রক্ষা পায়, দুর্ব্বল ও অযোগ্যেরা বিনষ্ট হয়। যে সকল গাছপালা বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি তৃণভোজী পশু ও মানবের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া অকালে বিনষ্ট হয়। সুতরাং অতি অল্পসংখ্যক বীজই অবশেষে গাছে পরিণত হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবনের পূর্ণতা লাভ করে।

এক একটি গাছ হইতে উৎপন্ন প্রভূত বীজরাশির মধ্য হইতে অতি অল্পসংখ্যক বীজই, বৃক্ষে পরিণত হয়। এই অল্পসংখ্যকের মধ্যেও যদি সমস্ত বীজ, মূল বা উৎপাদক বৃক্ষের ঠিক তলদেশে পতিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকেও অচিরে অনাহারে বিনষ্ট হইতে হইত। জননী-বসুন্ধরার বক্ষঃস্থিত রসপীযুষ সহস্র মূলের পোষণ করিতে করিতে সহসা যদি লক্ষকণ্ঠে শোষিত হইত, তাহা হইলে অল্পদিনেই রসপায়ীদিগের কোমল কণ্ঠে আর রস মিলিত না। এতদ্ব্যতীত বৃক্ষতলের অল্পায়তন স্থানে বহুসংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষশিশুর দেহাবয়বের যথাযথ বিস্তার ও প্রসার হইতে পারিত না;— পক্ষান্তরে তাহারা পরস্পর সংপীড়িত ও পিষ্ট হইত, এবং অত্যন্ত ঘনসন্নিবেশ ও মস্তকোপরিস্থ মূলবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ঘনচ্ছায়াবরণের ফলে, জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদান — বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাবে, বিনষ্ট হইত।

এমন অনেকপ্রকার উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ্‌দেহের প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধাতব পদার্থ অতি শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষ করিয়া ফেলে। সেই জাতীয় কোনও উদ্ভিদের অনেকগুলি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোন স্থানে একত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্রমশঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে সেই নিঃশেষিত-সার মৃত্তিকা হইতে আর কোনওমতেই জীবন-রস টানিয়া বাহির করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই বুদ্ধিমান কৃষক একই স্থানে

উপর্য্যুপরি একই প্রকার ফসলের চাষ না করিয়া বিভিন্নপ্রকার ফসল উৎপন্ন করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদ্‌বীজ মূলবৃক্ষ হইতে যত দূরে ছড়াইয়া পড়িবে, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার ও বংশলোপের আশঙ্কা হইতে নিস্তার পাইবার পক্ষে ততই সুবিধা ঘটিবে, এবং দৈবাধীন শুভঘটনাক্রমে যে সকল বীজ অনুকূল অবস্থায় পতিত হইবে, তাহারাই অঙ্কুরিত ও পরিণত হইয়া বংশব্যাপ্তির সহায়তা করিবে।

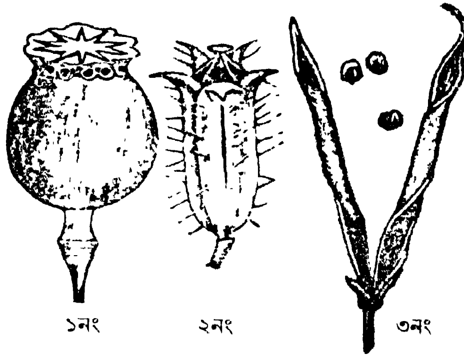
প্রাণীর হস্তপদ আছে, স্বেচ্ছাক্রমে যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারে। এক স্থানে আহার না জুটিলে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। উদ্ভিদ্ কি করিবে? সে চলচ্ছক্তিরহিত; ভূতলে বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে আজন্ম একই স্থানে অতিবাহিত করিতে হয়; অথচ প্রাণীর ন্যায় তাহাকেও জীবনধারণের জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতে ও সংগ্রাম করিতে হয়। সেই জন্য বৃক্ষ এক স্থানে এক স্থানে বদ্ধমূল থাকিলেও, তাহার অপত্যগণের দূরদেশে নূতন স্থানে গিয়া নির্ব্বিবাদে ও সহজে জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতি অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অনেক রকমের গাছ নিজে স্বকীয় প্রক্ষেপণ শক্তির দ্বারা দূরে বীজ-বিকীরণ করে। বায়ুপ্রবাহ ও জলস্রোত বীজব্যাপ্তির প্রধান সহায়। পশুপক্ষী ও মনুষ্য দ্বারা ও নানাপ্রকার উদ্ভিদের ফল ও বীজ দেশদেশান্তরে নীত ও পরিব্যাপ্ত হয়।

আত্মশক্তিতে বীজব্যাপ্তি

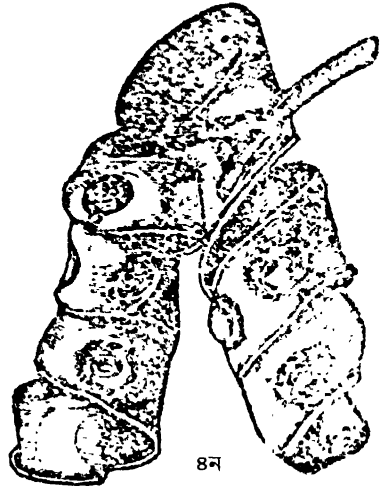
সাধারণতঃ, ছোট ছোট গাছপালার, বিশেষতঃ ওষধির ফল ও বীজ পাকিয়া গাছতলাতেই ঝরিয়া পড়ে। তজ্জন্য তাহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। বীজ পাকিলেই এই সকল গাছপালার আয়ুঃশেষ হয়। সুতরাং উদরায়ের জন্য সন্তানের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব বাধিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল গাছপালার আকার আয়তনও খুব ছোট, এবং ইহাদের শিকড়ও মৃত্তিকার ভিতর বহু দূর প্রবিষ্ট হয় না, উপরে উপরেই থাকে. বীজ গাছতলায় পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য হয় না।

যথাকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ফল, বা ফল ফাটিয়া বীজ, গাছতলায় পড়াই বীজব্যাপ্তির প্রথম ও সহজ উপায়। এতদপেক্ষা ঈষৎ উন্নত উপায় বা কৌশল পোস্ত, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছে দৃষ্ট হয়। এই সকল গাছের বীজকোষ পাকিলে লম্বালম্বি বিদীর্ণ হইয়া একেবারে ব্যাপ্তমুখ বা "হাঁ" হইয়া পড়ে না। বীজকোষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত হয়, অথবা তাহা আংশিকরূপে ফাটে, এবং কোষটি এমন ভাবে অবহিত থাকে যে, মধ্যস্থ বীজগুলি অল্পে অল্পে বিদারণমুখের সঙ্কীর্ণ পথে বাহির হইয়া বায়ুপ্রবাহজনিত আন্দোলনের ফলে গাছ হইতে কিয়দ্দূরে ছড়াইয়া পড়ে। পরিপক্ক হইলে পোস্তর ঢেঁড়ির (১নং) শীর্ষপ্রদেশে চতুষ্পার্শ্বে দশটি ছিদ্র হয়। শিয়াল কাঁটার (১নং) বীজকোষের শীর্ষপ্রদেশ ফাটিয়া

পাঁচটি ও ক্যাম্পিয়ানের বীজকোষ ফাটিয়া দশা মুখ হয়। বঙ্গদেশের মাঠে ঘাটে বর্ষে বর্ষে এক প্রকার আগাছা হয়ে (Campanula dehisens), তাহা এক ফুট উচ্চ হয়, পত্র শলাকার ও দন্তযুক্ত, শীত ও বসন্তকালে সাদা সাদা ঘণ্টাকার ফুল হয়। ইহার অণ্ডকৃতি ছোট ছোট বীজকোষের মধ্যে আসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। বিদারণসময়ে বীজকোষের অগ্রভাগ ফাটিয়া পাঁচটি মুখ হয়। এই জাতীয় অন্যান্য গাছের বীজকোষের শীর্ষপ্রদেশের চতুষ্পার্শ ছিদ্রযুক্ত হয়। পাবনান্দোলনে সেই সকল রন্ধ্র বা ফাঁক দিয়া বীজগুলি চতুর্দ্দিকে ছুট্‌কাইয়া পড়ে। এইরূপ অনেক রকমের গাছপালা আছে, যাহাদের পরিপক্ক বীজকোষ হইতে বীজ সকল শাখার আন্দোলনে দূরে ছড়াইয়া পড়ে. বনে জঙ্গলে এমন অনেক লতা বা ঝোপগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরিপক্ক, শুষ্ক, স্ফীত ও ফাঁপা, ঈষৎ-উন্মুক্ত বীজকোষের মধ্যে বীজ সকল আল্‌গা হইয়া থাকে; বীজকোষ নাড়া পাইলেই তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। নাড়িলে ঝম্ ঝম্ শব্দ হয়, এই জন্য এইরূপ কোন কোন ফলকে "ঝুম্‌ঝুমি" নামও দেওয়া হইয়াছে।



এমন অনেক গাছ আছে, যাহারা নিজের বীজ নিজেই ছড়াইয়া দেয়। ইহাদের ফল বা বীজকোষের গঠনপ্রণালী এইরূপ যে, বীজ পাকিলে সেই কোষ বা পুটদেহ শুষ্ক হইয়া তাহাতে এত টান পড়ে যে, কোষ-কপাট সকলের সন্ধি সহসা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বীজকোষ সশব্দে "স্প্রিং" এর ন্যায় সবেগে দ্বিধা বা বহুধা ভিন্ন হইয়া যায়, এবং মধ্যস্থিত বীজগুলি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আাকন্‌থেসি (Acanthaceoe) বংশীয় অনেক গাছের



বীজকোষ ঐরূপ সবেগে ফাটিয়া যায়। তাহাতে মধ্যস্থ বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বোপকূলের অনেক লোনা হ্রদ ও খালবিলের ধারে এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এক প্রকার কণ্টকময় ঝোপগাছ সচরাচর দৃষ্ট হয়। তাহার বড় বড় নীল ফুল হয়। নাম হরিকুশ বা 'হাকুঁচ-কাঁটা' (Acanthus illicifora)। ইহার বীজকোষ ছোট ডিমের মত; বিদারণ সময়ে সবেগে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ বংশীয় নীললতা (Thunbergia) বঙ্গদেশের ঝোপে জঙ্গলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ লতানে ; পাতা পানের পাতার ন্যায়; ফুল বড় বড়, প্রায় চার ইঞ্চ চৌড়া, ঘণ্টাকার, নীল। ইহার ফল বা বীজকোষ গোল ও চঞ্চুযুক্ত, পাকিলে সবেগে দ্বিখণ্ড হইয়া বিক্ষেপ করে। ঐ বংশের অন্তর্গত কুরণ্টক বা কাঁটা জাতি (Barleria prionites), সাদা জাতি B. dichotoma) দাসী (B. coerulea), কালমেঘ (Justicia paniculata), কাঁটাকলিকা (Ruella longifolia) প্রভৃতি গাছের বীজকোষও বেগে স্ফোটনশীল ও বীজবিক্ষেপকারী।

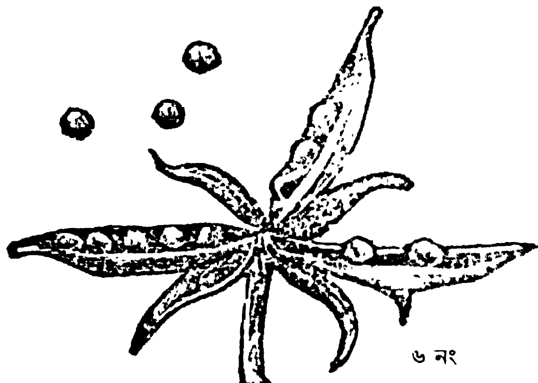




৫ নং

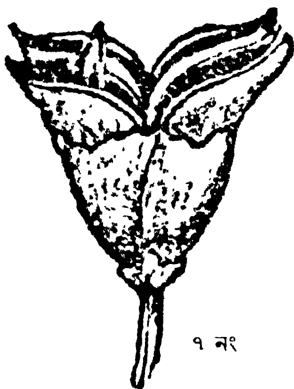
শিম্বী-বংশীয় (Leguminoe) অনেক গাছের "ছড়া" বা শিষ (৩ নং) ফাটিয়া তাহার কপাট দুখানি সবেগে 'স্ক্রু' আকারে গুটাইয়া যায়, তাহাতেই বীজগুলি দূরে ছটকাইয়া পড়ে। অনেক প্রকাব মটর ও শিমের বীজ ঐ প্রকারে বীজকোষ হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। রক্তচন্দনের (Adenanthera Pavonina) খুব বড় বড় গাছ হয়, তাহার ছড় বা শিমও, বেশ, বড় বড় হয়। তাহা পাকিয়া শুষ্ক হইলে সশব্দে লম্বালম্বি ফাটিয়া যায়, এবং দুই অংশ বা কপাট সবেগে বহির্মুখ হইয়া গুটাইয়া যায় (৪ নং) তাহাতে কপাটসংলগ্ন রক্তবর্ণ বীজগুলি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। গর্স (Gorse, furze; Ulex Europeoes) নামে এক প্রকার ছোট কাঁটা গাছ আছে; তাহার মটরের মত শুঁটি হয়। শুঁটির মধ্যে বীজ যখন বেশ পুষ্ট হয়, তখন বীজে পরিপূর্ণ শুঁটিটা বেশ ফোলা ও টান হইয়া থাকে। বীজ পাকিলে ক্রমে রস শুকাইয়া শুঁটির কপাট দু'খানির পার্শ্বভাগ আকুঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু দুই ধারের পর্শুকার ন্যায় শক্ত অংশ তাহাদিগকে স্বস্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখে। অবশেষে যখন এক দিন রৌদ্রতাপে বীজকোষ শুষ্ক হইয়া এত আকুঞ্চিত হইয়া যায় যে, দুই পার্শ্বের কঠিন পর্শুকাও আর কপাট দু'খানিকে প্রসারিত

ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখন কপাট দু'খানি সশব্দে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহসা সবেগে গুটাইয়া যায়, এবং কোষমধ্যস্থ সমস্ত বীজকে "গুলির" ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে। ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে অনেক স্থানে ঐরূপ অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ইহাদের ফল পাকে সেই সময়ে যে বনে ঐ প্রকারের গাছ অনেক থাকে, সেই বনে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিলে চারিদিকে ফল ফাটিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।



৬ নং

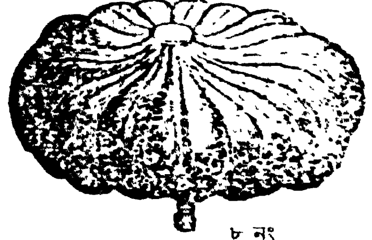
সকলেই দেখিয়াছেন, দোপাটি ফুলের সুপক্ক বীজকোষ স্পর্শ করিবামাত্র ফাটিয়া গিয়া কোষের (৫নং) প্রত্যেক অংশ বা কপাট গুটাইয়া যায়, এবং বীজগুলি দূরে ছটকাইয়া পড়ে। আমরুলের (oxalis acetosa) বীজকোষও দোপাটির বীজকোষের ন্যায় সবেগে ফাটিয়া যায়। জিরে-নিয়ামের ফল পাঁচটি বীজকোষের সমষ্টি। এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে। ফলের মধ্যস্থিত উন্নত দণ্ডের নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে কোষগুলি অবস্থিতি করে। প্রত্যেক কোষের শীর্ষভাগ বন্ধনীর ন্যায় সরু ও লম্বা, এবং তাহা দণ্ডে সংলগ্ন হইয়া দণ্ডাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বীজ পাকিলে ফলটি উৰ্দ্ধমুখ হয়, এবং বীজকোষের বন্ধনীর ন্যায় অংশে খুব টান পড়িতে থাকে; অবশেষে কোষগুলি ফাটিয়া দণ্ড হইতে আল্‌গা হইয়া যায়, এবং বন্ধনীগুলিও দণ্ডের মধ্যভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, "স্প্রিং"এর মত হঠাৎ বাঁকিয়া উপর দিকে উঠিয়া পড়ে, এবং সেই আকর্ষণের বলে বা ঝাঁকড়ানির চোটে, বীজ বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ওট (oat, avenasativa) পাকিলে বৃন্ত বা পুষ্পকুণ্ড হইতে বীজ এত জোরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, পরিষ্কার শুষ্ক দিনে সুপক্ক ওটক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে ওট নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়।



৭ নং

কোন রসাল পাকা ফল অঙ্গুলির দ্বারা ধরিয়া চাপিলে যেমন তাহার মধ্য হইতে বীজ বেগে বাহির হইয়া পড়ে, কোন কোন ফল সঙ্কুচিত হইয়া নিজে নিজেই এইরূপে চাপিয়া

বীজ বাহির করিয়া দেয়। ভায়োলেট (Violet canina) ফুলের বীজ পাকিলে বীজকোষ তিন ভাগে ফাটিয়া যায়, কিন্তু তাহার মুখ উপর দিকে থাকে (৮)। প্রত্যেক কপাট ক্ষুদ্র ডোঙ্গার মত ও তাহাতে তিনটি হইতে ছয়টি বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজ সূত্রবৎ বন্ধনী বা নাভিরজ্জু দ্বারা কোষ-কপাটের সহিত সংযুক্ত থাকে। সেই জন্য বীজকোষ ফাটিয়া যাইবামাত্র বীজ বাহির হইয়া পড়ে না। নৌকাকার কপাট তিনখানি ক্রমেই যত সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহাদের দুই পার্শ্ব বা ধার তত পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়; অবশেষে মধ্যস্থলের বীজগুলিকে চাপিয়া ধরে; কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বীজগুলি এই চাপ সহ্য করে; পরে চাপের আধিক্যে বীজের নাভিরজ্জু ছিন্ন হইয়া যায় এবং বীজ আট দশ ফিট দূরে ছিটকাইয়া পড়ে।



৮ নং

আমেরিকার উইচ হেজল (Hamamclis virginica) ফলও ঐ প্রকারে চাপিয়া বীজ বাহির করিয়া দেয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিস্ ও মধ্য আমেরিকা প্রদেশে ইউফরবিয়েসি (Euphorbiaceoe) বংশীয় হুরাক্রেপিটান্স্ (Hura crepitans) বা স্যাণ্ডবক্স নামক ফলও অতিশয় স্ফোটনশীল। এই ফল বার হইতে আঠার ভাগে বিভক্ত। পাকিলে ইহার প্রত্যেক ভাগ বা কোষ পিস্তলের



৯ নং

ন্যায় শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়, এবং সেগুলি এত বেগে নিক্ষিপ্ত হয় যে, নিকটে কেহ থাকিলে তাহাকে গুরুতর আঘাত পাইতে হয়।

ইউরোপের দক্ষিণভাগে ফুটি-বংশীয় (Cucurbetacoe)এক প্রকার গাছ হয়, তাহাকে মর্ম্মডিকা ইলেট্রিয়াম (Mormodica বা Eclabium Elatrium) বলে। ইহার ফুটি পাকিলে সহসা বৃন্তচ্যুত হয়, এবং ফলপ্রাচীরও তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হয়। তজ্জনিত চাপে ফলমধ্যস্থ বীজ ও তরল মজ্জা সেই বিচ্ছেদস্থানের কোমল অংশ ভেদ করিয়া অতি বেগে উদ্গীরিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

বৃক্ষের স্বীয় আকুঞ্চনশক্তির বলে যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বৃক্ষ হইতে কিয়দ্দূরে গিয়া পড়িলেও, বহু দূরে যাইতে পারে না। এই উপায়ে যে বীজ বিকীর্ণ হয়, তাহা কেবল বৃক্ষমূল হইতে কিছু দূরে পড়ে বলিয়াই রক্ষা পায়; নতুবা বায়ু ও আলোকের অভাবে বিনষ্ট হইত। যে সকল গাছে এই কৌশল আছে, সে সকল গাছ প্রায়ই ছোট ছোট, অথবা তাহাদের আয়ু বীজোৎপাদনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; এই জন্য ইহাদের বীজ বৃক্ষমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফাঁকা যায়গায় পড়িলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

বড় বড় গাছের বীজ বহু দূরে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাই তাহার বীজ-বিকীরণের উপায় ভিন্ন। যে সকল ক্ষুদ্র গাছের বীজ বহু দূরে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহাদের বীজেও এমন কৌশল আছে যে, তাহা বহু দূরে নীত হইতে পারে। বহুদূরব্যাপক বীজগুলি প্রায়ই লঘু ও পক্ষযুক্ত, পবনদেব সেই সকল বিস্তীর্ণপক্ষ লঘু বীজকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া শূন্য মার্গে বহুদূরবর্ত্তী দেশে লইয়া যান। কোন্ কৌশলে কি উপায়ে পবন দ্বারা বীজব্যাপ্তির সহায়তা হয়, তাহা আগামী বারে বলিব।

সাহিত্য। কার্ত্তিক ১৩০৮। পৃ: ৪৩৫-৪৪৪।

মূষিকাদি

দন্তুরবর্গীয় জন্তুদিগের মধ্যে মূষিকবংশীয় জন্তুগণই সংখ্যায় অধিক, এবং বহু প্রকারের দেখা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই বংশীয় জন্তুর বাস। এই বংশের প্রায় সকল জাতীয় জন্তুই মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। অধিকাংশেরই লেজ লম্বা, শল্কযুক্ত ও লোমহীন, এবং প্রায় সকলেরই পিছনের ও সামনের পা সমান লম্বা হয়। ইহাদের ছেদনদন্ত খুব সরু ও বর্দ্ধনশীল; প্রত্যেক মাড়ীতে তিন যোড়ার বেশী চর্ব্বণ-দন্ত থাকে না। প্রায় সকলেরই সম্মুখের পায়ের প্রথম বা বুড়া আঙ্গুল লুপ্ত প্রায়, পিণ্ডবৎমাত্র বিদ্যমান থাকে।

এই বংশীয় জন্তুগণ আটত্রিশটি 'গণে' ও প্রত্যেক 'গণ' বহু 'জাতি'তে বিভক্ত। এই সকল 'গণে'র মধ্যে মূষিক বা ইন্দুর, জেব্‌রিল, হ্যাম্‌ষ্টার, ভোল্, লেমিং ও মস্কোয়াস্ প্রধান।

ইন্দুরের শরীরের গড়ন হাল্‌কা ও সুঠাম। শরীরের তুলনায় কাণ ও চোখ বেশ বড়। কাণের বাহির দিক লোমশূন্য। চোখ দুটী গোল-গোল, ভাসা ভাসা ও উজ্জ্বল। মুখ লম্বা, সরু ও সুচাল। মুখাগ্র লোমশূন্য। লেজ লম্বা, গ্রন্থিল, লোমশূন্য, আঁইস বা শল্কযুক্ত। দেহের বর্ণ একরঙ্গা, ধূসর, বা মেটে।

ইহারা নিশাচর। সাপ, বেজি, চিল, শকুনি প্রভৃতি দেখিতে পাইলেই ইহাদিগকে নষ্ট করে; এই জন্য ইহারা দিনের বেলায় বাহির হয় না। রাত্রি কালে প্যাঁচা ছাড়া অন্য শত্রুর হাতে বড় একটা পড়িতে হয় না, তাই রাত্রিকালে প্যাঁচা ছাড়া অন্য শত্রুর হাতে বড় একটা পড়িতে হয় না, তাই রাত্রি কালে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। ইহারা সর্ব্বভুক্। শস্য ও ফল মূল ত খায়-ই, তা ছাড়া মাছ মাংসও খায়। ইহাদিগকে পাখীর ছোট ছোট ছানা ও ডিম খাইতেও দেখা যায়।

শস্যক্ষেত্র, বাগান, মানুষের বাসগৃহ, গোলা, জাহাজ প্রভৃতি যে সব স্থানে সর্ব্বদা প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী থাকে, সেই সব যায়গায় ইন্দুর বাস করে। ইহারা বৎসরে তিন চার বার সন্তান প্রসব করে, এবং প্রত্যেক বারে অনেকগুলি ছানা জন্মে। অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে, ইহারা মানুষের বড়ই ক্ষতিকর হইয়া উঠে। তখন ইহাদের বিনাশের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ইন্দুর বা মূষিকগণের এক শত পঞ্চাশ 'জাতি'র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক ভারতবর্ষেই প্রায় চল্লিশ জাতীয় মূষিক দেখা যায়।

প্রাচীন ভূখণ্ড অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা দেশে মূষিকের বাস। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মূষিক ছিল না। আজকাল আমেরিকার অনেক বন্দরে বিস্তর মূষিক

দেখা যায়। ইহারা বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া নীত হইয়াছে, আদিম নিবাসী নহে। শস্যপূর্ণ বাণিজ্য-জাহাজ এ দেশের কোন বন্দরে কিছু দিন থাকিলে, সেই বন্দরের অনেক ইন্দুর শস্যের লোভে সে জাহাজে গিয়া আশ্রয় লয়। অল্প কালেই সেই জাহাজে তাহাদের বাচ্চা জন্মিয়া পাল বাড়িয়া যায়। পরে সেই জাহাজ সমুদ্রপথে দূর দেশের কোনও বন্দরে উপস্থিত হইলে অনেক ইন্দুর সেই জাহাজ হইতে তীরে নামিয়া যায়, অথবা শস্যের বস্তার সহিত তীরে নীত হয়, এবং সেই বন্দরে আশ্রয় লইয়া তথায় তাহাদের বংশবিস্তার করে। এই কারণে যে সকল দেশে পূর্ব্বে মোটেই ইন্দুর ছিল না, আজ কাল সে সব দেশেও অনেক ইন্দুর দেখা যায়।

ইন্দুর ছোট ও বড় দুই রকমের হয়। ছোট রকমের ইন্দুরদের নেংটি বা নিংটা ইন্দুর বলে, আর বড় রকমের ইন্দুরদের ধেড়ে ইন্দুর বলা যাইতে পারে।

বড় বা ধেড়ে ইন্দুরদের দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের ধেড়ে ইন্দুর লোকের বাসগৃহে ও শস্যের গোলায় গর্ত্তে বাস করে। ইহাদিগকে গৃহমূষিক বা ঘোরো ইন্দুর বলা যায়। আর এক দলের ধেড়ে ইন্দুর আছে; তাহার মাঠেও শস্যক্ষেত্রে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। ইহাদিগকে ক্ষেত্রমূষিক বা মেঠোইন্দুর বলা যায়।

ক্ষেত্রমূষিক আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়। মাথার হাড়ের দীর্ঘতা, চোখের নীচের হাড়ের উচ্চতা, এবং শরীরের পরিমাণে লেজের দীর্ঘতা অনুসারে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

এশিয়া প্রদেশের বড় বড় মেঠো ইন্দুর প্রধানতঃ তিন দলের দেখা যায়।

প্রথম দলের মেঠো-ইন্দুরগুলি খুব বড় বড় হয়। তাদের গায়ের লোম কর্কশ ও শক্ত, মাথার খুলি লম্বা ও সরু, লেজ দেহ ও মুণ্ডের সমান দীর্ঘ, পা চারিখানিও বেশ বড় বড়। ইহাদের স্ত্রীজাতির ছয় যোড়া বা বারটি স্তন থাকে। দাক্ষিণাত্যের কাণাড়ী ভাষায় ইহাদের নাম 'পাণ্ডিকোকু'র শূয়রে-ইন্দুর; তাহা হইতে ইংরাজিতে 'ব্যাণ্ডিকুট্' নাম হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'ইগড়ে' বলে।

দ্বিতীয় দলের মেঠো-ইন্দুর আকারে পূর্ব্বোক্ত দলের ইন্দুর অপেক্ষা একটু ছোট হয়। তাদের লেজ, শরীর ও মুণ্ডের দৈর্ঘ্যের ৪/৫ হয়। তাহাদের দু'জাতির বুক হইতে তলপেট পর্য্যন্ত আট মোড়া বা যোলটি স্তন থাকে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'গুনোমিস্' অর্থাৎ 'বহুপ্রসূ' বলে; কারণ, ইহাদের এক এক বারে আটটা হইতে বারটা করিয়া ছানা জন্মে।

তৃতীয় দলের মেঠো-ইন্দুর পূর্ব্বোক্ত দুই দলের ইন্দুর অপেক্ষা ছোট হয়। তাদের লেজ, শরীর ও মুণ্ডের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক হয়। সম্মুখের কর্ত্তন-দন্ত অধিকতর চ্যাটাল, এবং কষের চর্ব্বণ-দন্ত অধিকতর বড় হয়। স্ত্রীজাতির বুকে দুই যোড়া ও পেটে দুই যোড়া, মোট চার যোড়া বা আটটি স্তন থাকে। ইহাদের এক একবারে দুইটা হইতে চারিটা বাচ্চা জন্মে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'নেসোকিয়া' বলে।

ব্যাণ্ডিকুটের গায়ের লোম কর্কশ; মাথা,গলা ও দুই পাশের লোম কোমল। গায়ের উপর দিকের রঙ্গ মেটে; পেটের দিকে ধূসর; নাক, কাণ, পায়ের পাতা লাল্চে। লেজ কাল, তাতে লোম থাকে না; থাকিলেও দু'চারি গাছি মাত্র। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চ, এবং লেজ ১২ কি ১৩ ইঞ্চ লম্বা হয়। ওজনে এক একটা দেড় সের ভারি হয়। ইহারা গোলার শস্য,বাগানের ফল মূল ও হাঁস, মুর্গীর ছানা ও ডিম খাইয়া লোকের বড় ক্ষতি করে। কলিকাতার গড়ের মাঠে ও অন্যত্র বড় বড় পুকুরের পাড়ে গর্ত্তে ব্যাণ্ডিকুট বাস করে। বঙ্গে অন্যত্র বিরল। বোম্বাই প্রদেশে ব্যাণ্ডিকুট কদাচিৎ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে যে সব ব্যাণ্ডিকুট দেখা যায়, তাহারা বাঙ্গালা দেশের ব্যাণ্ডিকুট অপেক্ষা একটু বড় হয়। মান্দ্রাজ নগরে ব্যাণ্ডিকুট এত অধিক দেখা যায় যে, সেখানে লোকেরা প্রত্যহ লাঠীর আঘাতে এক শতেরও অধিক বিনাশ করে। খুব বড় বলিয়া ইন্দুর-ধরা কলে ধরা যায় না, ঠেঙ্গাইয়া মারিতে হয়। মান্দ্রাজে ইহারা ঘরের ভিতর বড় একটা বাস করে না; ড্রেণ, নদ্দমা, গোয়াল-ঘর ও আস্তাবলে বাস করে।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় ব্যাণ্ডিকুট দেখা যায়; তাহারা আকারে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় অপেক্ষা একটু ছোট হয়। তাহাদের পা বড় ও চরণতল অধিকতর চ্যাটাল; গায়ের রঙ্গ লাল্চে মেটে, পেটের রঙ্গ সাদাটে; নাক, কাণ, চরণ লালাভ; কর্ত্তন-দন্ত নারাঙ্গী, নখ হল্দে। ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি বড় ব্যাণ্ডিকুটেরই মত।

গুনোমিস্ ইগ্‌ড়ে উত্তর ভারতবর্ষের গাজিপুর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও কাছাড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কলিকাতায় অনেক আছে। ইহাদের মুণ্ড ৮$^{১}/_{২}$ ইঞ্চ, লেজ ৬$^{১}/_{২}$ ইঞ্চ লম্বা; গায়ের রঙ্গ মেটে; নাক, কাণ ও চরণ লাল্চে; লেজ লোমশূন্য, গোঁফের লোম বড় বড় ও কাল। ইহারা মাঠে ও বাগানে, গর্ত্তে বাস করে, এবং ক্ষেতের শস্য খাইয়া লোকের সমূহ ক্ষতি করে।

এই সব ক্ষেত্র-মূষিক ও গৃহ-মূষিক, সকলকেই এক 'গণে'র genus মনে করা হইত; কিন্তু আজকাল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ব্যাণ্ডিকুট, গুনোমিস্, নেসোকিয়া ও ইন্দুরকে ভিন্ন ভিন্ন 'গণে' বিভক্ত করিয়াছেন।

বড় ইন্দুর ও গৃহ-মূষিক দুই প্রকারের দেখা যায়। এক জাতির রঙ্গ কাল; অপর জাতির রঙ্গ পিঙ্গল বা মেটে। এই দুই জাতির প্রভেদ এই যে মেটে ইন্দুরের শরীরের গড়ন স্থূল, মুখাগ্র মোটা, কাণ ও লেজ ছোট। লেজের দৈর্ঘ্য, মুণ্ড ও দেহের দৈর্ঘ্যের সমান, বা কিছু কম। দেহ ৮ হইতে ১০ ইঞ্চ, লেজ ৭ হইতে ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। শরীরের উপর দিকের রং ধূসর বা মেটে, পেটের দিকের রঙ্গ সাদা। কাল ইন্দুর অপেক্ষা মেটে ইন্দুর অধিকতর বলবান।

কাল ইন্দুর মেটে ইন্দুর অপেক্ষা কিছু ছোট হয়। কিন্তু দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহাদের শরীরের গড়ন হাল্কা, লেজ শরীরের অনুপাতে বড় দেহ ও মুণ্ড ৭ ইঞ্চ, লেজ ৮ হইতে ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়; মুখাগ্র লম্বা ও সরু, নাসাগ্র নীচের চোয়াল ও অধর

হইতে অনেকখানি বাহির হইয়া থাকে। ইহাদের রঙ্গ নীলাভ কাল। মেটে ইন্দুর অপেক্ষা ইহারা অনেক দুর্ব্বল।

ইংরাজিতে কাল জাতীয় ইন্দুরকে 'ব্ল্যাক্‌র‍্যাট' বলে। বৈজ্ঞানিক নাম 'মুস্‌র‍্যাটস্‌'। মেটে জাতীয় ইন্দুরকে ইংরাজিতে বলে 'ব্রাউন র‍্যাট', বৈজ্ঞানিক নাম 'মুস্‌ ডেকুমেনস্‌'।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাল ইন্দুর বা 'র‍্যাটাস্‌' এর রঙ্গ কালই দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় ইন্দুর অর্থাৎ 'মুস্‌ র‍্যাটাস্‌' কোনও কোনওটা কাল, কোনও কোনওটা মেটেও হয়। কোনও কোনও মেটে রঙ্গের র‍্যাটাস ইন্দুরের পেটের রঙ্গ ধব্‌ধবে সাদা হয়। মেটে জাতীয় ডেকুমেনস ইন্দুরের সঙ্গে ইহাদের রঙ্গের কোনও প্রভেদ নাই। কেবল আকার, শরীরের ও মুখের গড়ন, এবং শরীরের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য দেখিয়া কোন্‌টা কোন্‌ জাতীয় ইন্দুর, তাহা ঠিক করা হয়।

স্থানভেদে সকল জাতীয় ইন্দুরেরই আকার ও রঙ্গের তারতম্য ঘটে। কাশ্মীর, নেপাল, নাইনিতাল প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের ইন্দুরের গায়ের লোম অধিকতর ঘন ও কোমল হয়, তাহাদের লেজও অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, পেটের তলায় রঙ্গ সাদা হয়, কোনও কোনটার লেজটাও সাদা হয়; গায়ের উপরের রঙ্গ লাল্‌চে, মেটে, বা ধূসর হয়। স্থানভেদে বর্ণভেদ হওয়ায় একই জাতীয় দুইটি ইন্দুরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলিয়া ভ্রম হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাল জাতীয় বা র‍্যাটাস্‌ ইন্দুর অপেক্ষা মেটে জাতীয় বা ডেকুমেনস্‌ ইন্দুর অধিক হিংস্র ও বলবান। পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাল জাতীয় ইন্দুরই ছিল। পরে এশিয়া দেশ হইতে মেটে জাতীয় ইন্দুর ইউরোপে প্রবেশ করে। কথিত আছে যে, ১৭২৭ খৃঃ দলে দলে মেটে ইন্দুর মধ্য-এশিয়া হইতে আসিয়া ভল্‌গা নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া রুসিয়া ও তাহার পশ্চিমের দেশসমূহে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের প্যারি নগরে এই জাতীয় ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম দেখা যায়। ইহারা যে দেশে একবার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশেই অল্প সময়ের মধ্যে বংশবিস্তার করিয়াছে। অধিকতর বলবান ও হিংস্র বলিয়া ইহারাই কালক্রমে কাল জাতীয় ইন্দুরের স্থান অধিকার করে। আজ কাল ইংলণ্ডে কাল জাতীয় ইন্দুর বিরল।

ভারতবর্ষে মেটে জাতীয় অর্থাৎ ডেকুমেনস্‌ ইন্দুর সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতেই দেখা যায়। সমুদ্রকূল হইতে দূরে ভারতবর্ষের মাঝখানের কোনও নগরে বা গ্রামে আজও মেটে জাতীয় ইন্দুর প্রবেশ করে নাই। এলাহাবাদ ও কাণপুর দুটি খুব বড় নগর, নদীর ধারে। এখানে বিদেশ হইতে শস্যপূর্ণ অনেক বড় বড় নৌকা আইসে। এই দুই নগরে প্লেগের সময়ে লোক নিযুক্ত করিয়া, পয়সা দিয়া, হাজার হাজার ইন্দুর মারা হইয়াছিল। সেই সব ইন্দুর কোন্‌ কোন্‌ জাতীয়, তাহার পরীক্ষাও হইয়াছিল। তাহাদের সকলেরই রঙ্গ মেটে হইলেও, একটাও ডেকুমেনাস্‌ বা মেটে জাতীয় ইন্দুর নহে,

সবগুলিই মেটে রঙ্গের কাল জাতীয়, বা র‍্যাটাস্ ইন্দুর। ভারতবর্ষে র‍্যাটাস্ ইদুর গাছে ও ঘরের চালেও বাসা করে।

বোম্বাই ও কলিকাতা নগরে অনেক মেটে রঙ্গের ডেকুমেনাস্ ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই ড্রেন ও নর্দ্দমার ভিতরে, গোয়াল-ঘর ও আস্তাবলের পাশে ও শস্যের গোলায় থাকে। ইহাদিগকে লোকের বসতবাড়ীতে বাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। লোকের বাড়ীতে মেটে রঙের র‍্যাটাস্ ইন্দুরেরই বাস। ভারতবর্ষে ডেকুমেনস্ ইন্দুরের স্বভাব প্রকৃতি অনেকটা মেঠো গুনোমিস্ ইগ্‌ড়ের মত।

মান্দ্রাজে কিন্তু ডেকুমেনস্ ইন্দুর নাই। সেখানে 'ব্যাণ্ডিকুট' একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

ইউরোপে ডেকুমেনস্ ইন্দুর সর্ব্বত্রই অনেক দেখা যায়। এক এক সময়ে ইহাদের দল এত অধিক হইয়া পড়ে যে, তাহাদের উপদ্রবে লোকের খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহারা সর্ব্বভুক্— শস্য, ফলমূল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য ছাড়া টাট্‌কা বা পচা মাছ মাংসও খায়। ক্ষুধার জ্বালায় সময়ে সময়ে জীয়ন্ত মানুষকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না।

রবার্ট স্টিভেন্সন্ বলিয়াছিলেন যে, একবার তাঁর কয়লার এক খনির মধ্যে, পাথুরে কয়লা কাটিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া আনিবার জন্য, কয়েকটা ঘোড়া রাখা হইয়াছিল। ঘোড়াদের খাইবার জন্য দানা বস্তা বন্দি করিয়া খনির মধ্যে রাখা হইত। দানার লোভে কতকগুলি ইন্দুর সেই খনির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের বংশ খুব বাড়িয়া যায়। পরে কিছু দিনের জন্য খনির কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং ঘোড়াগুলির উপরে তুলিয়া আনা হয়। কিছুকাল পরে পুনরায় খনির কাজ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয়। তখন এক দিন এক জন লোক প্রথমে খনির মধ্যে প্রবেশ করে। খনিতে নামিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ইন্দুরের দল তাহাকে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। লোকটা মরিয়া গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে অপর লোকেরা নামিয়া দেখে যে, তাহার হাড় ক'খানিমাত্র পড়িয়া আছে। ইন্দুরেরা তাহার সব চামড়া মাংস উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

প্যারি নগরে বড় বড় ড্রেন বা ঢাকা নর্দ্দমা যে সব লোক পরিষ্কার করিয়া যায়, তাহাদের অনেকে মাঝে মাঝে ঐরূপ ইন্দুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ শুনা গিয়াছে।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্যারি নগরে একবার এত বেশী ইন্দুর হইয়াছিল যে, সে বৎসর এক রাত্রিতে দুই হাজার ছয় শ' পঞ্চাশটা ইন্দুর মারা হইয়াছিল। এক মাসের মধ্যে ষোল হাজারেরও অধিক ইন্দুর মারা হয়।

ইন্দুরী বৎসরে তিন চারবার সন্তান প্রসব করে এবং এক এক করে আটটা, দশটা বাচ্চা জন্মে। এই জন্য ইহাদের সংখ্যা অল্পকালের মধ্যেই অনেক হইয়া পড়ে।

ইন্দুর যেমন শস্যাদি খাইয়া ফেলিয়া লোকের ক্ষতি করে, তেমনই আবার আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিয়া উপকারও করে। পথ ঘাট নর্দ্দমা পরিষ্কারক ভাঙ্গড়েরা যে কাজ করে, ইন্দুরও অনেকটা সেই কাজই করে। বাড়ীর বাহিরে যে স্থানে লোকে জঞ্জাল ফেলিয়া দেয়, যে নর্দ্দমাতে বাড়ীর ভাত ফেন, পচা ব্যঞ্জন, মাছ মাংস গিয়া পড়ে, ইন্দুরেরা সেই সব স্থানে বাস করে, আর সেই সব উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত পচা দুর্গন্ধ বস্তু খাইয়া ফেলিয়া লোকের অনেকটা উপকার করে।

ইহাদের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। খাদ্যসামগ্রী কোথায় আছে, ইদুরেরা সহজেই টের পায়। জাহাজ বা নৌকায় শস্য প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য থাকিলে ইন্দুরেরা তাহা জানিতে পারে। যে রাশি বা শিকল দ্বারা নৌকা বা জাহাজ ঘাটে বাঁধা থাকে, ইন্দুরেরা সেই রশি বহিয়া নৌকায় বা জাহাজে যায়। উহারা বেশ সাঁতরাইতেও পারে। অনেক সময় ইন্দুরকে খাল ও ছোট ছোট নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে দেখা গিয়াছে।

দন্তুর বর্গের অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইন্দুরেরাও দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। খাদ্যের অভাব, সন্তান-প্রসবের অসুবিধা, মানুষ বা অন্য জন্তুর অত্যাচার ইহাদের স্থানপরিবর্ত্তনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ইন্দুরের পিছনের পায়ের গড়ন এমন যে, সে ইচ্ছা করিলে পিছনের পায়ের পাতা পিছন দিকে ঘুরাইতে পারে। এইরূপ ক্ষমতা থাকায় ইন্দুর অক্লেশে নীচের দিকে মুখ করিয়া দেয়াল, থাম, লোহার শিক বা গাছ বাহিয়া পড়ানিয়া ভাবে নামিতে পারে; পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না।

ইন্দুরের বুদ্ধিকৌশল অদ্ভুত। ইহারা অতি কৌশলে ঝুড়ির ভিতর হইতে মাছ চুরী করিয়া লয়। একটা ইন্দুর ঝুড়ি বাহিয়া উঠিয়া ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়া যায়, এবং সম্মুখের দুই পা দিয়া একটা ডিম আপন বুকে চাপিয়া ধরে, এবং পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে ঝুড়ি বাহিয়া ঝুড়ির ধার পর্য্যন্ত উঠে। বাহিরে আর একটা সঙ্গী ইন্দুর থাকে, সে তখন বাহির দিক হইতে ঝুড়ি বাহিয়া উঠিয়া ভিতরের ইন্দুরের নিকট হইতে সেই ডিমটাকে নিজের দুই পা ও বুকে জড়াইয়া লয়, এবং পিছনের পায়ের সাহায্যে ঝুড়ি বাহিয়া নামিয়া আইসে। মাটীতে নামিয়া ডিমটাকে ঠেলিতে ঠেলিতে গড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়। গড়াইবার অসুবিধা হইলে একটা ইন্দুর ডিমটাকে পা দিয়ে বুকে চাপিয়া রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, আর একটা ইন্দুর তাহার লেজ মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ডিমসুদ্ধ টানিতে টানিতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত লইয়া যায়। পরে ডিমটাকে ঠেলিয়া গর্ত্তের মধ্যে গড়াইয়া দেয়।

সরুমুখ বোতলের নীচে তেল ঘি বা মধু থাকিলে, আর বোতলের ছিপি না থাকিলে, ইন্দুর বোতলের মধ্যে লেজ ঢুকাইয়া দেয়, লেজে তেল মধু লাগিয়া গেলে লেজ তুলিয়া লইয়া চাটিয়া খায়।

নিদ্রাকালে ইন্দুর শরীরকে কুণ্ডলী বা তাল পাকাইয়া শোয়। জন্মকালে বাচ্চাদের

শরীর লোমশূন্য ও চোখ বোজা থাকে। তখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে, এবং মার দুধ খাইয়া বাঁচে। ক্রমে ক্রমে শরীরে লোম গজায়, এবং কয়েক দিন পরে চোখ ফোটে। তখন নিজেরাই ঘুরিয়া ফিরিয়া খাবার খুঁজিয়া খায়। পুং ইন্দুর সুবিধা পাইলে ক্ষুদ্র বাচ্চাদের খাইয়া ফেলে। কোনও কোনও ইন্দুরীকেও সময়ে সময়ে আপনার বাচ্চা খাইয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণ মূষিক অপেক্ষা আকারে ছোট অনেক জাতীয় মূষিক ভারতবর্ষে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে এক জাতীয় ইন্দুর আছে, তাহাদের মাথা ও দেহ ৬ ইঞ্চ লেজ ৫ ইঞ্চ লম্বা হয়। তাহাদের পিঠের দিকের রঙ্গ গাঢ় মেটে, পেটের দিকের রঙ্গ সাদাটে, শরীরের গড়ন স্থূল, চরণ সাদা। ইহারা ঘরের চালে বাসা করে, রাত্রিতে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গৃহস্থের ভাণ্ডারের খাবার খাইয়া ফেলে, বাগানের কন্দমূল খাইয়া নাশ করে। বাক্স, আলমারীর তক্তা কাটিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে। সময়ে সময়ে পঙ্গপালের মত অনেকগুলি এক সঙ্গে বাহির হইয়া ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে। ইহারা সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে গেছো-ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা গাছে, বিশেষত নারিকেল গাছে ও ঘরের চালে বাসা করিয়া থাকে। ইহাদের মাথা শরীর ৫ ১/২ হইতে ৭ ১/২ ইঞ্চ, লেজ ৬ ১/২ হইতে ৮ ১/২ ইঞ্চ লম্বা হয়। কোনও কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন, ইহারা ভিন্ন জাতীয় নহে, ইহারাও 'র‍্যাটাস্' ইন্দুর।

ভারতবর্ষে আর এক প্রকার গেছো-ইন্দুর দেখা যায়। তাহাদের মাথা শরীর ৩ ইঞ্চ ও লেজটা ৪ ১/২ ইঞ্চ লম্বা হয়। গায়ের পিঠের দিকের রঙ্গ বাদামী বা লাল্‌চে মেটে, পেটের দিকে হরিদ্রাভ সাদা, পায়ের আঙ্গুলের রং সাদা, পায়ের তলার রঙ্গ হল্‌দে। ইহারাও গাছে ও ঘরেব চালে বাসা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ছোট রকমের মেঠো-ইন্দুর কয়েক জাতীয় দেখা যায়। সাঁওতাল পরগণা, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইহাদিগকে খোলা মাঠে গর্তে বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদের গায়ের রঙ্গ পাঁশুটে, পেটের রঙ্গ সাদাটে।

আসামের চেরাপুঞ্জি প্রদেশে এক রকম ছোট মেঠো-ইন্দুর দেখা যায়। তাহাদের শরীর ২ ১/২ ইঞ্চ, লেজও ২ ১/২ ইঞ্চ লম্বা হয়; রঙ্গ গাঢ় মেটে। গায়ে কোমল লোম জন্মে। ইহাদের কাণ ১/২ ইঞ্চ লম্বা হয়।

ছোট সাধারণ গৃহ-মূষিক সকল বাড়ীতেই দেখা যায়। ইহাদিগকে নিংটা বা নেংটি ইন্দুর বলে। ইহাদের দেহ ও মুণ্ড হইতে ৩ ইঞ্চ, এবং লেজ ৩ থেকে ৪ ইঞ্চ লম্বা হয়। ইহাদের চোখ বড় বড় ও উজ্জ্বল, কাল কাচের পুঁতির মত দেখায়। কাণও শরীরের তুলনায় বেশ বড়। লেজ লোমশূন্য। গায়ের রঙ্গ ধূসর, পিঠ ও পেটের দিকের রঙ্গ প্রায় একই রকম, তবে পেটের দিকের রঙ্গ একটু হাল্‌কা হয়। ইহারা এশিয়া মহাদেশের জন্তু, কিন্তু আজ পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই নিংটা ইন্দুর দেখা যায়। ইহারা লোকালয়ে

থাকতে ভালবাসে, এবং মানুষের ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্তে বাস করে। গৃহস্থের ঘরের দুধ ছানা, নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ও চাল ডাল খায়। মাছ মাংস বড় একটা খায় না, তবে অন্য খাবার না পাইলে মাছ মাংসও খায়। অনেক সময়ে ধান ও ছোলার বস্তায়, নাড়ার গাদায় ধেড়ে ইন্দুর ও নিংটা ইন্দুরকে একত্র থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ইহারা ভারি চঞ্চল প্রকৃতি ও ভীরুস্বভাব। দিনের বেলায় অন্ধকার নির্জ্জন ঘরে রাত্রিতে সকল ঘরে ঘুরিয়া খাবার খুঁজিয়া বেড়ায়। সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, একটু শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া গর্ত্তে ঢুকে, বা বাক্স পেটারা বা হাঁড়িকুড়ির আড়ালে লুকায়। বাচ্চা পাড়িবার সময়ে তুলা, নেকড়া, কাগজের টুকরা প্রভৃতি দিয়া কোমল বাসা তৈয়ার করে। বইএর আলমারী, কাপড়ের সিন্দুক বা বাক্স পেটরায় ফাঁক থাকিলে, তাহার ভিতর ঢুকিয়া, কাগজপত্র, কাপড়চোপড় কাটিয়া কুটি-কুটি করিয়া তাহা দিয়া বাসা তৈয়ার করিয়া সেই বাসায় বাচ্চা প্রসব করে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে গৃহস্থের পুঁথিপত্র, কাপড় চোপড় কত যে নষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না।

ইহারা যে খুব লাফাইতে পারে। একবার একটা নিংটাকে দশ ফুট উঁচ্চ আলমারীর মাথা হইতে মেঝের উপর লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে দেখিয়াছি। সোজা দেওয়ালে বাহিয়া ও দড়ি বাহিয়া উঠিতে ইহারা খুব পটু। ইহারা বহুপ্রসূ; বৎসরে চার পাঁচ বার বাচ্চা পাড়ে, এবং এক একবারে চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত বাচ্চা জন্মে। জন্মকালে বাচ্চাদের গায়ে লোম থাকে না, গায়ের চামড়া পাতলা ও লাল থাকে, চোখও বোজা থাকে।

অনেকে সাদা রঙ্গের নিংটা ইন্দুর পোষে। ইহারা বেশ পোষ মানে। ও কাল নিংটা একত্র পুষিলে, তাদের বাচ্চা সাদা ও কালয় মেশা বিচিত্র রঙ্গের হয়।

অনেক লোকে ধেড়ে ইন্দুর আর নিংটা ইন্দুরের মাংস খায়। আবার দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও বিহার প্রদেশের 'কাহার' ও অন্য কোনও কোনও জাতির বড় ধেড়ে ইন্দুর পুড়াইয়া বা রোষ্ট করিয়া খায়। ভাগলপুরে আমাদের কাহার চাকর ছিল; আমাদের ইন্দুর-ধরা কলে যত ইন্দুর পড়িত, সে লইয়া চুলোয় ফেলিয়া পুড়াইয়া একটু তেল নুন মাখিয়া ভর্ত্তা করিয়া ভাতের সঙ্গে খাইত; বলিত, খেতে বেশ লাগে। চীন দেশের লোকেরা ইঁদুর মারিয়া শুকাইয়া রাখে। শুট্‌কী মাছের মত তাহা রাঁধিয়া খায়।

সাহিত্য। কার্ত্তিক ১৩২৬। পৃ ৫১৩-৫২২।

অমর জীব

জীবমাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইতে পারে এমন জীব দেখা যায় না। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই জন্ম আছে, সকলেরই মৃত্যু আছে। জীবগণ জন্মগ্রহণের পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শৈশব ও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হয়। এই সময়ে তাহারা বংশরক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করে। যৌবনের পর আর তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি হয় না, বরং ক্ষয় হইতে থাকে এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া তাহারা জীবনলীলা সাঙ্গ করে। যে খাদ্য ভোজন করিয়া, যে অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া, বাল্যে ও যৌবনে তাহাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছিল, যৌবনের পরে সেই খাদ্য ভোজন করিয়া ও সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর তাহাদের শরীরের পুষ্টি হয় না। শারীরিক যন্ত্র সকলের কার্য্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে, —বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতার বাহ্যলক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়,—অবশেষে দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। ইহাকেই প্রাণ-বিয়োগ, জীবনান্ত বা মৃত্যু বলে।

দেখিতেছি জীবন থাকিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু বলিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বুঝিতে হইবে। অপঘাত বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিতেছি না। আঘাতে ছিন্ন হইয়া, চাপে নিষ্পেষিত হইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, বা রসাভাবে শুষ্ক হইয়া দেহ যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধবশতঃ যে মৃত্যু, সে মৃত্যু শৈশব বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই ঘটিতে পারে। সে মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, সে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অনেকেই পারে। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের যে ধীর ক্ষয়, ক্রমিক শিথিলতা,— পূর্ব্বে যে অবস্থার মধ্যে থাকিয়া দেহ যন্ত্রের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছিল, পরে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর সেরূপ চলে না—তৈলক্ষয়ে দীপ শিখার ন্যায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে যে নির্ব্বাণ, তাহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহা বার্দ্ধক্যে বা জীবনের শেষ দশাতেই ঘটে। এ মৃত্যুর হাত এড়াইতে কাহাকেও দেখা যায় না।

তাহাতেই কথা উঠিয়াছে জীবমাত্রেই মরণশীল। এ কথাটা খুব সত্য, তবে খাঁটি সত্য নহে। অমর জীবেরও আবিষ্কার হইয়াছে।

নিষ্প্রবাহ জলাশয়ের তলে জল ও পঙ্ক মধ্যে এক প্রকার আনুবীক্ষণিক প্রাণী বাস করে, তাহাদের দেহাবয়বের কিছু মাত্র জটিলতা নাই। দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত, তাহার কোনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কোষ কি? একবিন্দু গাঢ় তরল পদার্থ থলির মধ্যে

আবদ্ধ। অনেক সময়ে এই থলি বা কোষের সূক্ষ্ম আবরণও থাকে না—কেবলমাত্র আবরণশূন্য একবিন্দু তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, না-তরল, না-কঠিন, অর্থাৎ গাঢ় তরল,—নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন প্রভৃতির জটিল রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ডিম্ব-শ্বেতবৎ পদার্থ। এই পদার্থ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি জীবনী শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয় না। ইহাই জীবনের আদি ও একমাত্র লীলাক্ষেত্র। সেই জন্য ইহার নাম প্রোটোপ্লাজম, আদি ধাতু বা জীবনধাতু। প্রোটোপ্লাজমেই জীবনের বিকাশ। প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতে পারিলেই জীবনের সৃষ্টি করিতে পারা যাইবে। ইতঃপূর্ব্বে এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে এরূপ প্রবল আশা জাগ্রত হইয়াছিল যে, তাঁহারা জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন দশ রকম জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংগঠন করিতে পারিতেছেন, সেইরূপ একদিন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যথাবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রোটোপ্লাজমের সৃজন করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু হায়! যতই জ্ঞানের উন্নতি ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, প্রোটোপ্লাজম নির্ম্মাণ করিয়া জীবনোৎপাদন করিবার আশা বৈজ্ঞানিকের হৃদয় হইতে মরু-মরীচিকার ন্যায় ততই দূরে পলায়ন করিতেছে।

এই প্রোটোপ্লাজম পদার্থকে তাঁহারা অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিক-পদার্থের ন্যায় যতটা সরল মনে করিতেন, এখন আর ততটা সরল সুতরাং সহজ রচনীয় বলিয়া মনে করেন না। ইহার রাসায়নিক সংযোগ এত জটিল যে, অদ্যাবধি কেহই ইহার বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ পরিমাণে কি কি উপাদানে ইহা গঠিত, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বে যে পদার্থকে নিরবচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন বোধ হইত, অধুনা অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ফেনিল ও জটিল রচনা-প্রণালী সম্বলিত দৃষ্ট হয়।

জীবন-ধাতুময় কোষকে জীবন-কোষ বলে। অনুবীক্ষণের তলে জীবন-কোষস্থিত জীবন-ধাতুর মধ্যে তৈল বিন্দু, শ্বেতসার বিন্দু প্রভৃতি জীবনী শক্তির ক্রিয়া সমুদ্ভূত বহুবিধ জটিল রাসায়নিক পদার্থের কণা সকল দৃষ্ট হয়। জীবন কোষের মধ্যে একস্থানে সূক্ষ্মাবরণবেষ্টিত আর একটি ক্ষুদ্র কোষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রাণু (nucleus) বলা হয়। অন্তঃকোষের পদার্থ জীবন-ধাতু হইতে গাঢ়তর ও ভিন্ন। অন্তঃকোষের ধাতুতে যে যে রাসায়নিক উপাদানের সমাবেশ ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়, জীবন-কোষের ধাতুতে তাহা হয় না। এই অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রাণুর মধ্যে অনেকগুলি সূত্রবৎ বা জালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়।

অন্তঃকোষ-সম্বলিত জীবন-ধাতুময় এক একটি কোষ এক একটি জীবন-কোষ। জীবন-কোষ জড়পদার্থের ন্যায় নির্জ্জীব নহে। ইহা জীবিত-চেষ্টা বিশিষ্ট।

অণুবীক্ষণের সাহায্যে পঙ্কমধ্যে এইরূপ জীবিতচেষ্টাবিশিষ্ট এক-কোষী জীব অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরলদেহী—আমিবা।

আমিবা প্রাণিজগতের আদিম বা নিকৃষ্টতম প্রজা। আমিবা চমৎকার প্রাণী। আমিবা

বিশিষ্ট-আকার শূন্য, অবয়ব রহিত। আমিবা গোল, আমিবা লম্বা। আমিবার হস্ত পদ নাই, আমিবার বহু হস্ত পদ। আমিবার মুখ নাই, আমিবা মুখময়। আমিবার উদর নাই, আমিবা উদরময়। আমিবার নাসিকা নাই, অথচ সর্ব্বাংশই নাসিকার কার্য্য করে।

যে একটিমাত্র জীবন-ধাতুময় কোষে আমিবার দেহ গঠিত তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। দেহ-পদার্থ জীবন-ধাতুময় বর্ণহীন গাঢ় তরল।

অনুবীক্ষণের তলে কাচ-ফলকের উপর আমিবাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। আমিবার পা নাই, পাখা নাই, ডানা নাই, এককথায় চলিবার কোন অঙ্গ নাই, তথাপি আমিবা চলে। দেহাকৃতির আকুঞ্চন প্রসারণ ও পরিবর্ত্তনেই আমিবার গমন কার্য্য সাধিত হয়।

আমিবা সদা গতিশীল। দেহ সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষণে বর্ত্তুলাকৃতি, ক্ষণে চক্রাকৃতি, ক্ষণে লম্বাকৃতি ক্ষণে তারকাকৃতি ধারণ করে। তাহার কোমল দেহ প্রতি নিমিষে নানা ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেহ হইতে অঙ্গুলি সদৃশ অনেকগুলি ক্ষেপনী বা স্পর্শনী বাহির করে, আবার সেগুলি গুটাইয়া দেহমধ্যে বিলীন করে।

আমিবার শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নাই, অথচ তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নিয়ত চলিতেছে। জলে যে বায়ু সংমিশ্রিত থাকে, তাহা হইতেই শরীরের সর্ব্বাংশ দ্বারা অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া পরে শরীর হইতে অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন-যন্ত্র চালাইতে থাকে।

বিভিন্ন আকারে নিরন্তর ভ্রমণ উপলক্ষে তাহার দেহবিলম্বিত অঙ্গুলি সদৃশ কোন স্পর্শনী, বা দেহের অপর কোন অংশ, যদি ক্ষুদ্রতর কোন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ পদার্থের সংস্পর্শে উপস্থিত হয়, তবে আমিবা আপন তরল সুকোমল দেহটি সেই পদার্থের দিকে ঠেলিয়া বা ঢালিয়া দেয়। তাহাতে অচিরে সেই পদার্থ আমিবার দেহ ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও আবৃত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমিবা এইরূপে খাদ্য উদরসাৎ করে। গ্রস্ত বা ভুক্ত পদার্থটি শীঘ্রই আমিবা দেহের সহিত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বিলীন হইয়া যায়। যে অংশ দেহের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া না যায় তাহা দেহাভ্যন্তর হইতে বহিষ্কৃত ও নিক্ষিপ্ত হয়। আহার্য্য গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ অঙ্গ না থাকিলেও দেহের যে কোন অংশ আহার্য্য-সংস্পৃষ্ট হয় সেই অংশ দিয়াই আহার্য্য দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আমিবা মুখ-বিবর-হীন হইয়াও খাদ্য উদরসাৎ করে, উদর-হীন হইয়াও খাদ্যের পরিপাক করে।

আমিবার বিলক্ষণ অনুভূতি আছে। অভিপ্রেত অনভিপ্রেত বিচার করিবার, খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লইবার শক্তি আছে। চলিতে চলিতে বালুকণা বা অপর কোন অখাদ্য বস্তুর সহিত তাহার স্পর্শনী সংস্পৃষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে স্পর্শনীটি সঙ্কুচিত করিয়া পিছাইয়া আইসে ও সেই অসার পদার্থকে এক পার্শ্বে রাখিয়া পুনরায় অগ্রসর হয়। উত্তাপের কিম্বা চাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিলে, উত্তেজক বা অবসাদক রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ

করিলে, আমিবা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, তাহার দেহের গতির বৃদ্ধি বা নিবৃত্তি করে। দৈহিক উত্তেজনার বাহ্য প্রকাশ অনুভূতির লক্ষণ।

প্রচুর খাদ্য পাইলে আমিবা-দেহের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। নিত্য নূতন পদার্থ দেহে শোষিত হইতে থাকিলে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। কোন আমিবাই খুব বড় হইতে পায় না, কিয়ৎকাল বর্দ্ধনের পর দেহ মধ্যে একটি একপ্রকার ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতেই তাহার দেহের আর বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে আমিবা মন্থরগতি প্রাপ্ত হয়, স্পর্শনী সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার দেহ কোষ-মধ্যস্থিত অন্তঃকোষটি স্বতঃ দ্বিধা ভিন্ন হইয়া দেহকোষের দুই প্রান্তে অবস্থিত করে, এবং দেহকোষের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহ কোশটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেয় এবং দুইটি ভিন্ন জীব-কোষের উৎপত্তি হয়। এই এক একটি জীব কোষ এক একটি আমিবা।

একটি আমিবা বিভক্ত হইয়া দুটি স্বতন্ত্র আমিবার উৎপত্তি হইল, উৎপন্ন আমিবাদ্বয়ের প্রত্যেকটি প্রথমটির অর্দ্ধাংশ। ইহারা প্রত্যেকে প্রথমটির ন্যায় জীবনবৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিবে এবং যথাকালে দ্বিখণ্ড হইয়া চারিটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। সেই চারিটি আবার যথাকালে বিভক্ত হইয়া আটটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। অবস্থা অনুকূল থাকিলে এইরূপেই আমিবা বংশের বিস্তার হইতে থাকিবে। আমিবার স্ত্রী-পুরুষ নাই। সন্তান উৎপাদনে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষা রাখে না। একটি আমিবা যখন দু'টি আমিবার পরিণত হইল, তখন প্রথমটি কোথায় গেল? তাহার কি মৃত্যু ঘটিল? তাহা ত নহে। তাহার দেহযন্ত্র ত বিকল হইয়া পড়িয়া নাই। পূর্ব্বে ছিল একটি যন্ত্র, এখন হইল দু'টি যন্ত্র, দু'ই কার্য্যক্ষম, দু'ই জীবন্ত।

যে আমিবা বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইল সে বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে অসিল। দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে দুটি আমিবার সৃষ্টি হইল তাহার নূতন, তাহাদের যৌবন দশা। পুরাতন আমিবা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া জরা বার্দ্ধক্য পরিহার করিয়া নবযৌবন লাভ করিবে।

আমিবার জীবনপর্য্যায় যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে তবে আমিবার মৃত্যু কোথায়? যেটি অপর প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে বা জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িবে তাহারই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। অন্য কাহারও মৃত্যু ঘটিবে না।

অণুবীক্ষণের তলে অদ্য যে আমিবাকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, সে ভূতলে মানবের আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন তড়াগ বা পল্বলে প্রথম আবির্ভূত আদিম আমিবা। আমিবা অজর অমর।

প্রদীপ। আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৮
পৃ: ৩৮৬-৩৮৯

রাক্ষুসে মাকড়সা

ভাই সন্দেশ,

তুমি আশ্বিনের সংখ্যায় রাক্ষুসে কাঁকড়া আর নারকেল-খেকো কাঁকড়ার কথা লিখেছ, তা পড়ে খুব আশ্চর্য্য বোধ হল।

উড়িষ্যায় আমার বাড়িতে, কাল যে কাঁকড়ার মাসতুত ভাই এক মাকড়সাকে দেখলাম সেও কম অদ্ভুত নয়। তার ছবি দেখলে আর তার বিষয় পড়লে তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হবে।

কাল রাত্রিতে আমার রাঁধুনি বামুন খাবার তৈয়ারি কত্তে বড়ই দেরী কল্লে। কারণটা কি বুঝবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। রান্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি এমন সময়ে দেখলাম দরজার পাশে উপর থেকে একটা কি থপ্ করে পড়ল। ল্যাণ্ঠন দিয়ে দেখলাম কাঁকড়ার মত প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা একটা টিক্‌টিকি ধরেছে আর টিকটিকিটে তার পেটের তলা থেকে ছট্‌ফট্ কচ্ছে। খানিক পরেই, দেখতে দেখতে, টিকটিকিটার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম মাকড়সাটা. বাঘের নখের মত বড় বাঁকা ও ধারাল, তার দাঁত দুটো টিকটিকির পিঠে ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত চুষে খাচ্চে। রান্না ঘরে আগুন তুলবার একটা বড় লোহার চিম্‌টে চুলোর পাশে পড়ে ছিল, আমি সেই চিম্‌টে নিয়ে ধীরে ধীরে মাকড়সার কাছে এসে তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে তুল্লাম। সে তার বড় বড় ঠ্যাং চারিদিকে ছুঁড়তে লাগল। আমি তাকে নিয়ে খুব বড় একটা কাঁচের চওড়া-মুখো বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বোতলের মুখ একখানা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে মাকড়সাটাকে কয়েদ করে রাখলাম। আর তার চেহারা আর ভাবগতিক দেখতে লাগলাম। সে ভারি চটেছিল। চটে কর্ব্বেন কি, বাছাধন বন্দী! হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এর পাঁচ যোড়া বা দশটা পা। তা কিন্তু নয়। মাথার সাম্‌নে প্রথম যোড়াটা দেখতে অন্য পাগুলোর মত হলেও সে দুটো গোঁফ বা শুঁয়োর কায করে। ফড়িং, আর্সুল্লো, প্রজাপতি প্রভৃতির যেমন এক যোড়া করে সরু শুঁয়ো থাকে, মাকড়সাদেরও তেমনি শুঁয়ো না থাকলেও এক যোড়া শুঁয়োর মত আছে, সে যোড়া সরু নয়, মোটা ও দেখতে ঠিক পাটের মত। আর চার-যোড়া পা, সেই আটটা পা দিয়ে চলা ফেরা করে। প্রথম যোড়া দিয়ে ধ'রে বা স্পর্শ ক'রে দেখে তাই এ যোড়াকে "স্পর্শনি" বলে।

এ মাকড়সাটা কাঁচের বোতলের মসৃণ গা বেয়ে উঠতে লাগল। দেখলাম পিছনের তিন যোড়া পা দিয়েই উঠছে, আর প্রথম পা যোড়া ও শুঁড় যোড়া সামনের দিকে তুলে নাড়চে যেন হাতড়ে হাতড়ে সব দেখছে। সাধারণ মাকড়সারা চার যোড়া পায়ে হাঁটে,

এরা পিছনের তিন যোড়া পায়ে হাঁটে, প্রথম দু'যোড়া স্পর্শনির কাজ করে। তারপর টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মাল্লে যেমন ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হয়, বোতলের মধ্য থেকে সেই রকম শব্দ বেরুচ্ছে। মনে কল্লাম পায়ের আগায় নখ আছে তাই দিয়ে বুঝি টোকা মাচ্ছে, অথবা দাঁতে ঘা মারচে। আলো দিয়ে বেশ করে দেখলাম, তাতে বুঝলাম ও রকমে শব্দ হচ্চে না। পায়ের তলা নরম রোমে ঢাকা, তাতে নখ নাই, থাক্‌লেও এত ছোট ও সরু যে তা দিয়ে শব্দ হয় না। তারপর দেখলাম যখনই শুঁয়ো তুলে চোয়ালে ঘষে তখনই ঠক্ করে শব্দ হয়। চোয়ালের গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, স্পর্শনির শক্ত গোড়াটা তাতে বাধিয়ে টানলেই ঐ রকম শব্দ হয়। শব্দ করে' বোধ হয় ভয় দেখায়। পায়ের তলা এমনভাবে গড়া যে খাড়া কাঁচের গা বেয়েও উঠতে পারে পিছলে পড়ে না। পিঁপ্‌ড়ে ও রকম উঠতে পারে না, মাছিতে পারে।

এর গলা নাই। মাথা ও বুক মিশে এক হয়ে গিয়েছে। পেট্‌টা বুক থেকে ভিন্ন আছে। শরীরটা দু'ভাগে বিভক্ত,—মাথাযুক্ত বুক আর পেট। সব মাকড়সার ঐ রকম। কাঁকড়ার মাথা-বুক-পেট সব যুড়ে এক হয়ে গিয়েছে। এর মুখের সামনে দুটো শক্ত ঢিব্‌লে আছে, সে দু'টো তার চোয়াল বা ঠোঁট। সেই ঠোঁটের আগায়, তলার দিকে বাঁকান, বিড়ালের নখের মত শক্ত, বাঁকা ও ছুচল বিষ দাঁত আছে। সাপের বিষ দাঁতের মত এদের দাঁতেও ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে ঠোঁটের গোড়ায় বিষের থলি থেকে বিষ বেরিয়ে আসে। টিকটিকিটার পিঠে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিল বলে টিকটিকিটা নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ল আর তারপর মরে গেল। ছোট মাকড়সাদেরও ঐ রকম বিষ দাঁত আছে। তারা মাছি বা অন্য পোকা ধরে দাঁত বসিয়ে, বিষ ঢেলে মেরে ফেলে তারপর রক্ত চুষে খায়। এই ঠেংটা দু'টাকে "দংশনোষ্ঠ" বলে। কাঁকড়ার সামনের দুটো পা তার শিকার ধরবার চোয়ালের অথবা হাতের কাজ করে, কিন্তু সে দুটা তাদের ঠোঁট নয়, আর তাদের বিষ দাঁতও নাই। মাকড়সার দুটো দাঁত মুখের মধ্যে নয়, আর তা দিয়ে খাবার চিবুনো বা ছেঁড়াও যায় না, সুতরাং এদুটো সত্যিকার দাঁত নয়। ঐ শিকার মারা কল, আর শিকার ধরে মুখের মধ্যে পুরে দেবার যন্ত্র। তা ছাড়া এ দিয়ে খাবার ধরে মুখেব কাছে আনে।

এর পায়ে অনেকগুলি গাঁট বা পর্ব্ব বা পাঁপ্ আছে। প্রত্যেক পায়ে সব শুদ্ধ সাতটা পর্ব্ব আছে। কাকড়া ও চিংড়ি, পতঙ্গ ও তেঁতুলে বিছা আর কেন্নোর পাও এই রকম অনেক ভাগে বা পর্ব্বে বিভক্ত। সেই জন্য এই সব প্রাণীকে এক বিভাগে ভুক্ত করা হইয়াছে, এই বিভাগের প্রাণীদের নাম "পর্ব্বপদ" প্রাণী। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ শক্ত খোলায় ঢাকা তাদের এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে, তার নাম "খোলাকী"—ফড়িং, প্রজাপতি, মশা মাছি, বোল্‌তা পিঁপড়ে প্রভৃতি যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ তিন ভাগে কাটা বা বিভক্ত, অর্থাৎ যাদের মাথা বুক আর পেট ভিন্ন দেখা যায় তাদের অন্য এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। তাদেব "খণ্ডিত-দেহী" বলে।

ইংরাজিতে এদের insect বলে, তার অর্থ—"খণ্ডিত দেহ"। এদের সকলেরই বুক থেকে তিন যোড়া বা ছ'টা পা বেরোয় সেই জন্য এদের আমরা 'ষটপদও" বলি। কেন্নো, তেঁতুলে বিছে প্রভৃতি প্রাণীর দেহ অনেক ভাগে বিভক্ত এবং তাদের অনেকগুলি পা থাকে, তাই তাদের অন্য এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে আর তার নাম দেওয়া হয়েছে—"বহুপদ"।

যে সব প্রাণী মাকড়সার মত আর যাদের মাথা আর বুক এক হয়ে গিয়েছে তাদের শ্রেণীর নাম "মাকড়সা শ্রেণী"। মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা,—আর কুকুর ও ছাগলে গায়ে যে 'টিক্' পোকা বা এঁঠুলি পোকা হয়—আর যে সব ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা তোমার গায়ে বাসা করে তোমার খোস্ বা পাঁচড়া জন্মায়—তারা সব এই মাকড়সা শ্রেণী ভুক্ত। মাকড়সা insect নয়। যাদের মাথা. বুক ও পেট এই তিন ভাগ পৃথক ও স্পষ্ট ও যাদের ছ'টা ক'রে পা থাকে তারাই কেবল insect মাকড়সাদের আটটা পা।

এই যে জাতের মাকড়সা ধরেছি তাদের রাক্ষুসে মাকড়সা বা বাঘা-মাকড়সা বলে। এরা অন্যান্য মাকড়সার মত জাল বুনে ফাঁদ পেতে শিকার ধরে না। বাঘের মত শিকারের পিছু পিছু নিঃশব্দে গিয়ে হঠাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বিষ দাঁত ফুটিয়ে তাকে মেরে ফেলে। কয়েক জাতের ছোট ছোট মাকড়সা আছে তারাও ঐ রকমে মাছি ও অন্য ছোট ছোট পোকা শিকার করে। যারা এই রকমে শিকার ধরে তাদের শিকারী মাকড়সা বলে। অনেক জাতের মাকড়সা আছে তারা জাল বুনে ফাঁদ পেতে পোকা ধরে। তাদের মধ্যে কোন কোন জাত ঘরের মধ্যে দেয়ালের কোণে ও ছাদে জাল পাতে; কোন কোন জাত বাগানে গাছের ডালের মাঝে জাল পাতে; আবার কোন কোন জাত মাটিতে ঘাসের উপর জাল পাতে। জ'ল বোনার ধরণও সব জাতের সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন রকমের জাল তৈয়ার করে।

এই রাক্ষুসে মাকড়সার গা-ময় ঘন কোমল চিক্কণ লোমে ঢাকা, দেখ্‌তে মখ্‌মলের মত। রং কাল বা গাঢ় ধূসর। পা গুলিতে সাদা ও কাল ডোরা, দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। মাথার উপরে মাঝখানে এক জায়গায় ছোট ছোট আটটি চোখ আছে।

এই জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সুমিত্রা, যব বা গায়না দ্বীপ এবং অস্ট্রেলিয়া দেশে বাস করে। ইহারা খোড়ো ঘরের চালে, পুরাতন বাড়ির দেয়ালের ফাটলে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে, ইঁট পাথর ও কাঠের গুড়ির তলায় বাস করে। ছবিতে দেখ, ইহার পিছন দিকে দু'টা উঁচু গোঁজের মত বাহির হইয়া রহিয়াছে, এ দু'টা ইহার সূতা-কাটা থলি। ঐ থলি হইতে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রস বাহির হইয়া জমিয়া সূতা হয়। সব মাকড়সার ঐ রকম সূতাকাটা থলি থাকে, সেই সূতায় জাল বুনে। ইহারা জাল না বুনিলেও সূতা অন্য কাজে লাগায়। ইহারা পেটের থলি হইতে সূতা বাহির করিয়া, ঘন করিয়া বুনিয়া রেসমের কাপড়ের মত তৈয়ার করে, সেই নরম কাপড় বাসায় পাতিয়া দিয়া আরামে বাস করে। স্ত্রী-মাকড়সা সূতা

দিয়া ছোট্ট রেকাব বা বাটীর মত তৈয়ার করিয়া তাতে ডিম পাড়ে, পরে বাটীটার মুখ আর এক খানা কাপড়ের চাক্‌তি দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। সেই কাপড়ের থলিয়ার ভিতর ডিমগুলি থাকে, পরে যথা সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। মা ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের কাছে কাছে থাকে আর তাদের খাওয়ায়। বাচ্চারা বড় হলে নিজেরাই শিকার ধরে খায়। কখন মা আর তাদের খোঁজ খবরও লয় না, বরং পেলে ধরে খেতেও ছাড়ে না। বাচ্চারা বড় হতে থাক্‌লে তাদের শরীরের চামড়াটা ফেটে যায়, তার তলে নূতন চামড়া গজায়, বাচ্চার শরীরটাও বড় হয়, আর পুরাণ চামড়াটা খসিয়া পড়ে। সাপে যেমন খোলস ছাড়ে, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়িও সেই রকম মাঝে মাঝে খোলস বদলায়, প্রত্যেক বারে শরীরটা পূর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মাকড়সা সাত আট বার খোলস বদলায়।

আমি যে মাকড়সাটা ধরিয়াছি সেটার পা ছড়াইয়া দিলে, এক পা'র আগা থেকে অপর পাশের পা'র আগা পর্য্যন্ত ৭ ইঞ্চ লম্বা—সন্দেশের পাতার চেয়েও বেশী চৌড়া স্থান জুড়িয়া থাকে। এর মাথার আগা থেকে পেটের শেষ পর্য্যন্ত আড়াই ইঞ্চ। এক একটা এর চেয়েও বড় হয়। এদেরি মত অন্য জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা আমেরিকায় ও আফ্রিকায় দেখা যায়।

ব্রাজিল দেশে একরকম "রাক্ষুসে" মাকড়সা আছে। সেগুলি নাকি এমন পোষমানে যে সে দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তাদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এদিক ওদিক খেলাইয়া বেড়ায়। ঠিক যেন পোষা কুকুর।

ইহারা সাধারণতঃ আর্সল্লা, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতি নানা প্রকার কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট টিক্‌টিকি, গিরগিটি, সাপের বাচ্চা ও ছোট ছোট পাখির বাচ্চা ধরিযা খায়। ছবিতে দেখ, রাক্ষুসে মাকড়সায় কেমন টিকটিকি আর পাখি ধরে খাচ্চে।

আগামী বারে তোমায় কাঁকড়া-বিছে আর তেঁতুলে বিছার কথা বল্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত।

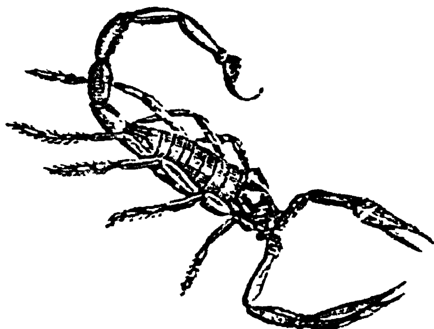
তোমার মেজ দাদামশায়।

সন্দেশ। অগ্রহায়ণ ১৩২৩
পৃ: ২৩৭-২৪২

কাঁকড়া-বিছে

ভাই সন্দেশ,

তোমরা কলকাতায় থাক, বেশ সুখে আছ। আমি থাকি পাড়াগাঁয়ে তাতে পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে। চারিদিকে বন জঙ্গল, রাত্রিতে বাড়ির আশে পাশে বাঘ ভালুক ঘোরে। আমার বাড়ির চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাঘ ভালুক আসে না, আর দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাক্‌লে কোন ভয় থাকে না। ভাই, ঘরের মধ্যেও নিস্তার নাই। মেঝেতে ব্যাং থপ্‌ থপ্‌ করে যাচ্চে, বাক্সের কোণে সাপ ঢুকছে, ঘরের চাল থেকে রাক্ষুসে মাকড়সা লাফিয়ে পড়ছে, আলনায় জামার ভিতরে, বিছানায় বালিসের তলে, তেঁতুলে বিছে, বই-এর আল্‌মারিতে আর জুতোর মধ্যে কাঁকড়াবিছে, কখন যে কোন্‌টা কামড়াবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকইতে হয়। ফস্‌ করে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দেবে, আর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে, আর ঝট্‌ করে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়বে, সে যো'টি নাই। এ ছাড়া পোকার উৎপাত কত। উই পাখা ধরে পালে পালে ঘরের কোণ থেকে বেরুচ্ছে, বড় বড় সিংওয়ালা গুবরে পোকা ভোঁ করে উড়ে এসে ঠকাস্‌ করে পড়েছে। গান্দি পোকা, ছোট গুবরে, গঙ্গাফড়িং, ডাল ফড়িং, পাতা ফড়িং কত রং বেরং-এর পোকা এসে জ্বালাতন করে।



কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যাবো বলে চাকরটাকে বুট জুতো যোড়া আনতে বল্লাম। পাঁচ সাত দিন এ জুতো পরি নাই, ঘরের এক কোণেই রাখা ছিল। চাকরটা জুতো যোড়া বারান্দায় এনে, পোকা টোকা আছে কিনা দেখবার জন্য তাকে উল্টিয়ে মাটিতে ঠুক্‌লে। যেই ঠোকা অমনি প্রকাণ্ড এক কাঁকড়াবিছে—যাকে বলে বৃশ্চিক! না ঝেড়ে যদি তাড়াতাড়ি জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিতাম তা'হলে আমার কি দশাই না হত!

বিছের কামড়ের যে কি যাতনা, যে সে কামড় খেয়েছে সেই জানে! তবে নাকি এরা মুখ দিয়ে কামড়ায় না, হুল্ ফুটিয়ে দেয়। তাইতে যন্ত্রণা হয়।

এ বিছাটা মস্ত বড়, রং কাল, গায়ে অল্প অল্প রোম আছে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মত বড় বড় এক যোড়া দাঁড়া আছে। জুতো থেকে বেরিয়েই লেজটা পিঠের উপর উঁচু করে অন্ধকার কোণের দিকে ছুট্। চাকর জানে তার বাবু ওটিকে নেড়ে চেড়ে না দেখে ছাড়বেন না। তাই সে দৌড়িয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লোহার বড় চিমটে খানা এনে আমার হাতে দিলে। ওর কাছেও যেতে তার সাহস হল না। আমি চিম্‌টেটা হাতে করে তার কাছে গেলাম। সেটা দেয়ালের কোণেই দাঁড়িয়ে ছিল। যেই চিম্‌টে দিয়ে তাকে ধল্লাম অমনি ফঁস্ ফঁস্ শব্দ কত্তে লাগল, আর সাঁড়াসির মত দাঁড়া দিয়ে চিম্‌টেটাকে চেপে ধল্লে আর তার লেজ ছুঁড়ে চিমটের গায়ে হুল ফোটাতে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। আমি তাকে তুলে নিয়ে সেই বড় কাঁচের বোতলের মধ্যে পূরে ফেল্লাম।

এটা খুব মস্ত বিছা। এত বড় বিছা সচরাচর দেখা যায় না। আমি আরো অনেক বিছা মেরেছি। কোনটা লাল্‌চে মেটে, কোনটা ধূসর, কোনটা কাল, কিন্তু সে সবগুলিই এর চাইতে ছোট। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ছোট বড় নানা রকমের কাঁকড়া-বিছে আছে। যে জাতের বিছে ধরেছি সেগুলি সব চাইতে বড় হয়।

মাকড়সার মত এরও মাথা ও বুক মিশে এক হয়েছে। পেট্‌টাতে অনেক ভাগ আছে, পেটের শেষের পাঁচটা ভাগ লম্বা ও সরু হয়ে লেজের মত হয়েছে, আর তার আগায় ঢিব্‌লের মত একভাগ আছে, সেইটের আগায় বিড়ালের নখের মত বাঁকা শক্ত ও ছুঁচ্‌ল হুল্ আছে। এই ঢিব্‌লেটায় বিষেব থলি আছে, আর ঐ হুলের মধ্যে সরু ছিদ্র আছে। হুল্ ফুটিয়ে দিলে সেই ছিদ্র পথে বিষ বেরিয়ে গায়ে ঢোকে আর তাতেই যন্ত্রণা হয়। মাকড়সার পেট দেখতে একটা খণ্ড, তাতে ভাগ নাই—এদের পেট অনেক ভাগে বিভক্ত, সে ভাগগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। লেজটাও ওর পেটেরই অংশ।

কাঁক্‌ড়া-বিছে মাকড়সার জ্ঞাতি। এর চার যোড়া পা আছে, তা' দিয়ে হাঁটে। সামনের স্পর্শনি যোড়া খুব বড় ও মোটা আর তা দেখ্‌তে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। প্রত্যেকটার আগায় সাঁড়াশির মত দুটা শক্ত আঙ্গুল বা নখ আছে, নখের ভিতর পাশ খাঁজকাটা বা দাঁতযুক্ত। এ দিয়ে শিকার চেপে ধরে, আর তার গায়ে লেজের বাড়ি মেরে হুল্ ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষে শিকারটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে বা মরে যায়। মুখের সাম্‌নে এক যোড়া ছোট্ট সাঁড়াশির মত আছে। তা দিয়ে খাবার ধ'রে খণ্ড খণ্ড করে আর মুখে পোরে। এরই নীচে ওর ঠোঁট আর মুখের ছিদ্র।

এই দাঁড়ায় আর প্রথম পায়ের গোড়ার দিকে বুকের পাশে কাঁটার মত শক্ত শক্ত লোমের গোছা আছে। বিছা যখন রাগে তখন দাঁড়া যোড়া নড়তে থাকে, তাতে সেই কাঁটাগুলোতে ঘষা লেগে ফস্ ফস্ শব্দ হয়। তোমাদের দাঁত-মাজা শক্ত বুরুষের গায়ে আঙ্গুল টেনে দেখ কেমন শব্দ হয়। এই শব্দও অনেকটা ঐ রকম। এরা ভয় দেখাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করে। সতর্ক করে দেয়, যেন বলে, বাপু হে এই বেলা পালাও, কাছে এসো না, এলেই হুল্ ফুটিয়ে দেব।

কাঁকড়া-বিছে যখন হাঁটে তখন লেজটাকে তুলে পিঠের উপর বাঁকিয়ে রেখে চলে। শিকার মারতে হলে তার দিকে হঠাৎ পিছন ফিরে লেজটাকে ঝট্‌করে সোজা ক'রে তার গায়ে ছুঁড়ে মারে আর অম্‌নি লেজের আগায় সেই বাঁকা ধারাল হুল্‌টা তার গায়ে বিঁধে যায় আর বিষ বেরিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়।

এর বিষের ভারি তেজ। মানুষের গায়ে এ বিষ ঢুক্‌লে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এত জ্বালা হয় যে ছট্‌ফট্‌ কত্তে হয়, আর সে যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে। কখন কখন দু-তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সময়ে সময়ে জ্বর হয়, গা বমি বমি করে, মাথা ঘুরোয়, খেতে ইচ্ছে থাকে না। যন্ত্রণা কমে গেলেও তিন চার দিন পর্য্যন্ত শরীর অসুস্থ থাকে। ছোট ছেলেকে খুব বড় বিছায় কামড়ালে, সে মারা পড়্‌তেও পারে। এরা মানুষকে খাবে বলে হুল্‌ ফুটোয় না। স্বভাবতঃ এরা ভীরু, মানুষ দেখ্‌লে পালায়। তবে খুব ভয় পেলে আর পালাবার সুবিধা না পেলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে হুল ফুটিয়ে দেয়।

এরা পাহাড় ও বালীময় শুষ্ক প্রদেশেই বেশি থাকে। খোড়ো ঘরের চালে, দেয়ালের ফাটলে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে ইট, পাথর, কাঠের তলায় বাস করে। কোন কোন জাত মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়েও তাতে থাকে। এরা দিনের বেলায় ঐ সব জায়গায় লুকিয়ে থাকে। রাত্রিতে শিকারের খোঁজে বাহির হয়। দিন হলেই, কোণা খুঁচিতে যেখানে অন্ধকার পায় সেইখানেই ঢুকে লুকিয়ে থাকে।

কাঁকড়া-বিছে সাধারণতঃ কীট পতঙ্গ, ও মাকড়সা ধরে খায়। বড় জাতের বিছে ছোট ছোট টিক্‌টিকি, নেংটে ইন্দুর, পাখির ছোট ছোট বাচ্চাও ধরে খায়। ছোট যে কোন প্রাণীকে ধরে আয়ত্ত করতে পারে তাকেই খায়। এরা একলা একলা থাক্‌তেই ভালবাসে। একটা অপরটাকে দেখ্‌লে, দু'জনে খুব যুদ্ধ বেধে যায়। যেটা জিতে যায় সেটা অপরটাকে খেয়ে ফেলে।

মাকড়সার মত এরা ডিম পাড়ে না। ডিম মার পেটের ভিতরেই ফোটে, আর জিয়ন্ত ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চা পেট থেকেই বেরোয়। এক এক বারে অনেকগুলি এমন কি ৫০।৬০ টা বাচ্চা জন্মে। ছোট ছোট বাচ্চারা মার পেট থেকে বেরিয়েই মায়ের গায়ে পিঠে চড়ে বসে আর আঁকড়ে ধরে থাকে। মাসখানেক এই রকম অবস্থায় থাকে। প্রথম খোলস বদলানর পর বাচ্চারা নিজে নিজে খাবার ধরে খায়। বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মা বাচ্চাদের ভারি যত্ন করে। আবার সময়ে সময়ে নিজের বাচ্চাদের ধরে ধরে খেয়েও ফেলে।

কাঁকড়া আর মাকড়সার মত বিছাও মাঝে মাঝে খোলস বদলায়। দৈবাৎ কোন রকমে একটা পা ছিঁড়ে বা খসে গেলে পরের বারে খোলস বদলাবার সময়ে নূতন পা গজায়। কাঁকড়া আর মাকড়সাদের নূতন পা গজাবার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে অনেক জাতের কাঁকড়া-বিছে আছে। প্রায় সব গরম দেশেই বিছা দেখ্‌তে পাওয়া যায় কেবল টাস্‌মেনিয়া দ্বীপে নাই। অল্প গরমের দেশে, যেমন ইউরোপের দক্ষিণ অংশে, কেবল ছোট রকমের বিছাই দেখা যায়। তারা ২।৩ ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। আর বড় জাতের রাক্ষুসে বিছে কেবল ভারতবর্ষে আর আফ্রিকায় দেখা যায়। এই সব বিছা ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। আমি যেটা ধরেছি সেটা সাত ইঞ্চ লম্বা।

ছবিতে দেখ বিছার কেমন দাঁড়া, কেমন লেজ আর হুল, আর দেখ একটা বিছে কেমন আর একটাকে খাচ্চে, সবটা খেয়েছে কেবল লেজের আগাটা বেরিয়ে আছে। আরও দেখ মা—রাক্ষুসীটা তা'র ছানাদের ধরে ধরে খাচ্চে, দুই দাঁড়ায় দু'টো ধরেছে, আর মুখে একটা পুরেছে। কেমন ভায়া এ সব অদ্ভুত কি না?

তোমার মেজ দাদামশায়।

সন্দেশ। পৌষ ১৩২৩

পৃ: ২৭১-২৭৪

চেলা বা তেঁতুলে বিছা

ভাই সন্দেশ,

আমি উড়িষ্যার পাহাড়ের বনে জঙ্গলে থাকি—আর, এদেশের বুনো হাতী, বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি ঘরের কাছে এসে উৎপাত করে, আর নানা রকমের কিম্ভুত-কিমাকার বিদ্‌ঘুটে পোকা মাকড় আমায় জ্বালাতন করে, তা শুনে তোমার নাকি ভারি আমোদ হয়েছে? তা হবে বই কি? কলকাতায় থাক কি না। সেখানে বড় বড় পাকা রাস্তা—পাহারাওয়ালা লম্বা লাঠি হাতে করে পাহারা দিচ্ছে—সেই সব রাস্তায় হেঁটে বেড়াও; আর পাকা কোঠার দোতালা ঘরে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে, আরামে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের হাওয়া খাও; আর মাঝে মাঝে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেখানকার লোহার খাঁচায় বন্ধ করা বাঘ ভাল্লুককে মুখ ভেংচিয়ে বীরত্ব দেখাও।

তুমি হাস্‌বে বই কি!

ভায়া, কিছুদিন আগে যে বিছাটা আমি ধরেছিলাম, সেটা যদি তোমার সামনে কিল্‌বিল্‌ করত, তুমি তা হ'লে ভয়ে আঁৎকে উঠতে। আর যদি তার একটা কামড় খেতে, তিন দিন পর্য্যন্ত সার্কাসের বাঁদরের মত নাচতে থাকতে, আর চীৎকার করে পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুলতে।

এবার এটা কাঁকড়া বিছা নয় তেঁতুলে বিছা—ইংরাজিতে বলে "সেন্‌-টি-পিড়্" (Centipede), তার মানে "শত পদ"। ঠিক একশটা না হ'ক অনেকগুলি পা থাকে বলে এদের "শত পদ" বলে।

গত বড়দিনের ছুটিতে বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চৌদ্দ দিন পরে ঘরে ফিরে এলাম। এই চৌদ্দ দিন আমার ঘরের টেবিলের উপরের খাতা পত্র, বই, কোনটাই নাড়া চাড়া হয় নাই। বাড়ি ফিরে এসে তোমায় একটা আশ্চর্য্য ফড়িঙের কথা লিখব বলে সেই খাতার তাড়াটা তুলেছি, অমনি দেখি তার তলায় একটা মস্ত তেঁতুলে বিছে, যাকে পূর্ব্ব বঙ্গে বলে "চেলা" বা "চ্যালা"।

খাতা তুলতেই সেটা সুড়সুড় করে পাশের বই-এর ফাঁকে ঢুকল। আমি তখন দৌড়ে একটা বড় চিম্‌টে নিয়ে এলাম। বইটা সরাতেই বিছাটা বেরিয়ে আর এক বই-এর ফাঁকে ঢুক্‌তে চল্ল। আমি তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে একটা বড় কাঁচের বোতলের মধ্যে পূরে ফেল্লাম।

এর গাটা দেখতে যেন এক ছড়া তেঁতুলের বীচির মালা। এক ছড়া পাকা তেঁতুলে যেমন অনেকগুলি কোষ বা পাঁপ্ (পর্ব্ব) একটার পর একটা সাজান থাকে, এ বিছার শরীরটাও সেই রকম অনেকগুলি একই রকমের চাক্‌তি, কোষ, বা পাঁপ্ পর পর ছড়ার মত করে গড়া।

আমি গুনে দেখ্‌লাম যে মাথা বাদে তার গায়ে একুশটা কোষ আছে। প্রত্যেক কোষ, পিঠের দিকে একখানি আর পেটের দিকে একখানি এই দুইখানি শক্ত চাক্‌তি দিয়ে গড়া। এই দুইখানি চাক্‌তি দুই পাশের দিকে পাৎলা চামড়া দিয়ে একসঙ্গে জোড়া। যতটা কোষ আছে তার প্রত্যেকটার দু'পাশ থেকে দু'টা পা বেরিয়েছে।



একুশটা কোষে একুশ যোড়া পা। পিছন দিকে পাগুলি ক্রমশঃ বড় হয়ে গিয়েছে। শেষের পা যোড়া সব চাইতে বড় আর পিছন দিকে লম্বিয়ে থাকে, দেখলে মনে হয় যেন দুটো শুঁয়ো।

পাগুলিতে পাঁচটা করে গাঁইট আছে আর প্রত্যেক পাযেব আগায় ছুঁচল বাঁকা নখ আছে।

একে আমার ইঞ্চিকাঠি দিযে মেপে দেখলাম। নয় ইঞ্চ লম্বা আর আধ ইঞ্চ চৌড়া হ'ল। ''সন্দেশ'' এর পাতা লম্বায় আট ইঞ্চ— বিছাটা তার চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি

লম্বা। এখন দেখ কত বড় বিছাটা। তুমি অত বড় বিছা কখন দেখ নাই—তোমার কলকাতায় এত বড় বিছা নাই। এরা পাহাড়ে জায়গায় থাকে। এ জাতের বিছা এক একটা এর চেয়েও বড় হয়। ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। আমরা সচরাচর পাঁচ ছয় ইঞ্চ লম্বা বিছা দেখতে পাই। পৃথিবীর সব দেশেই তেঁতুলে বিছা দেখা যায়। গরম দেশের বিছাই খুব বড় বড় হয়। ইউরোপে বড় বিছা জন্মায় না। সেখানে অনেক জাতেব বিছা আছে তাদের কারু গায়ে ৭টা কারু ১৫টা আবার কারু ৩৯টা কারু ১২৩টা করে কোষ থাকে। কিন্তু সব জাতই ছোট ছোট।

এখন এর মাথাটা দেখা যাক্। মাথার উপরের দিক্‌টা একটা গোল শক্ত ঢালের মত চাক্‌তি, তাতে এক যোড়া লম্বা, সরু, অনেক-গাঁইট-যুক্ত শুঁয়া আছে, আর মাথার দুই ধারে চারটি করে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আছে।

মাথার তলায় দিক্‌টায় আর একখানা চাক্‌তি আছে, তাতে এক যোড়া, কাস্তের মত বাঁকা, খুব শক্ত আর ছুঁচল ঠোঁট আছে। এই ঠোঁটকে দংশনোষ্ঠ বলা যেতে পারে। এটা কিন্তু মুখের ঠোঁট নয়। সে ঠোঁট আর এক যোড়া আছে তা দিয়ে বিছারা খায়। মাথায় যে দুটা চাক্‌তি আছে, সে দুটাও গায়ের কোষ। এদুটা থেকে দু'যোড়া পা বেরুন উচিত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে দ্বিতীয় যোড়া পা-ই বদ্‌লে গিয়ে ঐ রকম সাঁড়াশির মত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এটা বিছাদের শিকার ধরবার ও মারবার অস্ত্র; আর শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার অস্ত্রও বটে।

এই দুটা দংশনোষ্ঠের গোড়ার দিক্‌টা মোটা আর নরম, আর তাতে বিষের থলে থাকে। আগের দিক্‌টা বিড়ালের নখের মত ক্রমশঃ সরু, বাঁকা ও ছুঁচল আর লোহার ছুঁচের মত শক্ত আর কাল। তার ভিতরে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত লম্বা সরু ছিদ্র আছে। বিছা যাকে কামড়ায় তাকে এই 'ঠোঁট' দিয়ে সাঁড়াশির মত চিমটে ধরে, আর সেই সময়ে আর ঠোঁটের ভিতরের ছিদ্র দিয়ে বিষের থলি থেকে বিষ ঢেলে দেয়। সে বিষের বিষম জ্বালা। যারা বিছের কামড় খেয়েছে তারাই জানে কেমন মজা। ছোট ছোট জন্তু ত অজ্ঞান হয়ে যায়, অনেক সময়ে মরেও যায়।

এই বিছার গায়ের উপর দিকে রং পাকা তেঁতুলের মত গাঢ় ব্রাউন বা লালচে কাল। পেটের দিকে রং মেটে হল্‌দে। দুই পাশের রং লালচে মেটে, পায়ের রং লাল, পায়ের নখগুলি কাল।

এরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে। ইট পাথর বা কাঠের তলায়, পাথরের দেয়ালের ফাটলে বাস করে। কখন কখন ঘরের ভিতর এসে তক্তপোষের ফাঁকে, চেয়ারের তলায় টেবিলের কোণে, জুতার ভিতরে, কোটের মধ্যে, তোষকের তলায়, বই-এর ফাঁকের মধ্যে আশ্রয় লয়।

এরা রাত্রিতে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। তেলাপোকা, গুবরেপোকা, শুঁয়ো পোকা, কেন্নো, কেঁচো আর নানা রকমের কীট পতঙ্গ, পোকা মাকড় খায়। ছোট ছোট

টিক্‌টিকি গিরিগিটি ধরে খায়। একবার লণ্ডনের পশুশালায় একটা এদেশী বড় তেঁতুলে বিছা রাখা হয়েছিল। তাকে তার চেয়ে বড় জীয়ন্ত টিক্‌টিকি আর গিরিগিটি খেতে দেওয়া হইত। সেটা তাই খেয়ে এক বৎসর বেঁচে ছিল।

স্ত্রী-বিছা অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গায় গোছা গোছা ডিম পাড়ে। সেগুলি দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল গোল ফলের গোছার মত। বিছা ডিম পেড়ে সেই ডিমে তা দেবার জন্য তার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। যত দিন ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরোয় ততদিন আর নড়ে চড়ে না। অনেক দিন খাবার টাবার না পেলে নিজেরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছানা আর ডিম ফুটে বেরোয় তাদের ধরে ধরে খায়।

বাচ্চা যখন ডিম ফুটে বেরোয় তখন তার গায়ে ২১টা গাইট থাকে না আর ২১ যোড়া পাও থাকে না। তার চেয়ে ঢের কম থাকে। অথচ দেখতে ঠিক মার মতই হয়। অল্প সংখ্যক কোষ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তারপর মাঝে মাঝে খোলস বদলায়, আর প্রত্যেকবার একটু করে বড় হয়। সেই সময়ে পুরাতন দুই কোষের মাঝে দু একখানা নূতন কোষ গজায়। এইরূপে ক্রমে শরীরে কোষের সংখ্যাও বাড়ে শরীরটাও লম্বায় বেড়ে যায়। এই রকম বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণাবয়ব হয়, অর্থাৎ যে জাতের বিছার শরীরে যতগুলি কোষ বা পাঁপ হবার থাকে, তা হলে পর আর বাড়ে না। দেখ না যেমন তুমি আগে ছিলে কত-ছোট, মার কোলে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে, তারপর ক্রমে বড় হতে লাগলে, লম্বায় বাড়ছ, ওজনে ভারি হচ্ছ, কিন্তু তাই বলে কি তাল গাছ ছাড়িয়ে যাবে না হাতীর মত ওজনে হবে? ২০/২৫ বৎসর বয়স হলে যতটা লম্বা হবার তা শেষ হবে। আর বাড়বে না।

এদের আর একটা মজা আছে জান। এর মাথাটা যদি কেটে ফেলে দাও, তা সমস্ত গা টা আর সব পা গুলি চলতে থাকবে। মুণ্ডহীন বিছা অনেক দূর চলে যাবে। সামনে যদি একটা বাধা দাও, ত থম্‌কে দাঁড়াবে, না হয়, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আবার তার শরীরটাকে যদি দু খণ্ড কর, তবে প্রত্যেক খণ্ডই আলাদা চল্‌তে থাকবে, নড়বে চড়বে। যে খণ্ডতে যতই কোষ গাঁথা থাকবে সে সব কোষ এক যোটে এক দিকে চলবে একটা কোষের পা এক দিকে আর একটা কোষের পা আর এক দিকে তা যাবে না। চার খণ্ড কর। প্রত্যেক খণ্ডই আলাদা আলাদা চলতে ফিরতে থাকবে, প্রত্যেক খণ্ডতেই প্রাণ থাকবে। এখন বল দেখি বিছের কটা প্রাণ? আর প্রাণটা কোথায় থাকে? আর প্রাণটা কি রকম করে শরীরের মধ্যে থাকে—পাখি যেমন খাঁচায় থাকে না, গ্যাস যেমন বোতলে থাকে আর উড়ে যায়? ভায়া আমি তা জানি না, তুমি এখন গবেষণা করে ঠিক কর।

তোমার মেজ দাদামশাই
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশ। চৈত্র ১৩২৫
পৃ· ৩৬৪-৩৬৮

কাঠি-ফড়িং

ভাই সন্দেশ,

একদিন সন্ধ্যা বেলায় এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ি ফিরি, তখন রাত্রি আটটা। আমার সঙ্গে আমার চাকর লণ্ঠন ধরে আসছিল। বাড়ির ঠিক সামনেই একটা ছোট গোল ফুলবাগান। সেটা কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। যখন সেই বাগান ছাড়িয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম যে আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর এক টুক্‌রো শুক্‌নো কঞ্চি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্চে। তাই দেখে দাঁড়ালাম। একটা শুক্‌নো কাঠি নড়ে বেড়াচ্ছে,—এটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য আর অদ্ভুত বোধ হল। আমার ছড়ি দিয়ে সেই কাঠিটাকে একটু নেড়ে দিলাম। তারপর দেখি সেটা আর নড়ে চড়ে না, সেইখানেই অনেকক্ষণ এক ভাবে পড়ে রইল। দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম যে হয়ত এটা বাতাসে নড়্‌ছিল, না হয় ওটাকে কোন পোকায় টান্‌ছিল। তখনই আবার ভাবলাম—বাতাস ত মোটেই নাই, নড়্‌বে কি করে? আর পোকায় টান্‌লেও সেটা বেশ বড় রকমের পোকা হবে, তা কোন পোকাও ত সেখানে দেখা গেল না। সেই কঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম যে কঞ্চির আগার দিকে, কাঁটার কাঠির মত সরু লম্বা দুটো ডাল,—ছিল সোজা হয়ে—সে দুটো মুড়ে হ'ল "দ" এর মত ভাঙ্গা। তার পরেই দেখি যে, কঞ্চিটার দু'পাশ থেকে আরও সব সরু সরু ডাল, যা কঞ্চির গায়ের সঙ্গে সোজা লম্বা হয়ে লেগেছিল,—সেগুলোও আস্তে আস্তে দুম্‌ড়ে "দ" এর মত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আর সেই 'দ' এর মত সরু কাঠিগুলো এগুতে লাগল, আর সেই সঙ্গে সমস্ত কঞ্চিটাও এগুতে লাগল। তখন বেশ বুঝতে পাল্লাম যে, এই জিনিষটা একটা চলন্ত আর জীয়ন্ত কাঠি! পকেট থেকে রুমাল বের করে, সেই জীয়ন্ত কাঠির সামনে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিলাম, আর ছড়ির ডগা দিয়ে সেটাকে রুমালের উপর ঠেলে ফেলে দিলাম। তারপর রুমালের চার খোঁট একত্র করে সেটাকে থলেতে পূরে বাড়ি নিয়ে এলাম।

দিনের আলোতে তাকে ভাল করে দেখ্‌ব বলে সে রাত্রি তাকে একটা টিনের বাক্সের ভিতর বন্ধ করে রেখে দিলাম। পর দিন সকাল বেলায় সেই বাক্সটাকে বারান্দায় টেবিলের উপর রেখে খুল্‌লাম। দেখি বাক্সের গা বেয়ে সেই কাঠিটা উঠ্‌ছে। তাকে টেবিলের উপর ছেড়ে দিলাম। খুব ধীরে ধীরে গুটি গুটি করে পা বাড়িয়ে চল্‌তে লাগল। এর গায়ে পেনসিলের ডগা দিয়ে সামান্য একটু খোঁচা মারলাম, আর তখনি

এটা আর সামনের পা যোড়া সম্মুখ দিকে সোজা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে, অন্য পাগুলোও গায়ের পাশে টেনে এনে সোজা লম্বা করে দিয়ে সত্যিকার কাঠির মত আড়ষ্ট বা ''কাঠ'' হয়ে পড়ে রইল। আর নড়ে চড়ে না—মৃতবৎ অথবা কাঠিবৎ হয়ে গেল।

আমি মাপ্‌কাঠি দিয়ে একে মাপ্‌লাম। মাথার আগা থেকে পেটের শেষ পর্য্যন্ত দেহ ও মুণ্ড সওয়া সাত ইঞ্চ হল। পিছনের পা যোড়া যদিও পিছন দিকে লম্বিয়ে দিয়েছে তবুও পেটের সীমা ছাড়িয়ে যায় নাই। সামনের পা, যা সম্মুখ দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার আগা থেকে গায়ের শেষ পর্য্যন্ত মাপলে বার ইঞ্চ হয়। মাথাটা সিকি ইঞ্চ মাত্র, তার মধ্যে ছোট ছোট দুটি চোখ। দুই চোখের মাঝে মাথার উপর—গোড়া-মোটা আগা-সরু এখন দুটি ছোট্ট শিং আছে। মাথার সামনের দিকে দুটো শুঁয়ো আছে, তাতে অনেকগুলো গাঁইট। সে দুটো লম্বায় দেড় ইঞ্চ মাত্র।

সব পতঙ্গের বক্ষস্থল বা বুক যেমন তিনভাগে বিভক্ত থাকে ও প্রত্যেক ভাগের তলার দিক থেকে এক যোড়া পা বেরোয়, এই পোকার বুকও তেমনি।

এরা ফড়িং বর্গের জীব—আমাদের গঙ্গা-ফড়িং-এর জ্ঞাতি ভাই। গঙ্গা-ফড়িংদের অগ্র-বক্ষ বা বুকের প্রথম ভাগটা, যার সঙ্গে মাথাটা যোড়া থাকে, সেটা খুব লম্বা হয় এবং অপর দুই ভাগের চেয়ে বড় হয়। কাঠি-ফড়িংদের বুকে প্রথম ভাগটা খুব ছোট হয়। এটার অগ্র-বক্ষ সিকি ইঞ্চ মাত্র। কাঠি ফড়িংদের মধ্য-বক্ষ অর্থাৎ বুকের মাঝখানের ভাগটা সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা হয়। এটার মধ্যবক্ষ দেড় ইঞ্চ লম্বা আর অন্তবক্ষ বা শেষ ভাগটা সোয়া ইঞ্চ লম্বা। গঙ্গা ফড়িং সামনের পায়ে চলতে পারে না, তা দিয়ে পোকা ধরতে পারে। কাঠি ফড়িং-এর সব ক'টি পা চল্‌বার উপযোগী করে গড়া।

এর উদর বা পেটটা চার ইঞ্চ লম্বা। তাতে নয়টা গাঁট বা ভাগ আছে। শেষের ভাগ তিনটা খুব ছোট ছোট। আর গুলো বেশ বড় বড়। পেটের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমান চওড়া সিকি ইঞ্চ মোটা বা পুরু।

বুকে আর পেটে এই রকম গাঁট আর পাব বা পর্ব্ব থাকাতে দেখ্‌তে ঠির বাঁশের কঞ্চির মত দেখায়। গাঁট থেকে কঞ্চির সরু ডালের মত পা বেরিয়েছে, আর শুকনো কঞ্চির মত ফ্যাক্‌সা মেটে রং—তাতে কঞ্চির সঙ্গে সাদৃশ্যটা খুব বেশি।

এর ঠ্যাংগুলো খুব বড় আর সরু। ঠ্যাঙে উরু, জঙ্ঘা, আর চরণ, স্পষ্ট তিন ভাগ আছে। সামনের পায়ের উরুতে গোড়ার দিকে ভিতর-পানে একটা খাঁজ আছে, সে জায়গাটা অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে কাটা। পোকা যখন পা দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় তখন দুই পায়ের খাঁজের ভিতর মাথাটা ঢুকে খাপে খাপে বসে যায়। তাতে গা ও পা যেন এক দেখায়।

আমার বাড়ির উঠানে একটা নেবু গাছ আছে। আমি এই পোকাটা নিয়ে সেই গাছের একটা সরু ডালে বসিয়ে দিলাম। একটু পরে পোকাটা আস্তে আস্তে সেই

ডালের উপর চল্‌তে লাগ্‌ল। এই সময়ে আমার চাকর আমায় কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এল আমি তার দিকে ফিরে উত্তর দিলাম। একটু পরেই ফিরে পোকাটাকে আর দেখতে পেলাম না। অনেকক্ষণ খুঁজলাম। বেশি দূর কখনই যেতে পারে নাই, লাফাতেও পারে না। প্রায় মিনিট দশ খোঁজার পর সেটাকে দেখ্‌তে পেলাম। ঐখানেই আধ হাত দূরে কাছের একটা ডালে ছিল, সেই ডালের রঙ্গে আর তার গায়ের রঙ্গে এমনি মিশে গিয়েছিল, যে ওটা নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে মোটেই "ঠাহর" হয় না।

এই পোকাটাকে কলকাতায় আনিয়ে তার ফটো তুলিয়েছিলাম। সেটাও এখানে ছাপিয়ে দিলাম।

পৃথিবীতে অনেক জাতের কাঠি ফড়িং আছে। এরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বাস করে। এক ভারতবর্ষেই পঞ্চাশ ষাট্ জাতের কাঠি ফড়িঙের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন জাত দুই তিন ইঞ্চের বেশি হয় না, কোন কোন জাত চার পাঁচ ইঞ্চ হয় আবার কোন কোন জাত সাত আট ইঞ্চ হয়। আসাম সুমাত্রা ও অস্ট্রেলিয়াতে দশ ইঞ্চ বড় ফড়িং দেখা যায়।

কোন কোন জাতের গা বেশ মসৃণ হয় আবার কোন কোন জাতের গা-ময় কাঁটা ভরা থাকে। কোন কোন জাতের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই পাখা হয়। কোন কোন জাতের শুধু পুরুষদেরই পাখা জন্মে স্ত্রীদের পাখা হয় না। কোন কোন জাতের স্ত্রী-পুরুষ কারু পাখা জন্মায় না। আমি যে জাতের কাঠি ফড়িং ধরেছি এদের স্ত্রী-পুরুষ কারু পাখা হয় না।

অধিকাংশ জাতেরই গায়ের রং মেটে হয়, কোন কোন জাতের গায়ের রং সবুজ হয়। যে সব জাতের পাখা জন্মে তাদের মধ্যে কোন কোন জাতের পাখার রং খুব উজ্জ্বল আর রঙ্গীন হয়। কাঠি ফড়িং যখন হঠাৎ পাখা মেলে উড়ে যায় তখন মস্ত একটা রঙ্গীন জিনিস চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, তারপর যেই পাখা গুটিয়ে ঝোপে ঝাড়ে বসে তখন চোখের সামনে থাক্‌লেও আর তাকে দেখা যায় না, সে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। যেন ভেল্কিবাজি।

তোমরা কাগজের তৈরি চীনে পাখা দেখেছ? দু'খানা কাঠিতে আঁটা কোঁচকান কাগজের পাখা—মেলে দিয়ে বড় ও গোল করা যায়, আবার গুটিয়ে দুই কাঠির মাঝে লম্বালম্বি ভাঁজ করে রাখা যায়। এদের পাখাও ঐ রকমে গুটান যায়। পাখার উপর-ধারটা পুরু ও শক্ত, আর তার রংটা মেটে বা সবুজ পোকার মত। আর পাখার তলার অংশটা সূক্ষ্ম, পাৎলা, চ্যাটাল আর সেটা খুব রঙ্গীন। ফড়িং যখন পাখা গুটিয়ে বা ভাঁজ করে পিঠের উপর ফেলে, তখন পাখার উপরের অনুজ্জ্বল রংটাই চোখে পড়ে আর রঙ্গীন অংশটা তার তলায় ভাঁজ হয়ে ঢাকা পড়ে যায়।

কাঠি ফড়িংদের পুরুষরা ছোট ও সরু হয়, স্ত্রীরা হয় বড় ও মোটা। সব জাতের কাঠি ফড়িঙের স্বভাব প্রকৃতি প্রায় একই রকম। ভয় পেলে ঠ্যাংগুলি গায়েব সঙ্গে

লাগিয়ে সোজা লম্বা করে দিয়ে শক্ত ও নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। মরার ভাণ করে। তখন সত্যি শুকনো কাঠি, কি ঘাসের ডাঁটা অথবা জীয়ন্ত পোকা তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এই রকম করে এরা পাখি ও অন্যান্য হিংস্র কীট পতঙ্গের হাত হতে রক্ষা পায়।

এরা বনে জঙ্গলে গাছে ও ঝোপ ঝাপে থাকে আর গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। গঙ্গা ফড়িংঙের মত পোকা মাকড় খায় না। গাছের পাতা খেলেও মানুষের কোন ক্ষতি করে না, কারণ চাষ ক্ষেতে বড় একটা থাকে না। এরা রাত্রিচর। দিনের বেলায় ডাল পালার ভিতর চুপ করে বসে থাকে, রাত্রি হলেই খাবারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়।

এরা যখন ডিম পাড়ে তখন ডিম গড়িয়ে মাটিতে পড়ে। ডিমগুলি ছোট মটরের মত, তার উপরের খোলাটা শক্ত ও তাতে খাঁজ কাটা থাকে। সেই ডিমের উপর একটা ঢাক্‌নি বা ছিপি আটা থাকে। সেই ঢাক্‌নি খুলে বাচ্চা বেরোয়। ডিম থেকে বাচ্চা যখন বেরোয় তখন দেখ্‌তে বড়দেরই মত হয় কেবল আকার খুব ক্ষুদ্র থাকে। তারপর ক্রমে শরীরটা বড় হয়। তখন গায়ের চামড়াটায় টান পড়ে, শরীর আর তার ভিতর আঁটে না। গায়ের খোলসটা পিঠের উপর দিকে ফেটে যায়, আর সেই পুরাণ খোসার ভিতর থেকে ফড়িং তার সমস্ত শরীরটাকে বের করে নেয়। এই সময়ে ভিতরের নূতন চামড়া নরম থাকে, তারপর ক্রমে শক্ত হয়। আবার খেয়ে খেয়ে ফড়িং যখন বড় হয় আর পুরাণ চামড়ায় টান পড়ে তখন আবার খোলস বদলায়। এইরূপে পাঁচ-সাত বার খোলস বদলাবার পর শরীরটা পুরোমাত্রায় বড় হয়।

এদের পায়ের গাঁট বড় সহজে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাতে বড় ক্ষতি হয় না, আস্তে আস্তে আবার সেটা গজিয়ে ওঠে। দু-চারবার খোলস বদলাবার পর ঠিক যেমন ছিল তেমন হয়। তাতে মাস দু-এক সময় লাগে।

তোমার মেজ দাদামশাই
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশ। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। পৃ· ৩৮-৪৩

পোকার কীর্ত্তি

ভাই "সন্দেশ",

তোমরা মাঝে মাঝে পোকামাকড়ের সংবাদ লেখ—আমরা প'ড়ে আমোদ পাই। এইবার আমি একটা পোকার সাক্ষাৎ পেয়েছি—সেটার অদ্ভুত কাণ্ড যদি চোখে দেখতে তাহ'লে তোমাদের সেই মেজদাদামশাইকে শুদ্ধ তামাসা দেখাবার জন্য দৌড়ে এনে হাজির করতে।

সকালবেলায় বসে বসে খবরের কাগজ পড়েছি, এমন সময় একটি ছেলে দড়ির আগায় কয়লার মত কি একটা ঝুলিয়ে এনে বলল, "দেখুন ত, এইটেকে সন্দেশে দেওয়া যায় কি না।" "এইটে" আর কিছুই নয়, একটি হাল্কা বাদামী রঙের পোকা, তার মাথায় লম্বা দুটো শিং, সেই শিঙের আগায় দড়ি বাঁধা। পোকাটা ঝুল্‌তে ঝুল্‌তেই ছয় পাকে একটা মস্ত কয়লার টুকরোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে—পোকাও ঝুল্‌ছে, কয়লাও ঝুল্‌ছে।

আমরা একটা লোহার শিকের আগায় কয়লা শুদ্ধ পোকাটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে তার ফটো তুলবার আয়োজন করতে লাগলাম। সব ঠিকঠাক করে ছবি তুলতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল, পোকাটা তখনও কিন্তু কয়লাটাকে ধরেই রেখেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা কি আরও বেশিক্ষণ ধ'রে সে কয়লাটাকে স্থিরভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তারপর আমরা জোর ক'রে কয়লাটাকে ছাড়াতে গেলাম, কিন্তু পোকাটা হঠাৎ এমন অদ্ভুত ক্যাট্‌-ক্যাট্‌ ক্যাট্‌-ক্যাট্‌ শব্দ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, যে আমরা ভয়ে চমকে উঠে দস্তুরমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

পোকাটা একটা আরশুলার চাইতে খুব বেশি বড় হবে না। তার ওজন সিকি তোলা মাত্র। কিন্তু ঐ কয়লাটুকু ওজন ক'রে দেখলাম প্রায় আধসের ওজন হ'ল, অর্থাৎ পোকাটার চাইতে ১৫০ গুণ ভারি! হিসাব করে দেখ, একটা দুই মণ ওজনের মানুষ যদি ঐরকম বাহাদুরি কাণ্ড করতে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে কি রকম কসরৎ দেখান দরকার। চারটে বড় বড় হাতীর ওজন তিনশ' মণ ধরা যেতে পারে। এই রকম একটি বোঝা যদি সে ঘণ্টাখানেক ঝুলিয়ে রাখতে পারে তাহ'লে তাকেও বলি ঐ পোকার মতন বাহাদুর।

দুঃখের বিষয়, এমন অদ্ভুত পোকাটার নাম ধাম পেশা কিছুরই খবর আমার জানা

নাই, তাই তোমাদের মেজদাদামশায়ের কাছে তার ছবি আর বর্ণনা পাঠিয়ে দিলাম। তিনি যদি এই পোকার চালচলন আহার বিহারের সব ঘরাও খবর আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে আমরা খুশী হয়ে পড়ি। বিশেষত, কি খেয়ে তার গায়ে এমন জোর, সেই আসল খবরটা জানতে পারলে, একবার তাই খেয়ে দেখি—কারণ, অনেকদিন থেকেই আমার পালোয়ান হবার বেজায় সখ। ইতি—

সন্দেশ। আষাঢ় ১৩২৬। পৃঃ ৮৫-৮৭

পোকার কথা

পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ এই সকলের বিষয় জান্‌তে হ'লে, এই সকল শব্দের অর্থ কি, এই সব কথায় কি বুঝায়, তা ভাল ক'রে জান্‌তে হয়।

পোকা-মাকড়ের "মাকড়" শব্দের অর্থ বুঝি মাকড়সা—আর সেই সঙ্গে মাকড়সার মত যত প্রাণী তাদের বুঝি—যেমন মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, কুকুরের গায়ের এঁটেলিপোকা, আর খোস পাঁচড়ার কচ্ছুকীট। এদের সকলের আটটা পা, শরীরে দুই ভাগ; মাথা আর বুক মিশে এক ভাগ, আর উদর অপর ভাগ।

"পোকা" কি? আমরা বলি উই পোকা, গুবরে পোকা, শূঁয়োপোকা, কেন্নো-পোকা, ছারপোকা, কাঁচপোকা। এদের অনেকে উড়তে পারে, অনেকে উড়তে পারে না। এদের সকলের পা আছে, হাঁটতে পারে। আবার যে সব ক্ষুদ্র প্রাণী হাঁটতে পারে না, কেঁচো বা কৃমির মত কিল্‌বিল্‌ করে নড়ে চড়ে বেড়ায়, তাদেরও পোকা বলি। যেমন বলি "পোকা পড়েছে", "পোকা কিল্‌বিল্‌ করছে"।

তবেই হল যে, যে সব ক্ষুদ্র প্রাণীর শরীরের ভিতরে হাড় নাই, দেহ অস্থিহীন, তারা উড়তে পারুক আর নাই পারুক, তাদের পা থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের বলে "পোকা"।

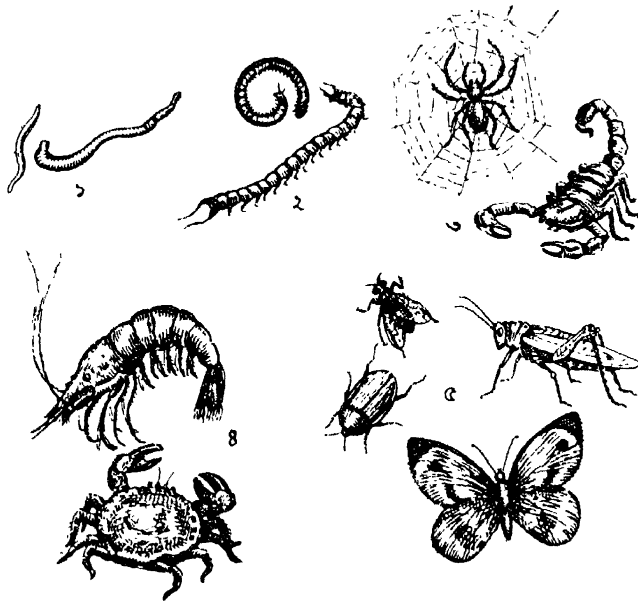
"কীট" বলে, যে সব পোকা উড়তে পারে না। কৃমি, কেঁচো, জোঁক, ছারপোকা, উকুন, জউপোকা (যা থেকে গালা আর আল্‌তা হয়) এরা সব "কীট"। 'কৃমি' একটা শব্দ আছে। এটা কি তা তোমরা জান। অনেক ছেলের পেটে কৃমি বা ক্রিমি হয়। পেট থেকে ছোট আর বড় দু রকমের কৃমি বেরুতে তোমরা অনেকেই দেখেছ। এদের মাথা পেট বুক সব এক, গা নরম ও লম্বা, পা নাই, এরা শরীর এঁকে বেঁকে কিল্‌বিল ক'রে নড়ে চড়ে। আর কৃমির মত যে সব পোকা, যাদের পা নেই, যেমন কেঁচো, জোঁক, তারাও "কৃমি"। এই রকম যত পোকা তাদের আমরা বল্‌ব "কৃমি"। যে সব পোকা কৃমি নয় অথচ উড়তে পারে না তাদের আমরা বল্‌ব "কীট"। যে সব পোকার পাখা আছে, উড়তে পারে, তারা "পতঙ্গ"। প্রজাপতি, উই, মাছি, মশা, আরসুলা, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতি সব পতঙ্গ। যে পোকা উড়তে পারে না, সাধারণতঃ লোকে তাকে পতঙ্গ বলে না।

কৃমি, কেঁচো; কেন্নো, তেঁতুলে বিছে; ছারপোকা, উকুন; প্রজাপতি, ফড়িং—এরা

সবাই পোকা। কিন্তু নিশ্চয় সুবিধার জন্য প্রাণী-বিদ্যায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোকার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। যেমন- -

১। কৃমির মত পোকা, যেমন কৃমি, কেঁচো, জোঁক—এদের বলে কৃমি। ইংরাজিতে চলিত কথায় বলে Worms বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Vermes.

২। চেলা বা তেঁতুলে বিছে, বিছানী বা গৌড়ানি, কেন্নো—যে সব পোকার দেহে



অনেক খণ্ড পর্ব্ব বা পাব আছে, আর যাদের অনেক পা হয়, তাদের বলে "বহুপদী"। ইংরাজিতে বলে Centipede, Millipede শতপদী সহস্রপদী। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Myropoda

৩। মাকড়সার মত যত পোকা, যাদের মাথা ও বুক একসঙ্গে জোড়া, আট্‌টা ক'রে পা থাকে, পা ছাড়া সম্মুখে এক জোড়া দাঁড়া থাকে, যেমন মাকড়সা, কাঁকড়া বিছা বা বৃশ্চিক, বর্ষাপোকা, এঁটেলি, খোসের পোকা- -এদের বলে "অষ্টপদী" বা Octopoda, অথবা বিজ্ঞানের ভাষায় Arachnida বা মাকড়ের দল।

৪। যে সব পোকা অনেকটা অষ্টপদীর মত, অথচ জলে বাস করে, আর যাদের

গা পা সমস্ত দেহ শক্ত খোলায় মোড়া থাকে—যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি—তাদের নাম "খোলাকী" (crustacea).

৫। যে সব পোকার দেহে মাথা, বুক, আর, পেট, তিনটা ভাগ স্পষ্ট থাকে; আর বুকে ছয়টা পা থাকে; আর মাথায় ছোট বা বড় দুটো শুঙ্গ বা গোঁফ থাকে,—তাদের নাম "ষট্‌পদী" (Hexapoda) বা বিজ্ঞানের ভাষায় "খণ্ডিতদেহী" (Insecta)। এদের অনেকেরই পাখা বা পত্র থাকে, উড়তে পারে—যেমন প্রজাপতি, মাছি, মৌমাছি, ফড়িং, গুবরে প্রভৃতি। উকুন, ছারপোকা, জউপোকার পাখা নাই, কিন্তু ছয়টা পা আছে, গায়ে তিনটা ভাগ আছে। এরা পাখাহীন ষট্‌পদী।

যে সব ষট্‌পদী পোকা উড়তে পারে তাদের সাধারণ নাম পতঙ্গ, আর যে সব ষট্‌পদী পোকা উড়তে পারে না তাদের সাধারণ নাম কীট দেওয়া হয়। কিন্তু এমন অনেক পতঙ্গ আছে যাদের পুরুষদের পাখা গজায়, স্ত্রীদের পাখা হয় না। সেখানে পুরুষটা পতঙ্গ ও স্ত্রীটা পতঙ্গ নয়, এরকম বলা ঠিক হয় না। আবার পতঙ্গের বাল্যাবস্থায় পাখা থাকে না, তাই বলে পতঙ্গ-শিশু "পতঙ্গ" নয়, বলাটা সঙ্গত হয় না। সেইজন্য ষট্‌পদীর আর এক নাম পতঙ্গ রাখা হ'য়েছে। পতঙ্গের আসল অর্থ যাই হোক্, আজকাল বিজ্ঞানের ভাষায় ষট্‌পদী আর পতঙ্গ একই অর্থে ব্যবহার হয়। এই দুটি শব্দেই খণ্ডিতদেহী Insectকে বুঝায়। উকুন আর ছারপোকাকে পাখাহীন পতঙ্গ বলা হয়। পৃথিবীতে ষট্‌পদী বা পতঙ্গ পোকাই বেশী—যত পোকা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ষট্‌পদী পতঙ্গ—সুতরাং পতঙ্গদের বিষয় ভাল ক'রে জানা উচিত।

ষট্‌পদী বা পতঙ্গদের দেহে মাথা, বুক, পেট—এই তিন ভাগত আছেই, তা ছাড়া এদের দেহে তেরটা খণ্ড বা পাব থাকে। মাথায় একটা, বুকে তিনটা, পেটে নয়টা, মোট তেরটা। কারু কারু এই তেরটা ভাগের সব কটাই স্পষ্ট দেখা যায় না, অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে বুঝা যায়। কিন্তু পতঙ্গের কৃমি অবস্থায় বা কীটাবস্থায় প্রায় সকলেরই এই তেরটা ভাগ স্পষ্ট দেখা যায়।

পতঙ্গদের অনেকের পিঠের তিনটা খণ্ডই ভিন্ন ভিন্ন থাকে, কারু কারু প্রথম ভাগটা আল্‌গা থাকে, কারু কারু বুকের প্রথম খণ্ডটা দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে যায়। সব পতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ একটা চিম্‌সে ত্বক্ বা চামড়ার আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই খোলসটা ঠিক আমাদের গায়ের চামড়ার মত নয়। শিংকে আগুনে তাতালে সেটা গলে যায়, তার আকারটা আর থাকে না। পতঙ্গের গায়ের খোসাটাকে আগুনে তাতালে পুড়ে কয়লার মত কাল হয়ে যায়, কিন্তু তার আকৃতিটা বজায় থাকে। চিংড়ির খোলা যে পদার্থের তৈরি, পতঙ্গদের খোলাও সেই পদার্থের তৈয়ারি, কেবল খুব পাৎলা। এ পদার্থকে ইংরাজিতে বলে Chitin, আমরা বলি "কঞ্চুকিন্"। পতঙ্গেরা নিশ্বাস নেয়, কিন্তু নাক মুখ দিয়ে নয়। মুখ দিয়ে যখন বাতাস টান্‌তে বা ফেল্‌তে পারে না, তখন মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারে না। অনেক পতঙ্গ শব্দ করে বটে, কিন্তু সে শব্দ, হয় পাখা

বা পা নাড়ার জন্য, না হয় গায়ের কোন অংশে পাখা বা পায়ের ধারের ঘর্ষণ লেগে হয়। তবে এরা নিশ্বাস নেয় কি করে? এদের শরীরের দুই পাশে একসার করে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের ভিতর সরু সরু নল থাকে, সেই সব নল থেকে আরো সরু সরু নলের ডাল পালা বেরিয়ে সর্ব্বাঙ্গের সকল স্থানে ছড়িয়ে যায়। সেই সব নল বা 'শ্বাসনালী' দিয়ে বাতাস আসে যায়, তাইতে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলে। এই সব ছিদ্রপথই ওদের নাক। দেহের দুই ধারের ছিদ্র পথ সব বন্ধ করে দিলে শ্বাসনালীতে বায়ু চলাচল বন্ধ হ'য়ে যায়, আর পতঙ্গ মরে যায়।

পতঙ্গদের অধিকাংশেরই পিঠের উপর দুই যোড়া বা চারিখানা পাখা থাকে, যেমন প্রজাপতি, ফড়িং, আরসুলা, বোলতা, উই, গুবরে পোকা। কোন কোন পতঙ্গের, যেমন মশা আর মাছির, এক যোড়া পাখাই দেখা যায়, আর এক যোড়া খুব ছোট্ট হয়ে দুটা ছোট্ট গোঁজের মত শরীরের দুপাশে থাকে। আবার কোন কোন পতঙ্গের বা ষট্‌পদীর মোটেই পাখা গজায় না, যেমন ছারপোকা, উকুন, কাঠিফড়িং, জউ পোকা। আবার অনেক পতঙ্গের পুরুষদের পাখা হয়, স্ত্রীদের হয় না।

সব পতঙ্গের খাদ্যও সমান নয়। কোন কোন পতঙ্গ রস চুষে খায়—তাদের মুখের গড়ন সেই রকম। কেউ কেউ গাছপালার রস খায় কেহ বা মাংসের রস খায়। কেউ কেউ কামড়ে বা কুরে খায়, তাদের মুখের গড়ন অন্য রকম। তাদের কেহ কেহ পাতা, দাঁটা, কাঠ কামড়ে খায়। কোন কোনটা অন্য পোকা ধরে খায়, কোন কোনটা পচা মাংস খায়, কোন কোনটা বিষ্ঠা গোবর খায়। কোন কোন পতঙ্গ কৃমি বা কীট অবস্থায় যা খায়, পতঙ্গ অবস্থায় তা খায় না। প্রজাপতি কৃমি অবস্থায় পাতা খায়, দাঁটা খায়, পতঙ্গাবস্থায় ওসব খেতেই পারে না, তখন মধু শুষে খায়।

পতঙ্গের যত খাওয়া তার কৃমি অবস্থাতেই ঘটে। অনেকের পাখা হলে আর বেশী দিন বাঁচেও না। তখন কেবল কোথায় কোন যায়গায় ডিম পাড়লে বাচ্চারা ভাল খেতে পাবে আর নিরাপদে থাক্‌বে তাই খুঁজে বেড়ায়। অনেক পতঙ্গ উড়ে বেড়ায় শুধু ডিম পাড়বার যায়গা খুঁজবার জন্য। একবার ডিম পাড়া হয়ে গেলে, তারপর তার বাচ্চাদের কি দশা হল, তা জানতেও পায় না, সে বিষয় ভাবতেও পায় না, পতঙ্গটা মরে যায়। সন্তানের লালন পালনের ভার আর তাকে নিতে হয় না। সন্তানের জন্য যত ভাবনা ভেবে নেয় ডিম পাড়বার সময়ে। যা খেয়ে তার সন্তান বাঁচবে সেই খাবার সামগ্রীর উপরই পতঙ্গ-মাতা ডিম পেড়ে দেয়, অথবা যেখানে ডিম পাড়ে সেখানে তার সন্তানের জন্য খাবার এনে সঞ্চয় করে রেখে দিয়ে যায়। ডিম ফুটে বেরিয়ে বাচ্চা সেই খাবার খেয়ে বড় হয়।

পতঙ্গের "কৃমি অবস্থা" বা "কীটাবস্থা" অনেকবার বলেছি, সেটা হয়ত বুঝতে পারনি; তাই বুঝিয়ে বল্‌ছি। মানুষ যখন জন্মায়, তখন খুব ছোট্ট থাকে, তাকে শিশু বলি। তারপর একটু বড় হলে বালক হয়, তার পর আরও বড় হলে যুবা হয়, তার

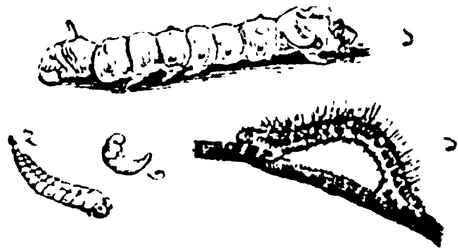
পর তার শরীর আর বাড়ে না, বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তত বড়ই থাকে। কিন্তু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার রূপটা মানুষের মতই হয়। মানুষ ছাগল গরু কুকুর বিড়াল বাঘ হাতী ইন্দুর প্রভৃতি যারা শিশুকালে মার দুধ খেয়ে বাঁচে তাদের বাচ্চা যখন মার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাদের চেহারা বা রূপ তাদের মা বাপেরই মত হয়। ছাগ শিশুর ছাগেরই রূপ, ইন্দুর শিশুর ইন্দুরেরই রূপ আর মানব শিশুর মানবেরই রূপ হয়। আয়তনে কেবল ছোট থাকে। যে রূপ নিয়ে তারা ভূমিষ্ঠ হয়, সারা জীবনে সে রূপের ধরণটা আর বিশেষ বদলায় না।

পাখী, কুমীর, টিক্‌টিকি, সাপ, কাছিম, মাছ প্রভৃতি অনেক প্রাণীর প্রথমে ডিম হয়, পরে সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, সে বাচ্চার রূপ তার মা বাপের রূপের মতই হয়। তারপর আমরণ সেই রূপই থাকে। ডিমের রূপটা ত আর সেই জন্তুর রূপ নয়, সুতরাং এদের জীবনে দুটা রূপ হয়। তাই এদের "দ্বিজ" বা দ্বিজন্মা বলে।

পতঙ্গের বেলায় কি হয়? জন্মকালে পতঙ্গ-শিশুর কি রূপ থাকে? তার পর তার বাল্যাবস্থায়ই বা কিরূপ হয়, আর যৌবন কালেই বা কি রূপ হয়?

২

পতঙ্গদের প্রথমে ডিম হয়। সব পতঙ্গের ডিম একরকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন পতঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ডিম হয়। তারপর ডিম ফুটে যা বেরোয় সেটা অধিকাংশেরই পতঙ্গের মত হয় না, হয় একটা কৃমির মত। এক এক রকম পতঙ্গের এক এক রকম কৃমি হয়। এই অবস্থাকে আমরা পতঙ্গের কৃমি অবস্থা বা কীটাবস্থা বলি। ইংরেজিতে বলে caterpillar, grub, maggot. ক্যাটারপিলার, যাদের পা থাকে, হেঁটে বেড়ায়; গ্রব্ আর ম্যাগট যাদের পা থাকে না। প্রজাপতিদের

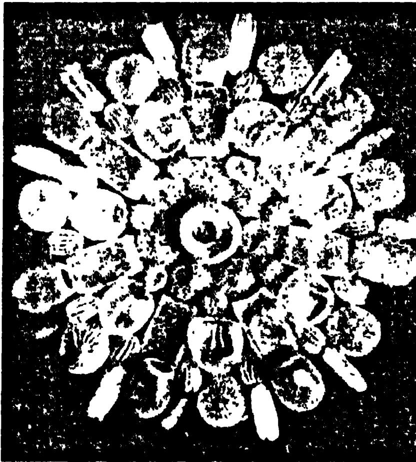


কৃমির বা কীটের পা থাকে, হেঁটে বেড়ায়। এদের কোন কোন জাতের কৃমির গায়ে রোম থাকে, কোন কোন জাতের রোম থাকেও না; কিন্তু এদের সকলকেই ইংরাজিতে 'ক্যাটার পিলার' বলে, আমরা বলি শুঁয়ো পোকা। মাছিদের কৃমির রোমও থাকে না, পাও থাকে না, চলে বেড়াতে পারে না, গা ও মাথার তফাৎ বোঝা যায় না; এদের ইংরাজিতে বলে 'ম্যাগট', আমরা বলি, পোক্, পুকি। গুবরে পোকাদের কৃমির মাথা

স্পষ্ট থাকে, কারু কারু পা থাকে কারু কারু থাকে না, কিন্তু সকলেই এক জায়গায় অল্প স্থানে নড়া চড়া করে। বাইরে বাতাসে হেঁটে চলে বেড়ায় না, এদের ইংরাজিতে বলে 'গ্রব্'। এদেরও বলে পোক বা পুকি।

সব পতঙ্গের কৃমি বা কীট অবস্থার সাধারণ নাম ইংরাজিতে larva লার্ভা। আমরা বলিব কৃমি অবস্থা বা কীট অবস্থা, অথবা সংক্ষেপে কৃমি বা কীট।

এই কৃমি বা কীট যখন ডিম থেকে ফুটে বেরোয় তখন খুব ছোট্ট থাকে, তারপর ক্রমাগত খেয়ে খেয়ে আর গায়ের খোলস বদ্‌লে বদ্‌লে বড় হয়। তারপর, তার এই অবস্থার বা কৃমিজীবনের শেষ হয়। তখন সে আর খায় না। তখন নিজের গা থেকে সূতো বের করে তাই দিয়ে, অথবা লালা বা থুতু আর খড় কুটা মাটি দিয়ে, বা পাতলা চামড়ার মত জিনিষ বের ক'রে তাই দিয়ে, একটা গুটি, কোষ বা কোয়া তৈয়ার ক'রে তার মধ্যে নিজেকে একেবারে বন্ধ করে ফেলে। তার ভিতরে তখন তার শরীরটা ছোট হয়ে যায়। তার রূপ আর আগের কৃমির মত থাকে না, একটা ঢিব্‌লি বা পিণ্ডের মত হয়ে যায় তখন সে আর নড়ে চড়ে না, খায়দায় না, জড় পিণ্ডের মত পড়ে থাকে। এ অবস্থায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গজায় নাই, —বিগত অঙ্গ,—সেই জন্য ইহাকে 'ব্যঙ্গাবস্থা' বলা যায়। এই অবস্থাকে ইংরাজিতে বলে chrysalis, pupa। আমরা বলি কোষ, কোয়া, গুটি, কোষাবস্থা, মূকাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা। ইংরাজি সাধারণ নাম pupa আমরা বলব 'গুটি'।



কিছু দিন এই অবস্থায় থাকলে তার দেহের ঘোর পরিবর্তন হতে থাকে। কোষের ভিতরে গুটির শেষ যে রূপ হবে, তার মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অল্পে অল্পে গজাতে থাকে। সে রূপ পূর্ণ হলে পর কোষটা ফেটে যায়, আর তা থেকে পূর্ণ অবয়বযুক্ত পতঙ্গ বা ষট্‌পদী পোকা বাহির হয়। এই তার শেষ অবস্থা বা পূর্ণাবস্থা। অঙ্গযুক্ত, তাই "সাঙ্গ" অবস্থাও বলা যেতে পারে। ইংবাজিতে বলে imago—আমরা বলব 'পূর্ণ পোকা' বা 'সাঙ্গ পোকা'।

যে সব পতঙ্গের ডিম্ব ছাড়া আব তিনটা অবস্থাতেই, কৃমি গুটি আর সাঙ্গ, এই তিন ভিন্ন রকমের রূপ হয়, তাদের পূর্ণ রূপান্তর হয় বলি। প্রজাপতি, গুবরে পোকা, মাছি, মশা, পিঁপড়ে, বোলতা প্রভৃতির পূর্ণ রূপান্তর হয়। আবার কোন কোন পতঙ্গের,

যেমন ফড়িং-এর, এই তিনটা অবস্থায় তিনটা রূপ হলেও সে সব রূপের বড় একটা প্রভেদ থাকে না। ডিম ফুটে প্রথম যে পোকা বেরোয় সে প্রায় তার শেষ পতঙ্গ অবস্থার রূপ নিয়েই বেরোয়। তখন কেবল তার পাখা থাকে না, উড়তে পারে না, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। তারপর খোলস বদলে যে রূপ ধরে সেটা আগেরই রূপ, কেবল তাতে ক্ষুদ্র রকমের অকর্ম্মণ্য পাখা গজায়।



তারপর আবার খোলস বদ্‌লে পূর্ণ পাখাযুক্ত শেষ রূপ পায়। সুতরাং ফড়িংদের আংশিক রূপান্তর হয়।

পতঙ্গদের এই রূপান্তর অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। পতঙ্গদের এই চারিটা অবস্থা বা জন্ম, তাই পতঙ্গ "চতুর্জ" বা চারি-জন্মা।

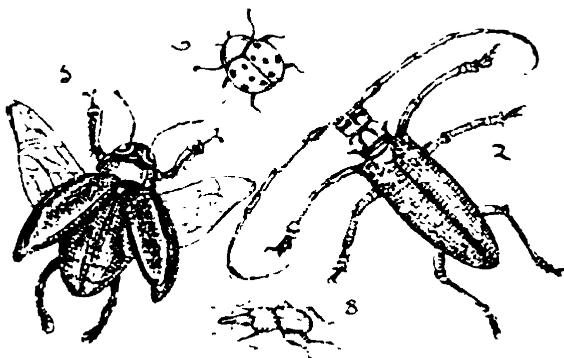
নর্দ্দমায় বা বিষ্ঠায় যে ছোট ছোট কৃমির মত পোকা কিল বিল কচ্ছে, সে যে মাছি হয়ে উড়বে, অথবা তোমার কুমড়ো গাছে যে শুঁয়ো পোকাটা পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে, সে যে একটা সুন্দর প্রজাপতি হবে, তা কি তার চেহারা দেখে বুঝতে পার? যত রকমের শুঁয়ো পোকা দেখতে পাও, সকলেই প্রজাপতি হবে।

তোমরা অনেক সময়ে দেখেছ যে, যেখানে আম খেয়ে ফেলেছ সেখানে অনেক মাছি বসেছে; তার মধ্যে কোন কোন মাছি খুব ছোট, আর তারই কাছে ঠিক সেই রকমেরই কতকগুলা মাছি, তাদের চেয়ে একটু বড়, বসে আছে। তোমরা মনে করতে পার যে, ঐ ছোট মাছিগুলি বাচ্চা মাছি, বয়স অল্প তাই ছোট। আর একটু বয়স হলে, আর খেয়ে ডাগর ডোগর হলে, বড় মাছিদের মত বড় হয়ে যাবে। তা হবে না। সব পতঙ্গেরই, একবার যার পাখা গজিয়েছে, তার বাড়ের শেষ হয়েছে। সে আর বাড়বে না। ছোট প্রজাপতি আর বড় হয় না, ছোট মাছিটেও আর বড় হয় না। হয় সেটা ভিন্ন জাতের মাছি, না হয় বড়টারই জাতের, কিন্তু বেঁটে। আমাদের মধ্যে যেমন লম্বা মানুষ আর বেঁটে মানুষ দেখতে পাওয়া যায়—এমন কি একই মা বাপের দুই ছেলে, দুই ভাই, একজন লম্বা একজন বেঁটে হয়, জীব জন্তু পোকা মাকড়দেরও সেই রকম হয়।

ষট্‌পদী বা পতঙ্গ ত পৃথিবীতে অসংখ্য রকমের আছে। জলে স্থলে, ঘরে বাইরে, মাঠে ঘাটে, বনে জঙ্গলে, গাছের ফলে ফুলে, পাতার দাঁটায় কাঠে, আস্তাকুঁড়ে আবর্জ্জনায়, মাটির তলায়—এমন কি আমাদের গায়ে—সর্ব্বত্রই ষট্‌পদী পোকা আছে। চোখে দেখা যায় না এমন ছোট, আর আমের মত বড়—এরূপ নানা আকারের, নানা ছাঁদের,

নানা রঙের ষট্‌পদী আছে।

চিন্‌বার ও বুঝবার সুবিধার জন্য এক এক রকমের জিনিষকে এক এক দলে ভাগ করে নিলে কাজটা খুব সহজ হয়। এলোমেলো জিনিষের খোঁজ রাখা বড় কঠিন কাজ। যে কোন বিষয়ই হউক, একটা শৃঙ্খলা থাকলে তার খবর রাখা সহজ হয়। আলোচনার সুবিধার জন্যই জীবদিগকে তাদের রূপগুণ ধরণধারণ বিচার ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। একে বলে শ্রেণী বিভাগ। খুব বড় দলের নাম "শ্রেণী"। শ্রেণীকে আরও রকম রকম দলে ভাগ কল্লে হয় "বর্গ"। বর্গকে আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ কল্লে সে ভাগকে বলে "বংশ"।

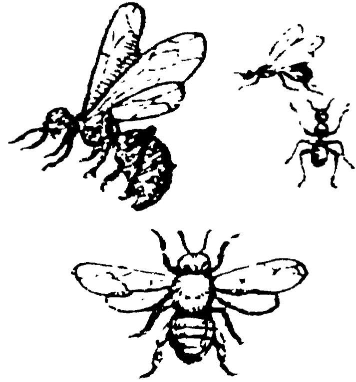


বংশকে আরও ছোট দলে ভাগ কল্লে সে ভাগকে বলে "গণ"। গণকে আবার ভাগ করা হয় "জাতি"তে। জাতিই হচ্ছে শেষ ভাগ। জাতি (species), গণ (genus), বংশ (family), বর্গ (order), শ্রেণী (class) এই রকমে প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

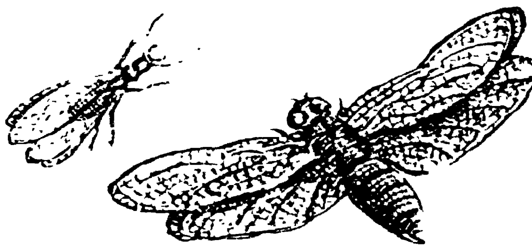


ষট্‌পদী শ্রেণীর যত রকমের পোকা পণ্ডিতদের নজরে পড়েছে তাদের প্রত্যেকের রূপের বর্ণনা, তাদের শ্রেণী, বর্গ, বংশ, গণ, জাতির নাম ঠিক করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা এক ভারতবর্ষ হতেই ত্রিশ হাজার জাতির ষট্‌পদীর খবর নিয়েছেন। আরও কত অজানা আছে। পতঙ্গদের বর্গ বিভাগটা মোটা মুটি এইরূপে করা হয়—

১। যে সব ষট্‌পদীর প্রথম বা উপরের পাখা-যোড়া কাঠের মত খুব দৃঢ় বা শক্ত, আর নীচের পাখা যোড়া খুব পাৎলা, আর পোকা যখন বসে থাকে তখন উপরের শক্ত পাখা দুটো নীচের সূক্ষ্ম পাখা ও কোমল দেহকে ঢেকে রাখে, তাদের বলে "দৃঢ়পত্রী"। উপরের শক্ত পাখা দিয়া উড়তে পারে না, নীচের পাৎলা পাখা দিয়ে ওড়ে। এদের মুখের গড়ন কামড়িয়ে খাবার উপযোগী। এদের পূর্ণ রূপান্তর হয়—যেমন গোবরিয়া পোকা, বিষ্ঠা পোকা, পচা পোকা, গুজরি পোকা, খড়্গ পোকা, কোড়া পোকা, ঘোড়া পোকা, কেরী পোকা, ঢেলে পোকা প্রভৃতি। ইংরাজিতে চলিত কথায় এদের বলে Beetles. আমাদের অনেকে বলেন গুবরে পোকা। কিন্তু বাস্তবিক গুবরে বল্‌তে সেই বিশেষ বংশের পোকাকেই বোঝায়, যারা গোবরে থাকে, গোবর খায়। এদের পাখা শক্ত কাঠের খোলের মত ব'লে, আমরা চলিত কথায় বলতে পারি, কাঠুয়া বা কেঠো পোকা—শুদ্ধ ভাষায় "দৃঢ়পত্রী" বা দৃঢ়পত্রী বর্গের পোকা।



২। যে সব ষট্‌পদীর দু যোড়া বা চারখানা পাখা, পাখায় হাত দিলে হাতে ধূলা বা রেণুর মত আঁইশ লেগে যায়, তাদের দলের বা বর্গের নাম "রেণুপত্রী"। এদের মুখের গড়ন রস চুষে বা শুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়, যেমন প্রজাপতি।

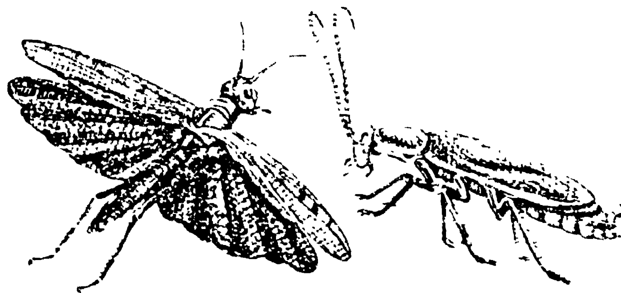


৩। যে সব পতঙ্গের খুব পাৎলা বা ঝিল্লিবৎ স্বচ্ছ পাখা থাকে, আর নীচের যোড়া প্রায়ই ছোট হয়, পাখায় শির বা শিরা থাকে কিন্তু অল্প, তাদের বলে "ঝিল্লিপত্রী" বা "সূক্ষ্মপত্রী"। কিন্তু এ নাম সঙ্গত নয়, কারণ সব জাতির পতঙ্গেরই উড়বার পাখা পাৎলা বা ঝিল্লির মতই হয়। এই বর্গের পোকা উড়বার সময়ে প্রতি পাশের উপরের আর নীচের পাখা, সন্ধি বা কব্জায় আটকে এক হয়ে যায়। এই জন্য এই বর্গের পতঙ্গকে "সন্ধিপত্রী" বলাই

সঙ্গত। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় "ঝিল্লিপত্রী"ই চলিত হয়ে গিয়েছে। যেমন, ভ্রমর, বোলতা, ভীমরুল, কুমুরে পোকা, কাচ পোকা, মৌমাছি, পিঁপড়ে। এদের মুখের গড়ন কেটে খাবার আর চুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়।

৪। যে সব পতঙ্গের মোটে দু'খানা অর্থাৎ শুধু উপরের পাখা যোড়াই থাকে আর নীচের পাখা দু'টো লুপ্ত হয়ে গিয়ে ছোট্ট দুটি সরু দাঁড়ের মত হ'য়ে থাকে, তাদের বলে "দ্বিপত্রী"—যেমন মশা, মাছি। এদের মুখের গড়ন শুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়।

৫। যে সব পতঙ্গের দুই যোড়া পাখাই সমান বড় আর খুব পাৎলা ও স্বচ্ছ হয়, আর তাতে অনেক শিরা, সব এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মেশান যে দেখতে সূতোর বোনা জালের মত দেখায়, তাদের বলে "জালপত্রী"। এদের কতকগুলির মুখের গড়ন শুধু কেটে খাবার উপযোগী, তারা পোকা ধ'রে খায়, আর তাদের আংশিক রূপান্তর হয়, যেমন ঝিল্লি ফড়িং। আবার কতকগুলি আছে, তাদের মুখের গড়ন চুষে বা কেটে খাবার উপযোগী, আর তাদের পূর্ণ রূপান্তর হয়, যেমন উই, আর লেজা ফড়িং। কিন্তু সকলেরই পাখা সূক্ষ্ম জালের মত। ঝিল্লি ফড়িং-এর পূর্ণ রূপান্তর হয় না বলে কোন কোন পণ্ডিত তাদের পরের বর্গে ফেলেন।



৬। যে সব পতঙ্গের উপরের পাখা যোড়া পাৎলা চামড়ার মত চিম্‌সে হয় আর নীচের পাখা যোড়া খুব পাৎলা বা সূক্ষ্ম হয়, পোকাটা বসলে নীচের পাখা যোড়া তালপাতার ভাঁজের মত, সোজা লম্বালম্বি পিঠের উপর ভাঁজ হয়ে উপরের পাখায় ঢাকা পড়ে, তাদের বলে "সরলপত্রী" বা "ঋজুপত্রী"। যেমন পঙ্গ (পাল), গাং ফড়িং ঘেসে ফড়িং, পাতা ফড়িং, উচ্চিংড়ে, আরসুল্লা। এদের মুখ কেটে খাবার মত করে গড়া। এদের আংশিক রূপান্তর হয়।

৭। যে সব ষড়পদীর দুযোড়া পাখা তাকে, আর পাখা এমনভাবে গড়া যে দেখতে আধখানা পাখার মত দেখায় তাদের বলে "অর্দ্ধপত্রী"। এঁদের কারু কারু পাখা থাকেও না। কিন্তু সকলেরই মুখে সরু লম্বা শক্ত চঞ্চু থাকে, খাবার সময়ে খাদ্য সামগ্রীতে সেটা ফুটিয়ে দিয়ে রস চুষে খায়, অন্য সময়ে সেই চঞ্চু বুকের উপর ভাঁজ করে রাখে। এই

রকম চঞ্চু থাকাতে, এদের "চঞ্চুমুখী" বলা যায়। যেমন উকুন, ঝিঁঝি পোকা, যাব পোকা, ছার পোকা, (বিছানার ছার পোকা বা ওড়স্, আর গাছের ছার পোকা), ইত্যাদি। এদের আংশিক রূপান্তর হয়।

এই হল পতঙ্গদের বর্গ বিভাগ। এই ক'টা কথা যদি বেশ করে মনে রাখতে পার, তবে অনেক ষট্পদী বা পতঙ্গ চিনতে পারবে, কোন্টা কোন্ বর্গের বুঝতে পারবে। সব পোকাই যে সব সময়ে সহজে চট্ করে চিনে ফেলতে পারবে তা নয়, তবে অনেকগুলো চিনতে পারবে। অন্ততঃ কেঠো পোকা বা beetle চিন্তে দেরি হবে না, আর মাছিকে মৌমাছির দলে ফেল্বে না, প্রজাপতিকে ফড়িং বল্বে না। আর এঁটুলি পোকাকে ছারপোকার সামিল করবে না। এই সব কথা বেশ মনে রাখ, তারপর আসছে বারে তোমার সেই যে ভারতোলা পালোয়ান পোকাটা পাঠিয়েছ (আষাঢ়ের "সন্দেশ") তার কুলের খবর তোমায় বলব।*

* ছবির নীচে (×২), (+ ৩), ইত্যাদি অঙ্কগুলির অর্থ, পতঙ্গটাকে লম্বায় চওড়ায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

সন্দেশ। শ্রাবণ ১৩২৬।পৃ ৯৮-১০৩
ভাদ্র ১৩২৬।পৃ. ১৩৪-১৪১

মাল পোকা

ভাই সন্দেশ,

তোমরা সেদিন যে পোকাটা ধরেছিলে, আর শ্রাবণের "সন্দেশে" যার গায়ের আশ্চর্য্য জোরের কথা লিখেছ, তার বাঙ্গলা নাম কি, আমি তা জানি না। পোকা মাকড়ের নাম বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে। চাষক্ষেতের ফসল, বাগানের গাছপালা ফল, আর ভাঁড়ার ঘর বা গুদাম ঘরের চাল ডালের যারা ক্ষতি করে, অথবা যারা আমাদের কানের কাছে ভন ভন ক'রে গায়ে ব'সে বা কামড়িয়ে জ্বালাতন করে, যাদের পরিচয় সর্ব্বদাই রাখ্‌তে হয়, এমনধারা কয়েক রকমের কীটপতঙ্গেরই নাম দেওয়া হয়েছে। সে নামও আবার বাঙ্গলা দেশের সব জায়গায় এক নয়।

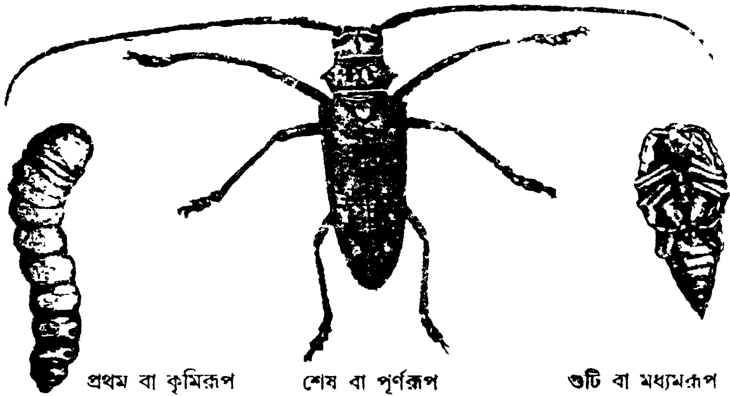
তোমার এই পোকাটা অনেককে দেখিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এর নাম জানেন না। কেউ কেউ বললেন, ওটা "মালপোকা"। যখন নামই নাই তখন চিন্‌বার জন্য একটা নামকরণ করে নিলেই হল। খুব ভারি মাল তুলতে পারে, অথবা মাল অর্থাৎ মল্ল বা কুস্তীগিরের মত গায়ে জোর ব'লে, এর নাম 'মাল পোকা" রাখা অসঙ্গত হবে না।

তোমার এই মাল পোকাটার ছ'টা পা আছে। গায়ে, মাথা বুক পেট, এই তিনটা পৃথক ভাগ আছে। সুতরাং এটা ষট্‌পদী বা পতঙ্গশ্রেণীর। এর গায়ের উপর সমস্ত পেট যুড়ে শক্ত খোলের মত এক যোড়া পাখা আছে। তার নীচে আর এক যোড়া খুব পাৎলা, স্বচ্ছ বড় পাখা আছে। সুতরাং এটা একটা কেঠো পোকা (beetle) "দৃঢ়পত্রী" বর্গের অন্তর্গত।

কেঠো পোকা নানা রকমের হয়। কোন কোন জাতের কেঠো আকারে খুব ছোট হয়, কোন কোন জাতের আবার বেশ বড়ও হয়। কোন কোনটার স্পর্শনী বা শুঙ্গ বা গোঁফযোড়া খুব লম্বা হয়, কোন কোনটার গোঁফ খুব ছোট হয়। সকলের গোঁফই গ্রন্থিল বা গাঁইটযুক্ত হয়। কোন কোন জাতের কেঠো গাছের কচি পাতা ডাঁটা ফল খায়, কোন কোনটা গাছের শক্ত কাঠ খায় ও কাছে ছিদ্র ক'রে তাতেই কৃমিজীবন কাটায়। কোন কোনটা গোবর বিষ্ঠা খায় আর তাতেই বাস করে। কোন কোনটা বীজে শস্যে ফুটে ক'রে শস্য খায় ও তারই ভিতর কৃমিজীবন কাটায়। কোন কোনটা পচা মাংস খায়। কেঠোদের শুঙ্গ বা গোঁফের গড়ন, চরণ বা পদতলের গড়ন, ও খাদ্যাখাদ্যের তফাৎ অনুসারে বংশ বিভাগ করা হয়।

মালপোকার গোঁফজোড়া খুব লম্বা, গা ছাড়িয়ে অনেক দূর যায়। এত লম্বা গোঁফ আর কোন বংশের কেঠো পোকার হয় না। লম্বা গোঁফ দেখলেই এদের চেনা যায়। লম্বা গোঁফই হচ্চে এই বংশের কেঠোর বিশেষত। তাই এই বংশের ইংরাজি নাম হয়েছে longicorn অর্থাৎ "লম্বশৃঙ্গ"। আসলে, ও দুটো কিন্তু শিং নয়। ও দুটো ওর স্পর্শ করবার অঙ্গ, স্পর্শনী—ওকে শুঙ্গ বলে। আমরা বলব "দীর্ঘশুঙ্গী" অর্থাৎ "লম্বা গুঁফো"। এদের গোঁফে এগারটা করে গাঁইট বা পাব্ থাকে। এদের পায়ের চবণে, অর্থাৎ উরু আর জংঘার পরের অংশটায়, তিনটা করে পাব্ থাকে। এর মাথাটা বেশ বড়। তার দু'পাশে বড় বড় দুটো চোখ আছে, সে চোখ শুঙ্গের বা গোঁফের গোড়াটাকে আংটির মত ঘিরে তাকে। এর চোখ অন্যান্য পতঙ্গের চোখের মত অনেক চোখের সমষ্টি। অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি এর চোখ দেখ, তবে মৌচাকের কোষ বা কোটরের মত অনেকগুলা ছয়-কোণা চোখ একত্রে রয়েছে দেখ্‌লে পাবে। অনেক চোখ একত্রে জোড়া এইরকম চোখকে "সংশ্লিষ্ট চক্ষু" বলে।

মাল পোকার তিন অবস্থা



এই বংশের পোকা দু'দল আছে। এক দলের পোকার মুখাগ্র সোজা, মাথার সামনের দিকেই থাকে। আর একদলের মুখটা বেঁকে মাথার নীচে চলে গিয়েছে, তাই উপর দিক থেকে মুখটা দেখতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় যেন মুখটা কাটা, বা মাথাটা হঠাৎ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। তোমার এই মালপোকাটা এই দলের। দুই দলের সকলেরই মুখে সাঁড়াশির মত বাঁকা শক্ত ছুঁচল ঠোঁট বা দংশনোষ্ঠ থাকে। এই শক্ত ধারাল ঠোঁট দিয়ে এরা খাদ্যসামগ্রী কেটে বা কুরে নিয়ে খায়। তোমার এ পোকাটাকে যদি চিৎ করে ফেল তবে ওর মুখ আর দংশনোষ্ঠ দেখতে পাবে। যে দলের মুখাগ্র সোজা থাকে

াদের দংশনোষ্ঠ সকল দিক থেকেই দেখা যায়। এই দলের কোন কোন মালপোকার শক্ত ঠোঁট খুব লম্বা আর দাঁতাল হয়। এর বুকের প্রথম অংশটা, যাকে পুরোবক্ষ বলে, সেটা বেশ বড়, আর উপরের ত্বক্ বা খোলাটা খুব শক্ত, আর তাতে উঁচু উঁচু ছুচল ঢিবলি আছে।

এর গোঁফ ধরে ঝোলালে বা টান্‌লে এক রকম কির্ কির্ বা চিঁচি শব্দ হয়। এ শব্দ পোকার মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোন পোকাই আমাদের মত মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারে না, মুখ দিয়ে নিশ্বাস টান্‌লে বা ফেল্‌তে পারে না। পোকারা কি ক'রে নিশ্বাস নেয় সে কথা আগেই ব'লেছি (শ্রাবণের "সন্দেশ")।

তবে মালপোকারা শব্দ করে কি ক'রে? বুকের যে প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগ, পুরোবক্ষ আর মধ্যবক্ষ, এই দুটোতে কিনারায় কিনারায় ঘষা লেগে এই শব্দ বেরোয়। ... নড়লে বা উঁচু নীচু করলে বুকের প্রথম খোলাটার নীচের ধার মাঝের খোলাটার ...র ধারের সঙ্গে ঘষা লেগে তা হ'তে শব্দ হয়। তোমরা নখে নখে ঘ'ষে যেমন শব্দ ... এই পোকার ঐ কির্-কির্ বা চিঁচি শব্দ সেই রকমে উৎপন্ন হয়।

পণ্ডিতেরা শুদ্ধ ভাষায় এই বংশের নাম রেখেছেন "সেরাম্বিসিডি"। পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষায় এই নাম চলে গিয়েছে।

সকল জাতের লম্বাশুঁড়ো কেঠো পোকার স্বভাব প্রকৃতি, জন্ম প্রকরণ বা রূপান্তর প্রায় একই রকমের। এরা সকলেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদ ভোজী। এদের অনেক জাতি আছে। কোন কোন জাতি খুব ছোট হয়, তারা ছোট ছোট গাছের ছাল ও কচি ডাঁটা বা নরম কাঠ খেয়ে বাঁচে। কোন কোন জাতি খুব বড় বড় হয়, তারা আম বাবলা, শাল, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছের শক্ত কাঠ খেয়ে বাঁচে। এরা বনে জঙ্গলেই বেশি থাকে, কৃষকের চাষক্ষেতের বড় একটা অনিষ্ট করে না। কখন কখন ফলবাগানের কমলা লেবুর গাছ, আম গাছ, ডালিম গাছ, তুঁত গাছের ডাল ফুটো করে ঝাঝরা করে দেয়।

এই পোকা যখন পাখা ধরে তখন ডিম পাড়বার জন্য সুবিধামত গাছের ডাল খুঁজে বেড়ায়। এক এক জাতির কেঠো এক এক জাতের গাছ পছন্দ করে। যে-সে গাছে ডিম পাড়ে না। গাছের শুক্‌নো ছালের ফাটলে বা বাঁশে ডিম পাড়ে। এক জায়গায় সব ডিম পাড়ে না। একটা পোকা এক গাছে নানা জায়গায় ডিম পাড়ে, অথবা এক গাছে কতকগুলি অন্য গাছে কতকগুলি, এইভাবে ডিম পাড়ে। তোমার ওই জাতের কেঠোর ডিম মটরের মত বড় হয়, ডিমের আকারটা হাঁসের ডিমের মত লম্বাটে। সে ডিম শক্ত নয়, নরম। কিছু দিন পরে সে ডিম ফুটে শুঁয়ো পোকার মত কৃমি বাহির হয়। সে কৃমির গায়ে শুঁয়ো বা রোম হয় না। তাব পা ও থাকে না। মাথাটা ছোট আর শক্ত হয় আর মুখে শাঁড়াসির মত বাঁকা শক্ত আর ধারাল ঠোঁট বা দংশনোষ্ঠ থাকে। সেই ঠোঁট দাঁতের কাজ করে, তা দিয়ে কৃমিটা কাঠ কুরে কুরে খেতে থাকে। বুকটা ফোলা,

উদরের অংশটা লম্বা আর আগাগোড়া সমান মোটা, গা খুব কোমল, রং হল্‌দে বা সাদা। কৃমিরা চলে ফিরে বেড়াতে পারে না। কেবল সম্মুখ দিকে কাঠ খেয়ে খেয়ে সুড়ঙ্গ করে, আর গায়ের চাড় দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে এগুতে থাকে। এইরূপে গাছের ডালের কাঠে অনেক লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ করে ফেলে। কৃমির নরম গা কাঠে ঘষে ঘা হয়ে যেতে পারে ব'লে, তার প্রত্যেক খণ্ড বা পর্ব্বের উপরের চামড়া শক্ত ঢালের মত হয়ে শরীর রক্ষা করে। ছোট কৃমি খেয়ে খেয়ে যখন একটু বড় হয় তখন তার গায়ের চামড়ায় খুব টান পড়ে, তখন কৃমি খোলস বদলায়। এই রূপে কয়েকবার খোলস বদলাবার পর, তার কৃমি অবস্থার শেষ হয়ে আসে। তখন সে কাঠের ভিতরের সুড়ঙ্গটাকে কেটে কেটে গাছের ছাল পর্য্যন্ত নিয়ে আসে। তার পর সেই সুড়ঙ্গের মাথার আর লেজের দিকটার পথ বন্ধ করে দেয়। আর কাঠের গুঁড়ো কুচি আর নিজের লালা আর বিষ্ঠা দিয়ে গায়ের চারিদিকে একটা কোষ বা খোল করে নিজেকে তার মধ্যে বন্দী করে ফেলে। সেই কোষের মধ্যে জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল পড়ে তাকে। এই গুটি বা কোষ অবস্থায় তিন-চার মাস বা তার বেশিও কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ রূপের সমস্ত অবয়ব, ছ'টা পা, পাখা, লম্বা গোঁফ প্রভৃতি তৈরি হয়। শেষ পতঙ্গ রূপ পূর্ণ হলে পর সেই কোষটা কেটে কেঠো পোকা বেরিয়ে আসে। এদের জীবনে আহারের কার্য্যটা কৃমি অবস্থাতেই ভাল রকম হয়। এই অবস্থাতেই গাছের ক্ষতি করে। পতঙ্গ-রূপ পেলে পর আর গাছ কেটে সুড়ঙ্গ করে না।

পতঙ্গ অবস্থায় এরা বেশি দিন বাঁচে না। কেবল কোথায় কি ভাবে ডিম পাড়লে তার সন্তানেরা ভাল খেতে পাবে আর নিরাপদে থাকবে, সেই সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সুযোগ বুঝে সুবিধামত জায়গায় ডিম পাড়া হয়ে গেলে পর অল্প কালেই পতঙ্গটা মরে যায়। তার কপালে নিজের সন্তানদের চোখে দেখাও ঘটে না, লালন পালন ত দূরের কথা।

কেঠো পোকাদের শক্ত পাখাযোড়া উড়বার সময়ে কাজে লাগে না। তারা ওড়ে নীচের পাৎলা পাখা নেড়ে। উড়বার সময়ে উপরের খোলের মত পাখাযোড়া পিঠ থেকে একটু আলগা করে তুলে ধ'রে নীচের পাৎলা পাখা দুটো বের ক'রে মেলে দেয়, আর সেই দুটো নেড়ে উড়ে যায়। উপরের পাখা যোড়া নিশ্চল থাকে। মালপোকার পাগুলি বেশ বড় বড় আর জোরাল। এরা হেঁটে চলতে বেশ পারে। অল্প দূর যেতে হলে কি গাছের ডালে চড়তে হলে পা দিয়ে চলে। সহজে উড়তে চায় না। কিন্তু দরকার হলে উড়ে যায়। ইতি—

তোমার মেজ দাদামশাই

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশ। আশ্বিন ১৩২৬। পৃ. ১৬৬-১৭১

আরসলা

ভাই সন্দেশ,

কাল আমার একটা পুরাণ কাঠের সিন্দুক খুলেছিলাম। তাতে কতকগুলা পুরাণ কাগজপত্র ও ছেঁড়া কাপড় চোপড় ছিল। সিন্দুকটা খুলতেই দেখলাম ছোট-বড়, পাখাযুক্ত, পাখাহীন, সাদাটে, কালোটে, নানা জাতের নানা রকমের আরসলা আর তাদের ডিমে সিন্দুকটা ভরে রয়েছে। তাড়াতাড়ি যে কয়টাকে মারতে পারলাম সে কয়টাকে একটা কাচের বোতলে পুরে ফেল্লাম।

আরসলাকে আমাদের দেশের কোন কোন জেলায় তেলাপোকা তেলাচোরা বা তেলচটাও বলে। সংস্কৃতে তৈলপায়ী, তৈলচৌরিকা এবং পরোষ্ণী বলে। বোধ হয় তেলপায়ী শব্দ থেকে তেলপক বা তেলাপোকা, আর তৈলচৌরিকা হইতে তেলাচোরা হয়েছে। আর বোধ হয় পরোষ্ণী শব্দ ক্রমে বিগ্‌ড়ে গিয়ে অরোষ্ণী পরে অরষড়া বা আরসলা হয়েছে।

আমাদের ঘরের মধ্যে শেল্‌ফের বই-এর ফাঁকে, ভাঁড়ার ঘরের চাল ডাল মসলার হাঁড়িতে, চিনি আর ময়দার বস্তার ভিতরে, অন্ধকার ঘরের দরজার আড়ালে সাধারণতঃ বড় বড় আরসলাই দেখতে পাই। তা ছাড়া এর চেয়ে ছোট রকমের তিন চার জাতের ঘোরো আরসলা খোঁজ কল্লে, ঘরের ভিতরে পাওয়া যায়। মাঠে ঘাটে, গাছ তলায়, গাছের ডালে, ঝোপ ঝাড়ে, লতাপাতার মধ্যে, বাইরের মেঠো আরসলাও অনেক জাতির দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সকল দেশেই আরসলা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আরসলা। কোন কোন জাতির আরসলা খুব বড় হয়, কোন কোন জাতির খুব ছোট ছোট হয়। কোন কোন জাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পাখা গজায়। কোন কোন জাতির কেবল পুরুষদেরই পাখা গজায়, স্ত্রীদের পাখা হয় না। আবার কোন কোন জাতির স্ত্রী পুরুষ কাহারও মোটেই পাখা হয় না। এক ভারতবর্ষেই ১২৩ জাতির আরসলার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় আরসলাকে ব্লাটা (Blattadae) বংশ বলে। এই বংশের ভিন্ন ভিন্ন দল বা "গণ" আছে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। আবার প্রত্যেক "গণে" অনেক "জাতি" আছে, তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। কোন একটা প্রাণীকে চেনাতে হলে তার গণ-নাম আর জাতি-নাম দুই বলতে হয়। ইংরাজিতে সাধারণ

চলিত কথায় সব আরসলাকে (cockroach) কক্‌রোচ বলে, আমরা যেমন সকল জাতির আরসলাকেই আরসলা বলি।

আমাদের ঘরে যে বড় বড় রকমের, প্রায় দুই ইঞ্চ লম্বা, পাখাওয়ালা গাঢ় খয়েরী রঙ্গের আরসলা দেখি তার বৈজ্ঞানিক নাম পেরিপ্লানাটা আমেরিকানা (Periplanata Americana) প্রথমটা গণের নাম, দ্বিতীয়টা জাতির নাম। পূর্ব্বে ইউরোপে এই জাতির আরসলা ছিল না। আমেরিকা দেশ হতে বাণিজ্য জাহাজে করে মালপত্রের বস্তা বাক্সের সঙ্গে এই আরসলা ইউরোপে গিয়ে পড়েছিল। আজ কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়িয়েছে। এই রকম এক দেশের অনেক জীবজন্তু গাছপালা মানুষের সাহায্যে অন্য দেশে হাজির হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করে। যে সব দেশে পূর্ব্বে ইন্দুর, খরগোস, ছাগল, ভেড়া, গরু ঘোড়া ছিল না, আজ কাল সে সব দেশে এই সব জন্তু অনেক হয়েছে। নানা প্রকারের পোকা মাকড়ের ত কথাই নাই। অনেক বিদেশী গাছ্‌পালা এই রকমে আমাদের দেশে আর আমাদের দেশের গাছ্‌পালা বিদেশে গিয়ে পড়েছে।

পূর্ব্বে যে বড় আরসলার কথা বললাম, তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট, প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা, ঐ রকমের ও ঐ গণের অন্য এক জাতির আরসলাও আমাদের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাদের বলে পেরিপ্লানাটা অষ্ট্রেলেসি (Periplanata australasiae)। এই দুই জাতিরই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বেশ বড় বড় পাখা হয়।

এদের চেয়েও ছোট অন্য গণের এক রকম আরসলা আমাদের ঘরে দেখা যায়, তাদের স্ত্রীদের পাখা হয় না, পুরুষদেরই পাখা হয়। সে পাখাও ছোট, পেটের সমস্তটা ঢাকে না, শরীরের প্রায় সিকি অংশ বেরিয়ে থাকে। এগুলি প্রায় এক ইঞ্চ লম্বা হয়। বিলাতে এই জাতির আরসলা ঘরে ঘরে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম স্টাইলোপাইগা ওরিয়ান্টালিস্ (Stylopyga orientalis)। পূর্ব্বে এই জাতির আরসলা বিলাতে ছিল না। সেখানকার লোকের বিশ্বাস পূর্ব্বদেশ অর্থাৎ এশিয়া থেকে, এই আরসলা সে দেশে গিয়েছে। ইংরাজিতে চলিত কথায় ইহাকে (Black bettle) ব্ল্যাকবীট্‌ল বলে। কিন্তু এরা black বা কালও নয়, গাঢ় বাদামী রঙ্গের, আর bettle বা দৃঢ়পত্রীও নয়। যে সব পতঙ্গের উপরের পাখা খুব শক্ত খোলের মত তাদেরই bettle বলে। আরসলার পাখা শক্ত খোলের মত নয়। সব আরসলাই ফড়িং-এর বর্গের পতঙ্গ। এই বর্গকে ঋজুপত্রী বলে।

আমার ঘরে এই তিন জাতির আরসলা ত আছেই, তা ছাড়া আর এক জাতির বড় আরসলাও আছে তাদের স্ত্রী পুরুষ কারও পাখা হয় না। এদের গায়ের রং কাল খয়েরী তাতে হল্‌দে রঙের চিত্র আছে। এরা এক ইঞ্চির উপর লম্বা হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম স্টাইলোপাইগা রম্বিফোলিয়া (Stylopyga rhombifolia)।

খুব ক্ষুদে ক্ষুদে একজাতির আরসলা আমার সেই সিন্দুক থেকে, আর বাড়ির

হাঁড়ির ভিতর থেকে আর কাপড়ের বাক্স থেকে, বের করেছি। এরা পৌণে এক ইঞ্চ লম্বা। এদের স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পাখা হয়, রং বাদামী, মাথার উপরে ঘাড়ের চাকতিটায় দু'টা কাল দাগ থাকে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম ফাইলোড্রোমিয়া জারমানিকা (Phyllodromia Germanica)।

ইংলণ্ডে আগে এই জাতির আরসলা ছিল না। সে দেশের লোকের বিশ্বাস, এরা জার্ম্মানি দেশ হতে সেখানে গিয়াছে, তাই তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'জার্ম্মান আরসলা'। অষ্ট্রিয়ার লোকের বিশ্বাস যে রুষিয়া দেশ থেকে তাঁদের দেশে গিয়েছে, তাই তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'রুশিয়ার আরসলা'। আজ কাল এরা প্রায় সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গণেরই আর এক জাতির পাখাযুক্ত আরসলা আমাদের দেশে আছে, তারা মাঠে ঘাটে, গাছতলায় পাতার নীচে থাকে। গাছের পাতায় অথবা ছালের উপর ডিম পাড়ে। তাদের পাখাহীন বাচ্চাগুলোকে মাটির উপর চলা ফেরা করতে দেখা যায়।

অনেক আরসলা দেখতে সুন্দর। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সোয়া ইঞ্চ লম্বা এক রকম আরসলা আছে তাদের দেহটা প্রায় গোল, গায়ের রং কাল কুচ্‌কুচে, পাখার উপর ৭টা হল্‌দে ফোঁটা থাকে. বেশ সুন্দর দেখায়।

আরসলার গায়ে ভারি দুর্গন্ধ। তার লাদিতে, তার ডিমে, সবটাতেই দুর্গন্ধ— যে জিনিসের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তাতেও গন্ধ হয়। ধরলে মুখ থেকে এক রকম রস বেরোয় তাকে আরও বেশি দুর্গন্ধ থাকে।

আরসলার গাটা বেশ তেলা। আরসলা আপন শরীরটাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে। সর্ব্বদা ধূলা ময়লা লাগে, তাই প্রাযই শুঁয়াটাকে পরিষ্কার করে। শুঁয়াকে বাঁকিয়ে মুখের ঠোঁটে চেপে ধরে, তারপর মুখের ভিতর দিয়ে টেনে নেয়। তাতেই শুঁয়ার যত ধূলা ময়লা ঠোঁটে লেগে গিয়ে শুঁয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। পাগুলোও সর্ব্বদা পরিষ্কার করে।

আরসলারা সকলেই রাত্রিচর। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে, রাত্রি হ'লে অন্ধকারে খাবার খুঁজতে বেরোয়। সব জাতির আরসলাই পচা শাক পাতা, নানা প্রকার মিষ্ট রস, ছোট ছোট মরা পোকা প্রভৃতি খায়। আমাদের ঘরের বড় আরসলাগুলো না খায় এমন জিনিস নাই। ভাত, ডাল, রাঁধা তরকারী, মেঠাই সন্দেশ, ক্ষীর ছানা ত খায়ই, তা ছাড়া চাল ডাল ময়দা চিনি তেল ঘি খায়। মসলার হাঁড়িতে ঢুকে মসলা খায়। বাজারে দোকানে দারচিনির বস্তায় অনেক আরসলা থাকে। দারচিনি কিনলে তার মধ্যে আরসলার পাখা, ঠ্যাং, লাদি, ডিম সবই পাওয়া যায়। চামড়া-বাঁধান কাপড়-বাঁধান সুন্দর রং-করা নূতন বইগুলির মলাট কুরে কুরে খেয়ে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়ি ক'রে দেয়। চামড়ার নূতন জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি ঐ রকমে উপর উপর খেয়ে দেয়। আমি আমার তক্তপোষের তলায় আরসলাকে ছারপোকার ডিম, খোসা, এমন কি জীয়ন্ত ছারপোকা খেতে দেখেছি। এরা নিজেদের ডিমের খোলা খায়. অন্য মরা আরসলাও খায়। তা ছাড়া ছোট্ট ছোট্ট পোকাও খায়। রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে ঘুমন্ত মানুষের হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের

আগার চামড়া খায়। কেবল বড় জাতির আরসলাই এই রকমে মানুষকে কামড়ায়। এই পাখাওয়ালা বড় জাতির আরসলাকে, গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষা হবার সম্ভাবনা হয়, তখন দলে দলে ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়।

বাজার থেকে সোহাগা কিনে তার সঙ্গে দ্বিগুণ পরিমাণ ঝোলা গুড় মিশিয়ে, কাগজ বা পাতায় মাখিয়ে, যেখানে আরসলা থাকে সেই জায়গায় রেখে দিলে, আরসলা গুড়ের লোভে খেয়ে মরে। সোহাগা এদের পক্ষে বিষ।

আমরা অনেক সময়ে বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে বা ঝাঁটার বাড়ি মেরে, দলে দলে আরসলা মেরে ঘর আরসলা শূন্য করেছি। মনে করেছি যে আরসলার উৎপাত হতে রক্ষা পেলাম। মাস দু-তিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটালাম, তারপর আবার ঘর আরসলায় ভরে গেল। কেন এমন হয়? আবার এরা কোথা থেকে আসে? বিষ দিয়ে আর ঝাঁটার বাড়ি মেরে আরসলাই মারি, তাদের ডিম ত ঘরের যেখানে সেখানে থেকে যায়, সেগুলি ত নষ্ট হয় না। সেই সব ডিম ফুটে আবার আরসলা বেরোয়, তাতেই আবার ঘর ভরে যায়।

মানুষ ছাড়া আরসলার আরও অনেক শত্রু আছে। কুকুর, বিড়াল, বানর, ইন্দুর, ছুঁচো, আরসলা ধরে খায়। হাঁস ও মুরগী আরসলা খায়। অনেক টিকটিকি ও গিরগিটি, বড় বড় মাকড়সা ও কাকড়া বিছে তেঁতুলে বিছে প্রভৃতি, আরসলা খায়। অনেক জাতীয় কাঁচপোকা আরসলার গায়ে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান করে বাচ্চাদের জন্য নিজেদের বাসায় পূরে রাখে। ঐ রকমের অনেক জাতের পোকা আরসলার গায়ে হুল ফুটিয়ে তার ভিতর ডিম পেড়ে দেয়, সেই ডিম ফুটে যে ছোট্ট ছোট্ট শুয়াপোকা (maggots) বাহির হয় তারা আরসলার গায়ের রস ও মাংস খেয়ে বড় হয়, আর আরসলা মরে যায়। কোন কোন জাতির পোকা আরসলার ডিমের ভিতর হুল ফুটিয়ে তার মধ্যে ডিম পেড়ে দেয়, সেই সব ডিম ফুটে যে শুঁয়াপোকা বেরোয় তারা সেই ডিমের সার ভাগ খেয়ে ফেলে। সে ডিম হতে আর আরসলার বাচ্চা হয় না। কিন্তু এত শত্রু থাকতেও আরসলার বংশ ধ্বংস হয় না।

আরসলার ডিম তোমরা দেখেছ? সে ডিম দেখিতে বরবটীর বীজের মত, অথবা ছোট্ট মনিব্যাগের মত। অনেক সময়ে দেখা যায় যে আরসলার পিছন দিকে অর্দ্ধেকটা ডিম বের হয়ে আছে, আরসলাটা সেই ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিম পেটের ভিতর হতে একেবারে শীঘ্র বাহির হয় না, সমস্ত ডিমটা বেরোতে সাত দিন থেকে পনের দিন সময় লাগে। ডিমটা বেরিয়ে আসলে পর আরসলাটা বাক্স পেটরা আলমারির গায়ে, কপাটের পিছনে, তক্তপোষের তলায় বা বই-এর গায়ে, যেখানে বেশি নাড়া চাড়া হবার সম্ভাবনা নাই, সেই সব জায়গায় আটকিয়ে দেয়। সে সময়ে ডিমের গায়ে আঠা থাকে, যেখানে ডিম লাগে সেখানে আটকে থাকে। আরসলা এক একবারে এই রকম এক একটি ডিম পাড়ে।

এই যে শক্ত খোলাযুক্ত বরবটির মত ডিম, সেটা প্রকৃত ডিম নয়, সেটা ডিমের কৌটা। এই শক্ত কৌটার মধ্যে জাতি ভেদে দুই সারিতে ১৬টা হইতে ৩২টা ছোট্ট লম্বা লম্বা ডিম সাজান থাকে। আমি পাখাওয়ালা বড় আরসলার অনেক ডিমের কৌটা ভেঙ্গে দেখেছি। তাহার অনেকগুলিতেই ১৬টা ডিম পেয়েছি। ডিমের কৌটায় মটরশুঁটির মত দুটা ডালা বা খোল আছে। প্রত্যেক ডালায় ৮টা করিয়া, দুই সারিতে ১৬টা ডিম থাকে। দু-একটা কৌটায় প্রতি সারিতে ১২টা ডিমও পেয়েছি। বড় জাতির আরসলার ডিমের কৌটা আধ ইঞ্চ অপেক্ষা বড় হয়, ছোট জাতির ডিমের কৌটা আরও ছোট হয়।

কত দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়? আমাদের ঘরের বড় জাতির পাখাওয়ালা আরসলা ২রা জুলাই ডিম পেড়েছিল, ২৭শে জুলাই কৌটা ফেটে খুদে খুদে আরসলার বাচ্চা বেরল, তারপর নয় মাস পরে এপ্রিল মাসে সেই সব বাচ্চা বেশ বড় হল। তখনও অর্দ্ধপূর্ণ অবস্থা। তারপর আরও তিনমাস পরে পূর্ণ বয়স্ক ও পাখাধারী হয়েছিল। এই জাতির ডিম ফুটে পূর্ণ অবস্থা পেতে এক বৎসর সময় লাগে। কোন কোন জাতি তিন চারি বৎসরে, কোন জাতি ছয় মাসেই পূর্ণ অবস্থা পায়।

কৌটার ভিতর ডিমগুলি যখন ফুটে তখন কৌটার উপরের ধারের যোড়টা ফেটে যায়, সেই ফাঁক দিয়ে বাচ্চারা বাহির হয়ে পড়ে। পরে কৌটার মুখ আবার যুড়ে যায়। ডিমের কৌটা দেখে তার ভিতর ডিম আছে কিনা বুঝা যায় না।

ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন তার চেহারা পূর্ণ বয়স্ক আরসলার মতই হয়, কেবল খুব ছোট্ট হয় আর তার পাখা থাকে না। রংটাও সাদাটে থাকে। তারপর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে, আর বার-বার খোলস বদলে, ক্রমে ক্রমে বড় হয়। বাচ্চা আরসলা যখন খোলস বদলায় তখন তার পিঠের দিকে পুরাণ চামড়াটা লম্বালম্বি ফেটে যায়, আর ভিতর হতে নূতন চামড়াওয়ালা আরসলা, পা মাথা শুঁয়া সবশুদ্ধ বাহির হয়ে আসে। পুরাণ ফাঁপা খোসাটার ফাটলের মুখ আবার এমন সুন্দর যুড়ে যায় যে তা দেখে বুঝা যায় না যে আরসলাটা তার ভিতর হতে কি করে বাহির হল। আরসলার আকারের পুরাণ খোসাটা গা, পা, মাথা শুঁয়া সব সমেত পড়ে থাকে। এই সময়ে নূতন আরসলার রং সাদাটে থাকে, তার গায়ের চামড়াও নরম থাকে। ক্রমে বাতাস লেগে দিনকয়েকের মধ্যে রংটা গাঢ় হয় আর চামড়াও শক্ত হয়। পাখা গজালে বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে আর খোলস বদলায় না। অন্যান্য পতঙ্গের মত আরসলার শরীরও তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। বুকটা তিন খণ্ডে আর পেটটা অনেক খণ্ডে বিভক্ত।

আরসলার দেহের সামনের দিকের উপরে, যে গোল চাক্তিটাকে মাথা বলে ভ্রম হয়, সেটা মাথা নয়, বুকের প্রথম খণ্ডের উপর দিকে, অর্থাৎ 'ঘাড়ের' দিকে একটা শক্ত চাক্তি হয়, এটা তাই। এই চাকতিটার তলে মাথাটা ঢাকা পড়ে, তাই উপর দিক থেকে মাথাটা দেখা যায় না। একটা আরসলাকে চিৎ করে ফেল্‌লে তার মাথা ও মুখ দেখতে পাওয়া যায়। মুখটা মাথার সম্মুখ দিকে না থেকে তলার দিকে বেঁকে থাকে।

মাথার দুই পাশে, দুটা বড় বড় বহুপার্শ্বযুক্ত চোখ আছে। ঠিক যেন, এক-একটা চোখের গায়ে অনেকগুলো ধার কাটা (faceted), অথবা অনেকগুলো চোখ বোল্‌তার চাকের মত একসঙ্গে বসান (Compound eyes). প্রত্যেক চোখের ভিতর পাশ থেকে একটা করে খুব লম্বা সরু অনেক গাঁইট যুক্ত শুঁয়া বাহির হয়। শুঁয়া দুটা খুব লম্বা—সমস্ত দেহ অপেক্ষা লম্বা। আরসলা এই শুঁয়ার প্রত্যেকটাকে পৃথকভাবে, বা দু'টাকে একসঙ্গে , ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে চারিদিকে ঘুরাতে পারে। শুঁয়া দিয়ে সব জিনিস স্পর্শ করে দেখে।

মুখে প্রথমে ওষ্ঠ, তার পরে দু'পাশে খুব শক্ত ধারাল সাঁড়াশির মত এক যোড়া ঠোঁট থাকে, তাকে দংশনোষ্ঠ (Mandible) বলে। তা দিয়ে আরসলা খাবার করে বা কেটে নেয়। তার পর এক যোড়া চর্ব্বনোষ্ঠ আছে। তাই দিয়ে খাবার চিবায়। এই চর্ব্বনোষ্ঠের গায়ে প্রতি পাশে তিনটা গাঁইটযুক্ত ছোট শুঁয়ার মত একটা জিনিস বাহির হইয়াছে। সে দুটাকে স্পর্শিনি বলে (Palpi)। তারপর অধর বা নিম্নোষ্ঠ। মাথাটা কাটিয়ে চিৎ করিয়া ফেলিলে এগুলি দেখা যায়। আমাদের চোয়াল উপর ও নীচে বসান বলিয়া আমরা চোয়াল উপর নীচে নাড়ি। পশু পক্ষী সরীসৃপ সকলেরই চোয়াল আমাদের মত উপর নীচে খেলে। কীট পতঙ্গের চোয়াল পাশাপাশি বসান, তাই তাদের চোয়াল পাশাপাশি ডাইনে বাঁয়ে খেলে।

আরসলার বুকের তিন খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডের তলা থেকে অন্যান্য পতঙ্গের মত এক যোড়া করে পা বা ঠ্যাং বাহির হয়েছে। আরসলারও ছয়টা পা। পাগুলি খুব লম্বা, তা দিয়ে আরসলা খুব দ্রুত চলতে পারে। প্রতি পায়ে পাঁচটা গাঁইট আছে। প্রথম পর্ব্ব গায়ের সঙ্গে লাগা, তার পর একটা ছোট্ট পর্ব্ব, তৃতীয় পর্ব্বটা উরু, চতুর্থ পর্ব্বটা জংঘা, পঞ্চম পর্ব্বটা চরণ, বা পায়ের পাতা। চরণটা আবার ছোট ছোট ছয়টা পর্ব্বের সমষ্টি। চরণের আগায় দুটা সরু বাঁকা নখ থাকে। উরু ও জংঘার অনেকগুলি ছোট ছোট কাঁটা থাকে।

আরসলার দু'যোড়া করে পাখা থাকে। বুকের দ্বিতীয় খণ্ডের দু'পাশ হইতে দু'টা পাখা বাহির হইয়াছে। এই প্রথম পাখাযোড়া একটু মোটা ও চিম্‌সে। এর নীচে বুকের তৃতীয় খণ্ড হতে দ্বিতীয় যোড়া পাখা বাহির হয়েছে। এই পাখা যোড়া খুব পাৎলা এবং সেটা লম্বালম্বি ভাঁজ হয়ে উপরের পাখা যোড়ার তলে ঢাকা পড়ে থাকে। পাখায় অনেক শিরা থাকে।

অন্যান্য পতঙ্গের মত, এদেরও উদরের ভাগে পা বা পাখা কিছুই গজায় না। পেটের শেষে দু'পাশে অনেক গাঁইটযুক্ত দু'টা মোটা গোঁজ বাহির হয়। পুরুষদের এই দুই গোঁজের মাঝে গাঁইটশূন্য ছুঁচের মত দু'টা ছোট্ট সরু গোঁজ থাকে। স্ত্রীদের এই গোঁজ দুইটা থাকে না, তা দেখে অনেক সময় স্ত্রী পুরুষ চেনা যায়।

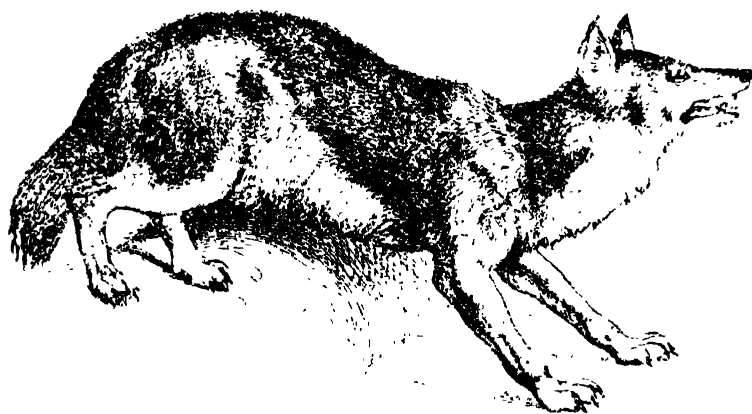
সন্দেশ। কার্ত্তিক ১৩২৬। পৃ.২২১-২২৪
অগ্র. ও পৌষ ১৩২৬। পৃ. ২৫৭-২৬৬

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা' এই কথাটা অনেক সময়ে আমরা লোকের মুখে শুনি। কোন দুর্দ্দান্ত দুষ্ট লোক, যে অনেক লোককে নির্য্যাতন করে, তাহাকে যদি অন্য কেহ তাহার নিজেরই এলাকায় জব্দ করে, তখন আমরা বলি "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা"। কোন জবরদস্ত পুলিস কর্ম্মচারী যে চোর ধরিতে ও দুষ্ট দমন করিতে খুব ওস্তাদ, তাহার নিজের বাড়িতে বা তাহার নিজের থানাঘরের মধ্যে যখন চুরি হয়, আমরা বলি "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা"।

কথাটার অর্থ—বাঘ যে এমন প্রবল ও দুর্দ্দান্ত জন্তু, তাহাকেও ভয় না করিয়া ঘোগ্ তাহারি ঘরে আড্ডা গাড়ে।

বাঘকে ত আমরা সকলেই চিনি, কিন্তু 'ঘোগ'টা কি? সে কি রকম জন্তু যে



বাঘকেও ডরায় না? সংস্কৃতে 'কোক্' একটা শব্দ আছে। অভিধানে কোকের প্রতিশব্দ—ঈহামৃগ আর বৃক। 'ঈহামৃগ' বলে যে জন্তুর 'ঈহা' আছে। 'ঈহা'র অর্থ উদ্যম, চেষ্টা। যে জন্তু দৌড়িয়া তাড়া করিয়া শিকার ধরে, তাহাকে বলে 'ঈহামৃগ'। 'বৃক' বলে নেকড়ে বাঘ বা নেকড়ে বাঘের মত জন্তুকে।

সংস্কৃত রামায়ণে এক জায়গায় আছে "বনযূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দিতা"।

অর্থাৎ দলছাড়া হরিণী কোকের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে যেমন হয়, তেমনি। হরিণ দল ছাড়া হইলে কোক তাহাকে তাড়া করিয়া মারে।

উড়িষ্যায় এক জাতের বুনো কুকুর আছে তাহারা দেখিতে অনেকটা শিয়ালের মত, শিয়াল অপেক্ষা একটু বড়, আর তাহার ডাক অনেকটা কুকুরের মত, তাহাদের উড়িয়াতে খগ বলে। চলিত কথায় সচরাচর 'বলিয়া কুকুর' বলে। 'বলিয়া'র অর্থ বলবান, অর্থাৎ এমন বলবান কুকুর যে কাহাকেও ভয় করে না, এমন কি বাঘকেও ডরায় না।

এই বুনো কুকুর দল বাঁধিয়া বাস করে ও দল বাঁধিয়া তাড়া করিয়া হরিণ প্রভৃতি শিকার করে। বোধ হয়, কোক্ শব্দ হইতেই খ-গ আর ঘোগ্ শব্দ হয়েছে। ঘোগ আমাদের দেশের বুনো কুকুর। ঘোগের গায়ের রং খড়ের রঙের মতন। পিঠের উপরটার রং খুব গাঢ়, প্রায় কালচে, আর বুক ও পেটের রং সাদাটে। লেজটা লম্বা ও ঝাঁকড়া এবং নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। লেজের আগটা কালো মতন। ইহার মাথা ও শরীর লম্বে তিন ফুট, লোমশুদ্ধ লেজ চৌদ্দ ইঞ্চ।

এই বুনো কুকুর বা ঘোগ কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের অরণ্যময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে, খোলা পাহাড়ে জায়গায়, এবং দক্ষিণ ভারতের বড় বড় বনে, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের জঙ্গলময় পাহাড়ে— ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ দিনের বেলায় শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, কখন কখন রাত্রিতেও বাহির হয়। একেলা বা দলবদ্ধ হইয়া ইহারা যে সব জন্তু ধরিতে পারে তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করে। কখন কখন মৃতদেহ ও ফলমূলও খায়। সচরাচর ছয়টা হইতে দশ বারটা বুনো কুকুর একত্র দলবদ্ধ হয়। কখনও কখনও এক-এক দলে কুড়ি পঁচিশটাও দেখা গিয়াছে। ইহারা সম্বর হরিণ, চিতা হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি নানা প্রকার হরিণ ও বুনো শূয়র প্রভৃতি, মারিয়া খায়। তিব্বত দেশে বন্যছাগ ও বন্যমেষ মারিয়া খায়। ইহারা লোকালয় হইতে দূরে, গভীর বনের ধারে পাহাড়ে জায়গায় বাস করে বলিয়া সচরাচর ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহাদের দ্বারা গৃহপালিত পশুও হত হয় না। তবে কখন কখনও শিকার না পাইলে ক্ষুধার তাড়নায় লোকালয়ে আসিয়া সুবিধা পাইলে ছাগ মেষ বাছুর মারিয়া লইয়া যায়। জর্ডন ও ম্যাক্‌মাষ্টার সাহেব বলেন যে তাঁহারা ইহাদিগকে বড় পোয়া মহিষ মারিতে দেখিয়াছেন। উড়িষ্যায় যে সব রাখাল পাহাড়ে বনে গরু ও মহিষের পাল চরায়, তাহারা অনেকেই আমায় বলিয়াছে যে 'বলিয়া' কুকুরের দল কখন নিবিড় বনের মধ্যে রাখালদের বা তাদের গরু মহিষকে তাড়া করে নাই, অথচ তাহাদের নিকটেই বড় হরিণকে তাড়া করিয়া মারিতেছে। বড় জন্তু মারিবার সময়ে দলের কয়েকটা সম্মুখ দিকে গিয়া গলায় ও নাকে মুখে কামড়াইয়া ধরে আর কয়েকটা পাশে গিয়া কামড়াইয়া পেট চিরিয়া ফেলে।

আমি উড়িষ্যার ঢেঙ্কানাল রাজ্যে একবার সেখানকার রাজা মহাশয় ও কটকের কমিশনর গ্রীয়ার সাহেবের সঙ্গে বনে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলাম। বৈকালে ৪টার সময়ে ফিরিয়া আসিবার কালে সামনে দেখিলাম একটা জঙ্গলময় পাহাড়ের ধারে ছয়-সাতটা বুনো কুকুর মিলিয়া খুব বড় সম্বর হরিণকে তাড়া করিতেছে। হরিণটা প্রাণপণে

ছুটিতেছে। কুকুর কয়টা তাহার পিছনে দৌড়িতেছে, যে যেখানে পাইতেছে কামড়াইতেছে। হরিণ প্রাণভয়ে যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছে কুকুরের দলও সেইদিকে ছুটিয়া তাহাকে তাড়া করিয়া যাইতেছে। কুকুরদের যেটা যখন সুবিধা পায় হরিণের দেহ হইতে এক এক কামড় মাংস তুলিয়া লইতেছে। হরিণ একবার গভীর বনে প্রবেশ করে আবার ফাঁকা জায়গায় বাহির হইয়া আইসে, কুকুরের দল সর্ব্বত্রই তাহাকে তাড়া করিয়া যাইতেছে। আমরা ঘোড়ার গাড়িতে ছিলাম লোকজনও অনেক সঙ্গে ছিল, আমাদের কাছ দিয়াই হরিণটা পালাইল, কুকুরের দল আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর হরিণটা এক জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়িল কিন্তু সেখানেও নিস্তার পাইল না। অবশেষে ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া কুকুরের হাতে মারা পড়িল। সাহেব পূর্ব্বে কখন এরূপ ঘটনা দেখেন নাই, আর আমাদের দেশে নেকড়ে বাঘও দল বাঁধিয়া শিকার তাড়া করে না। এগুলি নেকড়ে নয়, এক রকম বুনো কুকুর, শুনিয়া সাহেব ভারি আশ্চর্য্য হইলেন। কুকুরেরা যখন হরিণটাকে তাড়া করিতেছিল, সাহেব তখন গাড়ি হইতে নামিয়া গুলি করিয়া দলের দু'টা কুকুর মারিলেন। তাহাতেও অপর কুকুরেরা কিছুমাত্রও ভয় পাইল না। বাকি যে কয়টা ছিল তাহারা পূর্ব্বের মতই হরিণটাকে মারিবার জন্য তাড়া করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাতেই হরিণটা মরিল। আমি সেই মরা কুকুরের একটাকে গাড়িতে তুলিয়া বাড়িতে লইয়া আসিলাম। তাহার গায়ের গড়ন রং ও গায়ের মাপ সব খাতায় টুকিয়া রাখিলাম।

বুনো কুকুরের দল কখন কখন বাঘকেও আক্রমণ করে। বাঘ আত্মরক্ষার জন্য এক একবার থাবা মারে। যাহার গায়ে বাঘের এক চড় লাগে তাহারই মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই সময়ে অপর কুকুরগুলি, যে যেমন পারে, কামড়াইয়া বাঘকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে পরিণামে বাঘের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে পনের যোলটা কুকুর ছিল, যেখানে যুদ্ধের পরে হয়ত সেখানে চার-পাচটা মাত্র জীবিত থাকে। যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহারাই পেট ভরিয়া বাঘের মাংস খায়।

বুনো কুকুর অনেক জন্তুকে মারিলেও, মানুষকে কখনও আক্রমণ করিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। বুনো কুকুরকে পোষ মানান ভারি কঠিন। শীতকালে ইহাদের ছানা হয়। দুই মাস গর্ভধারণ করিয়া কুকুরী বৃক্ষকোটরে, গর্ত্তে বা পর্ব্বত গুহায় পাঁচ-ছয়টি ছানা প্রসব করে।

বুনো কুকুর, নামে কুকুর হইলেও, নেকড়ে শিয়াল ও গৃহপালিত কুকুর প্রভৃতি প্রকৃত কুকুরগণীয় জন্তু হইতে একটু ভিন্ন। ইহাদের নীচের চোয়ালে দু'পাশে দু'টা করিয়া দাঁত থাকে। নেকড়ে শিয়াল ও কুকুরের তিনটা করিয়া থাকে। ইহাদের মস্তকের গড়নও ভিন্ন স্তনও সংখ্যায় অধিক। কুকুরগণীয় জন্তুর দশটা করিয়া স্তন হয়, ইহাদের বারটা, চৌদ্দটা করিয়া স্তন হয়।

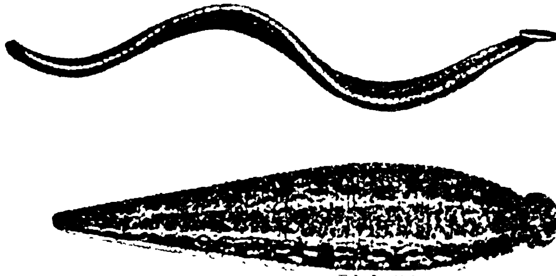
সন্দেশ। মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২৬
পৃ: ২৮২-২৮৫

জোঁক

ভাই সন্দেশ,

আমি একদিন পচা পানা পুকুরে পদ্মফুল তুল্‌তে নেমেছিলাম। ফুল তুলে যখন ডাঙ্গায় এলাম, তখন দেখি, আমার পায়ের এক জায়গা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, আর এক জায়গায় একটা জোঁক লেগে আছে। জোঁকটা রক্ত খেয়ে বেশ মোটা ও বড় হয়েছে— তিন ইঞ্চের উপর লম্বা হয়েছে। এটার গায়ের উপর দিক্‌টা মেটে রঙের, তার উপর সরু সরু কাল ডোরা আর কাল কাল ফুটকি। তলার বা পেটের দিকটা ফ্যাকাসে, গায়ের দুই ধারে দুইটা হল্‌দে ডোরা আর দু'জোড়া কাল ডোরা আছে।

পুকুরের ধারে একটা লোক গরু চরাচ্ছিল। সে বল্‌ল, "মশাই, ওটা 'মহিষে জোঁক'।" যে কোন জাতের জোঁক হ'ক বড় হলেই তাহাকে আমাদের দেশে 'মহিষা জোঁক' বলে। আর ছোট জাতের জোঁক হলেই তাকে 'চিনা জোঁক' বলে।



যে সব পুকুরে আর বিলে পাঁক থাকে আর জলে দাম, শেওলা ও পানা প্রভৃতি ভরে থাকে, সেই সব পুকুরে বিলে ডোবায় আর ধান-ক্ষেতে ছোট বড় অনেক জাতির জোঁক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট জোঁক থাকে তারা বড় জোঁকের বাচ্চা, বয়স হলে আর বড় হবে; আবার কতকগুলি জোঁক আছে যারা জাতেই ছোট; তাঁরা আর বড় হয় না। কোন কোন জাতি এক ইঞ্চি লম্বা হয়, তাদের জল থেকে তুল্‌লে একটা বড় মটরের মত গোল হয়ে যায়। সেইটাই আবার রক্ত খেয়ে ফুলে উঠ্‌লে তিন ইঞ্চ লম্বা হ'য়ে যায়। কোন কোন জাতির জোঁক হয়ত চার ইঞ্চ লম্বা থাকে—কিন্তু যখন রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠে তখন

সাত ইঞ্চ লম্বা হয়। আবার কোন কোন জোঁক দেড় ফুট দু'ফুট পর্য্যন্ত লম্বাও হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জোঁকের পায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোন কোন জাতির রং কালচে সবুজ হয় তাতে হলদে ডোরা আর কাল ফুট্‌কি থাকে, কোন কোন জাতির রং মেটে হয় আর তাতে কেবল কাল ডোরা আর কাল ফুট্‌কি থাকে। কোন কোন জাতির গায়ে ডোরা থাকেই না অথবা খুব অস্পষ্ট থাকে। কোন কোন জাতির বড় জোঁক বেশ চওড়া হয় আবার কোন জাতির বড় জোঁক সুতোর মত সরু সরু হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জোঁক দেখা যায়। আমাদের দেশে পাহাড়ের স্যাঁৎসেঁতে জায়গায়, ঘাসে জঙ্গলে, পালে পালে এক রকমের ক্ষুদে জোঁক দেখা যায়, তারা এক ইঞ্চ লম্বা আর ঝাঁটার কাঠির মত সরু—কিন্তু রক্ত খেয়ে যখন মোটা হয় তখন দুই ইঞ্চ লম্বা আর পেন্‌সিলের মত মোটা হয়ে পড়ে। দার্জ্জিলিং, আসাম, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষের অনেক পাহাড়ে জায়গায় বনে জঙ্গলে এই ক্ষুদে বা ছিনা জোঁকের ভারি উৎপাত। ভিজা জায়গায় ঘাসে ও ঝোপঝাড়ের লতাপাতায় এই সব জোঁক লুকিয়ে থাকে। মানুষ ঘোড়া গরু ছাগল প্রভৃতি দেখ্‌লে কিলবিল করে দলে দলে চারিদিক হইতে বাহির হয়, আর সেই সব জন্তুর দিকে গিয়ে তাদের গায়ে লেগে রক্ত চুষে খায়। রক্ত খেয়ে পেট ভরে গেলে আপনা আপনি গা থেকে খসে পড়ে।

হাঁটু পর্য্যন্ত বড় মোটা মোজা বা পট্টি জড়িয়ে বুট জুতা পরে এই সব জায়গায় গেলেও অনেক সময়ে এই সব জোঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। ক্ষুদে জোঁকেরা মোজার সুতার ফাঁক দিয়ে বা পট্টির বেড়ের ফাক্‌ দিয়ে ঢুকে, কিম্বা জুতা মোজা বেয়ে ধুতি আর পায়জামার ভিতরে ঢুকে গায়ের রক্ত খায়। ঘোড়ায় চড়ে গেলেও রক্ষা পাওয়া যায় না। ঘোড়ার গায়ে জোঁক ত লাগেই, তাছাড়া ঘোড়ার উপরের মানুষের গায়েও লাগে। মাটির ঘাসপালা থেকে ঘোড়ার গা বেয়ে ওঠে, তাছাড়া আশের পাশের গাছপালা থেকেও মানুষের গায়ে লেগে যায়। এই সব বনের মধ্যে একবার খানিকক্ষণ ঘুরে এলে দেখতে পাওয়া যায় যে গায়ের নানা স্থানে অনেক জোঁক লেগে রক্ত খাচ্ছে।

জোঁক যখন কামড়ায় তখন কিছুই টের পাওয়া যায় না। যখন রক্ত খেয়ে বেশ বড় হয়ে আমাদের গায়ের চামড়ায় ঝুল্‌তে থাকে তখন তাদের ঠাণ্ডা গা আমাদের গায়ে লাগাতে গাটা ছ্যাঁক্‌ ছ্যাঁক করে, তাইতে আমরা টের পাই। আর জামা কোট মোজা খুলে ফেল্‌লে জোঁক লেগে আছে দেখতে পাই; অথবা গায়ের নানা স্থান দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দেখতে পাই। তখন জানতে পারি জোঁক লেগেছে। ক্ষুদে ছিনে জোঁকই বল আর বড় মহিষে জোঁকই বল—রক্ত-খেকো সব জাতের জোঁকের শরীরের গড়ন ও স্বভাব প্রকৃতি প্রায় একই রকমের। জলের জোঁক জলে সাঁতার দিতে পারে, আর

জলের তলায় মাটিতে চলাফেরাও করতে পারে। ডাঙ্গার জোঁককে জলে ফেলে দিলে, সাঁতরাতে পারে না। জলের তলায় ডুবে মাটিতে চ'লে জল থেকে বেরিয়ে আসে। ডাঙ্গার জোঁক জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে পারে, কিন্তু বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে মরে যায়। জলের জোঁক জলে ডুবে থাকলেও মরে না। সব জোঁকেরই গাটা যতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ বাঁচে। গাটা শুকিয়ে গেলে, আর অনেকক্ষণ জল না পেলে ম'রে যায়। গোড়ার ছবিটা দেখ, ওটা একটা রক্তখেকো মহিষা জোঁকের ছবি। এদের শরীর লম্বা ও চেপ্টা। শরীরে অনেকগুলি গাঁইট বা চাক্‌তির মত খণ্ড আছে। পা নাই। সামনের দিক্‌টা সরু, তারপর শরীরটা ক্রমশঃ চৌড়া হ'য়ে গেছে।

পিছনের দিকটা খানিকদূর পর্য্যন্ত বেশ মোটা হ'য়ে আবার শেষে সরু হ'য়ে এসেছে। শরীরের শেষ ভাগে একটা ছোট বাটির মত মাংসপিণ্ড আছে। এই বাটির গোড়ায় একটা গলা বা বোঁটা আছে বলে এই বাটিটা স্পষ্ট দেখা যায়। শরীরের সামনের দিকেও ঐ রকম একটা ছোট বাটি আছে কিন্তু সে বাটিটা শরীরের সঙ্গে সমান, আর তার গলা বা বোঁটা নাই, তাই সেটা তেমন স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই দুটা বাটি দিয়ে জোঁক চলা ফিরা করে। চল্‌বার সময় পিছনের বাটিটা মাটিতে চেপে দেয়। তাতেই তার ভিতরের বাতাস ও জল বাহির হ'য়ে গিয়ে বাটিটা মাটিতে আটকিয়ে যায়। জোঁক তখন তার শরীরটাকে যতদূর পারে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সামনের বাটিটা মাটিতে আটকিয়ে নেয়। তারপরে পিছনের বাটিটা মাটি থেকে আল্‌গা করে তুলে শরীরটাকে কুঁচকিয়ে সামনের দিকে টেনে, পিছনের বাটিটাকে সামনের বাটির কাছে এগিয়ে নিয়ে মাটিতে লাগিয়ে দেয়। আবার সামনের বাটিটাকে তুলে শরীরটাকে আরও এগিয়ে দিয়ে আবার সামনের দিকের মাটি চুষে ধরে। তারপর আবার পিছনের বাটিটা আল্‌গা ক'রে শরীরটাকে টেনে এগিয়ে আনে।

জোঁক যখন কোন জন্তুর রক্ত খেতে চায়, তখন তার সামনের দিকের ছোট বাটিটা দিয়ে সেই জন্তুর গায়ের চামড়াটা চুষে ধরে। বাটির ভিতরে জোঁকের মুখ। মুখের পাশে তিনটা ছোট্ট কাটা চাকার মত শক্ত চোয়াল আছে। তার ধারে করাতের মত অনেক খাঁজ কাটা থাকে। বাটিটা চেপে দিয়ে চোয়াল তিনটা সেই জন্তুর চামড়ার উপর ঘষলেই চামড়া কেটে যায় আর সেই কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত বাহির হয়। জোঁক কামড়ালে আমাদের চামড়ায় ত্রিভুজের মত তিনটা ছোট্ট ছিদ্র হয় অথবা তিন দিকে তিনটা ছোট্ট লম্বা কাটা দাগ হয়।

জন্তুদের গা থেকে রক্ত বেরোলে সেই রক্ত শীঘ্র জমে যায়। তাই জোঁক তার মুখ থেকে থুতুর মত এক রকম রস বাহির ক'রে সেই কাটা ঘায়ের মুখে ঢেলে দেয়—তাতে রক্ত আর জম্‌তে পারে না, তরল থাকে। তারপর জোঁক ধীরে ধীরে একটু একটু

করে শরীরটাকে লম্বা করতে থাকে, আর সেই কাটা ঘা থেকে রক্ত বাহির হয়ে তার মুখের মধ্যে ঢুকতে থাকে, আর জোঁকও রক্ত গিলতে থাকে। জোঁকের পেট বা উদর, মাথা থেকে গায়ের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর জোড়া। উদরে বা পাকস্থলীতে এগার জোড়া থলে থাকে। শেষের থলিজোড়া খুব লম্বা। এত বড় পেটে অনেক রক্ত ধরে। রক্ত খেয়ে খেয়ে যখন জোঁকের সমস্ত পেট ভরে যায় আর সমস্ত গা ফুলে ভারি হয়ে পড়ে, তখন জোঁকটা সেই জন্তুর শরীর থেকে ঘসে পড়ে যায়। এতটা রক্ত হজম হতে জোঁকের ছয় মাস থেকে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে। একবার পেট ভরে রক্ত খেলে জোঁক আর এক বৎসর পর্য্যন্ত কিছু খায় না, খাবার দরকারও হয় না। এতদিন পেটের মধ্যে রক্ত থাকলেও সে রক্ত জমে যায় না। পেটের ভিতর থেকে একরকম রস বাহির হয়, তাতে রক্তকে তরল রাখে। কাটা ঘায়ের মুখে জোঁক তার মুখ দিয়ে রস ঢালে ব'লে জোঁকের কামড়ের রক্ত-পড়া শীঘ্র বন্ধ হয় না।

জোঁক যখন কামড়িয়ে ধরে তখন যদি তার মুখে নুন বা নুনের জল, থুথু, চুণ, সরিষার তেল, হুঁকার জল প্রভৃতি লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে জোঁক তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা পেয়ে তার কামড় ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায়। অনেকে বলে যে তামাক-পোড়া ছাই বা সরিষার তেল খুব ক'রে পায়ে মেখে জলে নামলে, জোঁক ধরে না। যতক্ষণ এসব জলে ধুয়ে না যায় ততক্ষণ সুবিধা হতে পাবে, কিন্তু একবার ধুয়ে গেলে তারপর কোন ফলই হয় না।

জোঁকের পিছন দিকে যে বাটি আছে তার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই, আর তার সঙ্গে মুখ বা উদরের কোন সম্পর্ক নাই। সেদিন "পোকা মাকড়" নামে একখানা পুস্তকে পড়ছিলাম যে জোঁক দু'দিক দিয়েই রক্ত চুষে খেতে পারে। একথা বড়ই ভুল। আজ পর্যান্ত কেউ কোন জোঁককে পিছন দিক দিয়ে রক্ত খেতে দেখে নি। তোমাদের কেউ যেন এ ভুল ক'রো না।

অনেকের বিশ্বাস, জোঁক কেবল আমাদের গায়ের বদ্ রক্ত খায়। আমাদের হাতে পায়ে গাঁটে বাত হ'লে, বা অন্য কারণে ফুলে বেদনা হ'লে, সেখানে একটা জোঁক লাগিয়ে দেওয়া হয়। জোঁক সেই জায়গায় খানিকটা রক্ত খেয়ে ফেললে সেখানে রক্তের চাপ বা টান কম হয়ে যায়, তাতে বেদনা সারে। কিন্তু জোঁক যে কেবল বদ রক্তই খায় তা নয়, ভাল রক্তও খায়।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ও আমাদেব দেশে ডাক্তারেরা রোগীর রোগ ও ব্যথা সারাবার জন্য রোগীর গায়ে যখন-তখন জোঁক লাগিয়ে তার রক্ত বার ক'রে দিতেন। আজকাল ঐ সকল রোগ সারাতে সচরাচর আর জোঁক লাগান হয় না। তাই জোঁকের আর সে রকম চল নাই সেই সময়ে ডাক্তারি কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অনেকে

জোঁক পুষে রাখত। এক পণ্ডিত হিসাব করে দেখেছেন যে ১৮২৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৩০ খ্রিঃ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে এক প্যারিস নগরেই প্রতি বৎসর গড়ে ৬ লক্ষ জোঁক ডাক্তারি কাজে ব্যবহার হ'ত। ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে সেই সময়ে প্রতি বৎসর তিন কোটি জোঁকের দরকার হ'ত।

গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার আরম্ভে জোঁকের ডিম পাড়বার সময় হয়। সেই সময়ে তারা পুকুরের পাড়ে কাদায় ঢুকে পড়ে। সেই সময়ে জোঁকের গায়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একরকম রস বাহির হয়। সেই রস শুকিয়ে গিয়ে গায়ের চারিদিকে একটা পাৎলা চামড়ার আংটি বা বেল্ট্ তৈয়ার হয়। জোঁক সেই চামড়ার বেড়ের মধ্যে দশটা থেকে ষোলটা পর্য্যন্ত ডিম ছেড়ে দেয়। পরে শরীরটাকে গুটিয়ে কুঁচকিয়ে সেই আংটি থেকে বেরিয়ে আসে। শরীর থেকে আল্‌গা হ'য়ে পড়লেই আংটির দুই মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সেটা একটা ছোট কোষ বা থলের মত হ'য়ে যায়। তারপর জোঁক তার উপর আরও থুতু ঢেলে দেয়। সেই থুতুর রসে মাটি কাদা লেগে শুকিয়ে গেলে কোষটা আরও শক্ত হয়। জোঁক এই ডিম ভরা কোষটাকে কাদার ভিতর পুঁতে দেয়। তারপর এক মাস কি দেড় মাস পরে সব ডিম ফুটে ছোট ছোট বাচ্চা বাহির হয়। তারা জলের নানা রকম ছোট ছোট পোকা, কেঁচো প্রভৃতির গায়ে লেগে তাদের রস খায়। খেয়ে খেয়ে ক্রমে বড় হলে, শামুক ব্যাং প্রভৃতির রস আর রক্ত খায়। এক বৎসর দেড় বৎসর বয়স না হ'লে জোঁকেরা মানুষের গায়ের রক্ত খেতে পারে না। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স হ'লে শরীর যতটা বাড়বার তা বাড়ে; তারপর আর বাড়ে না। এই সময়ে তার পূর্ণ বয়স। জোঁক পনের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

আমাদের দেশের স্রোতহীন নদীতে, পুকুরে, বিলে, আর ডোবায়, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তু যখন জলে মুখ ডুবিয়ে জল খায়, তখন তাদের ঠোঁটে মুখে নাকের উপরে অনেক জোঁক লেগে যায়। আবার কখন কখন তাদের নাকের ছিদ্রের মধ্যেও জোঁক ঢুকে গিয়ে সেখানে রক্ত খায়।

সকল জাতের জোঁকের পেটের থলিয়ার সংখ্যা সমান থাকে না। জাতিভেদে সংখ্যায় কম বেশি হয়। সকল জাতের জোঁকের মুখে চোয়াল বা দাঁত থাকে না। অনেকের মুখে একটা সরু শুঁড়ের মত নল আছে। তারা সেই শুঁড় বাহির ক'রে মাছ প্রভৃতির গায়ে লাগিয়ে তাদের রস খায়। অনেক জোঁক আবার সমুদ্রের লোনা জলে থাকে। কোন কোন জাতির গায়ে লোম থাকে, কোন কোন জাতির গায়ে ছোট ছোট উঁচু উঁচু মাংসপিণ্ড থাকে। কোন জাতের জোঁক কেবল শামুক গুগ্‌লি কেঁচো প্রভৃতির রস খায়। কোন কোন জাতের জোঁক হাঙ্গর আর শঙ্কর মাছের রক্ত খায়। কোন কোন জাতের জোঁক জলের মধ্যে একটা ক'রে ডিম পাড়ে। কোন কোন জোঁকের পেটের

তলায় একটা চামড়ার ভাঁজ তাকে তারই ভিতর তারা ডিম রাখে। সে ডিম ফুটে বাচ্চা হলে, বাচ্চারা কিছুকাল মার পেটের থলিয়াতেই মার কাছে থাকে; পরে বড় হ'লে মাকে ছেড়ে নিজেরা খাবার সন্ধানে জলে ঘুরে বেড়ায়।

চীনেরা জোঁকের ঝোল খায়।

সন্দেশ। মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২৬, পৃ: ৩০২-৩০৯

পরিশিষ্ট

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সন্দেশের পাঠক পাঠিকারা, অল্পদিন হইল তোমরা একজন বন্ধু হারাইয়াছ। তোমাদের ''মেজদাদা মহাশয়'' দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু আর ইহজগতে নাই। কত ভাল ভাল গল্প তিনি তোমাদের শুনাইতেন। তাঁহার রচিত 'মাকড়সা' 'প্রজাপতি' ইত্যাদি পড়িয়া একদিন তোমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। আমরা জানি তোমরা তাঁহার লেখা কতই না আগ্রহে পড়িতে! কিন্তু আর তিনি তোমাদের গল্প করিয়া শুনাইবেন না। তাঁর কণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে। তাঁর মত মিষ্ট করিয়া পোকামাকড় পশু পক্ষীর গল্প কেহ বলিতে পারিত না। আমরা আশা করিয়াছিলাম তিনি অনেকদিন তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া কত কথাই তোমাদের শুনাইতে পারিবেন। কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার কাজ শেষ করিবার সময় পাইলেন না।

তিনি যে তোমাদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেন না, তোমাদের জন্যই তিনি ভাবিতেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকের কাজ লইয়া তিনি মফঃস্বলে যান। সেই সময় হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অতি কঠিন কাজ। যে সময়ে মন কোমল থাকে, সে সময়ে মনের উপর যে ছাপ দেওয়া যায়, সেই ছাপই সারা জীবন থাকিয়া যায়। ছোট গাছটিকে যে দিকে বাঁকাইয়া দেওয়া যায়, সেই দিকেই সে বাড়িতে থাকে। বড় হইলে সে গাছকে যদি বাঁকাইতে চেষ্টা কর, তখন সে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবু আর বাঁকিতে চাহিবে না। আমরাও সেইরকম যখন বড় হই, তখন আর নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারি না। শিক্ষার প্রকৃত সময়ই সেই জন্য বাল্যকাল। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন লোক এই শিক্ষা সম্বন্ধে, মাথা, ঘামাইয়াছেন? তোমরা অনেকেই হয়ত জান না আমাদের দেশে আগে শিশুদের শিক্ষা গুরুমহাশয়দের হাতে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুমহাশয় যখন মোড়া বা চৌকীর উপর বসিয়া এক হাতে দ্বিতীয় ভাগ আর এক হাতে বেত লইয়া বসিতেন, তখন অনেক ছাত্রের লেখা পড়া শিখিবার সাধ জন্মের মত চলিয়া যাইত। বানান কর—রুক্মিণী, পরাঙ্মুখ, পারিপার্শ্বিক। প্রশ্ন শুনিয়া ছেলেদের চক্ষু কপালে উঠিত; ঘন ঘন বেতের লক্ লক্ শব্দে মুখ শুকাইয়া যাইত। ছেলেরা প্রাণপণে এইগুলি মুখস্থ করিত। সেকালের পাঠশালের শিক্ষা কিন্তু এগুলি নহিলে চলিত না। বেতের চোটে সবই সম্ভব হইত। এই শিক্ষার ফলে কত কত ভাল ছেলেকেও যে পড়াশুনা জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

এখনও আমরা যে এ বিষয়ে বেশী উন্নতি করিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না। এখনও ছেলেকে পড়া মুখস্থ করাইতে পারিলেই যেন সব হইল, এইরূপ অনেকে মনে করেন, কিন্তু ছেলেদের শুধু ভয় দেখাইলেই শিক্ষা দেওয়া যায় না। আগে দেখিতে হয়, ছেলেরা কি চায়। কেমন ভাবে কথাটি বলিলে ছেলেরা সহজে বুঝিতে পারে এবং আগ্রহের সঙ্গে সে টা লইতে পারে। এই জন্যই তোমাদের হাতে এই 'সন্দেশ' দিয়া এত আনন্দ হয়। 'সন্দেশ' তোমাদের কাছে ত বেত হাতে লইয়া হাজির হয় না? নিতান্ত আত্মীয়ের মত তোমাদের সঙ্গে খেলার ছলে জ্ঞান বিলাইয়া দেয়, নয় কি? দ্বিজেন্দ্রবাবু এই 'সন্দেশে'র মধ্য দিয়া তোমাদের কাছে ভাল ভাল জিনিষ ধরিতেন। তাঁহার 'ছুঁচো', 'মাকড়শা' প্রভৃতি তোমরা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ, ছেলে মেয়েদের কাছে এগুলি কেন এত ভাল লাগিত, জান? তোমরা বলিতে পারিবে না; কিন্তু আমি তোমাদের বলিয়া দিতে পারি। সে কথাটি এই — তিনি তোমাদের ভালবাসিতেন এবং তোমরা কি ভালবাস, কেমন করিয়া বলিলে ভালবাস, তাহা তিনি জানিতেন। অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক বই পড়িয়া তিনি এই বিষয় জানিয়াছিলেন। তাঁহার 'জীবজন্তু' তোমরা কেহ কেহ হয়ত পড়িয়াছ। জীবজন্তুর সম্বন্ধে গল্প করিয়া অত কাজের কথা ক'জনে বলিতে পারে? যাহারা পড় নাই, তাহারা পড়িয়া দেখিও; কত আমোদ পাইবে। এমনি করিয়া তিনি ছেলেদের শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমোদের সঙ্গে উপদেশ দিলে, সেই উপদেশে বেশী কাজ হয়। এইজন্য তিনি ছেলেদের জন্য জীবজন্তুর গল্পচ্ছলে আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া গেলে, ছেলেদের জন্য আরও কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে শুধু ছেলেদের ভালবাসিতেন, তাহা নহে। তাঁহার সকলকেই ভালবাসিবার মত হৃদয় ছিল। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গল্প গুজব করিয়া আমোদ দিবার শক্তি তাঁহার যেমন ছিল, এমন অল্প লোকেরই থাকে। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেই বুঝিতে পারা যাইত যে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি; নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল। অথচ তাঁহার এমন সরলতা ছিল যে তাহাতে সকল মুগ্ধ হইত। কত গরীব দুঃখী যে তাঁহার নিকট কত সাহায্য পাইয়াছে, তাহার খবর তিনি ছাড়া আর কেহ জানে না। একদিন রাস্তায় একটি ভদ্রঘরের মেয়েকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি তাহার খবর লইয়া জানিলেন যে, বাড়ীতে বিধবা মা ভিন্ন তাহার আর কেহ নাই, সম্বলও কিছু নাই; তাই ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের দয়ার প্রাণ তখনই তাহাদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতি মাসে তাহাদের ৮৲ টাকা সাহায্য করিতেন। ছোট মেয়েটি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানিত না। বেচারা যখন ডিসেম্বর মাসে সাহায্য লইতে আসিয়া দারুণ সংবাদ শুনিল তখন সে কাঁদিয়া আকুল হইল। তাঁহার স্বভাব যেমন মিষ্ট ছিল, তেমনি তাঁহাতে যথেষ্ট তেজ ছিল। তিনি সত্য কথা বলিতে ভয় করিতেন না এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করিতেন। তোমরা এমনই চরিত্রের আদর করিতে শিখিও। আজ যিনি আমাদের কাছ থেকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা

মনে মনে যেন তাঁহার সদ্‌গুণগুলি পাইতে কামনা করি। যিনি আমাদের জন্য এত ভাবিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাকে ভুলিব না। বলিতে গেলে, সন্দেশের জন্য লিখিতে লিখিতেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি সন্দেশের জন্যই প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। সে প্রবন্ধ অসমাপ্তই রহিয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে

"সন্দেশে"র 'মেজদাদা', ছাড়িয়া "সন্দেশে"
কোথায় চলিলে তুমি কোন্ দূর দেশে?
দুর্ব্বোধ প্রাণীতত্ত্ব মিষ্ট গল্পাকারে
দিতে গো বুঝিয়ে সব ছোট শিশুদেরে!
"মাকড়সা" "প্রজাপতি" তব কর পরশে
বলিত মধুর গল্প বিপুল হরষে!
"উই" "ছুঁচো" এইরূপ ছোট কীট কত
তোমার প্রসাদে ধন্য হইত সতত!
তোমারই "জীবজন্তু" ছোট শিশুদেরে
ডুবাইয়া রাখে সদা আনন্দ সাগরে!
তোমার "চিড়িয়াখানা" শিশুদের শুধু
নহে প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্র, বৃদ্ধদেরো মধু।
ছাড়িয়া গো জীবজন্তু, ছাড়িয়া সকলে
কোথায় চলিয়া গেলে এমন অকালে?
নাহি ছিলে "মেজদাদা" শুধু "সন্দেশের"
"মেজদাদা" ছিলে তুমি সব শিশুদের ।
চেয়ে দেখ স্বর্গ হতে — সব শিশুগণ
করিছে তোমার তরে অশ্রু বরিষণ।

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রকাশ স্থান ও প্রকাশকাল

সখা

১. পিপীলিকার উপদেশ	মার্চ	১৮৮৭	পৃ:	৩৫-৩৬
	এপ্রিল	১৮৮৭	পৃ:	৫২-৫৪
	মে	১৮৮৭	পৃ:	৬৮-৭০
	জুন	১৮৮৭	পৃ:	৮৬-৮৯
২. আলোক পরীক্ষা	মে	১৮৮৮	পৃ:	৬৭-৭০
৩ আলোক বিজ্ঞান	জুলাই	১৮৮৮	পৃ:	৯৯-১২০
৪. আর্কিয়প্টেরিক্স	অক্টোবর	১৮৮৮	পৃ:	১৪৮-১৪৯
৫. গায়ক পাখি থ্রস	নভেম্বর	১৮৮৮	পৃ:	১৭১-১৭২
৬. প্রকৃতির ছদ্মবেশ	ফেব্রুয়ারি	১৮৮৯	পৃ:	২৫-২৮
৭. আকাশ ভ্রমণ ও মেঘ হইতে লম্ফপ্রদান	মার্চ	১৮৮৯	পৃ:	৪১-৪৮
৮. পেচক	ডিসেম্বর	১৮৮৯	পৃ:	১৮৭-১৮৮
৯. ইতর জন্তু ও মানুষ	জানুয়ারি	১৮৯০	পৃ:	৬ ৮
১০. সাপ	এপ্রিল	১৮৯০	পৃ:	৫৩-৫৮
১১. কোলা ব্যাঙ	মে	১৮৯০	পৃ:	৬৮-৬৯
১২. শরীর (মুখবন্ধ)	জুলাই	১৮৯১	পৃ:	৯৮-১০১
১৩. শরীরের গঠন ও অস্থিবিবরণ	সেপ্টেম্বর	১৮৯১	পৃ:	১৩৫-১৩৯
১৪. শাখা-হস্ত ও পদ	অক্টোবর	১৮৯১	পৃ.	১৫৩ ১৫৫

সাথী

১৫. বায়ু	জ্যৈষ্ঠ	১৩০০	পৃ:	২৯-৩৩
১৬. চোখের ধাঁধা	ভাদ্র	১৩০০	পৃ:	৯৫-৯৭
১৭. বিজ্ঞান কৌতুক	শ্রাবণ	১৩০০	পৃ:	৭৯-৮০
	অগ্রহায়ণ	১৩০০	পৃ:	১০০-১৫১
১৮. মনের কথা বলা	অগ্রহায়ণ	১৩০০	পৃ:	১৫৯

সখা ও সাথী

১৯. শিকারী গাছ	কার্ত্তিক	১৩০১	পৃ:	১৩৫-১৩৮
	অগ্রহায়ণ	১৩০১	পৃ:	১৫০-১৫৩
	চৈত্র	১৩০১	পৃ:	২৩২
২০. গিরগিটি	অগ্রহায়ণ	১৩০১	পৃ:	১৪২-১৪৫
২১. উট	মাঘ	১৩০১	পৃ:	১৮৯-১৯২
২২. বাদুড়	বৈশাখ	১৩০২	পৃ:	১১-১৫
২৩. প্রাকৃতিক গহ্বর	আষাঢ়	১৩০২	পৃ:	৫১-৫৩
২৪. ঈগল পাখী	শ্রাবণ	১৩০২	পৃ:	৬৪-৬৭
২৫. সাপ	ভাদ্র	১৩০২	পৃ:	৮৮-৯৪
২৬. ইন্দুরের কৌশল	ভাদ্র	১৩০২	পৃ:	১০৩
২৭. ইতরপ্রাণীর বুদ্ধি	আশ্বিন	১৩০২	পৃ:	১২২-১২৩
২৮. হরিণ	কার্ত্তিক	১৩০২	পৃ:	১৩৬-১৪২
২৯. কয়েকটি অদ্ভুত পাখী	অগ্রহায়ণ	১৩০২	পৃ:	১৪৯-১৫২
৩০. পেনগুইন	ফাল্গুন	১৩০২	পৃ:	২১৮-২২০
৩১. কয়েকটি অদ্ভুত জন্তু	ফাল্গুন	১৩০২	পৃ:	২২৪-২২৬
৩২. শজারু	চৈত্র	১৩০২	পৃ:	২২৮-২৩০

মুকুল

৩৩. কাঁকড়া	শ্রাবণ	১৩০৮	পৃ:	৫২-৫৫
৩৪. মাকড়সার জাল	আশ্বিন ও কা:	১৩০৮	পৃ:	১১০-১১১
৩৫. কাঁকড়াবিছা	অগ্রহায়ণ	১৩০৮	পৃ:	১১৭-১১৮
৩৬. ক্যাঙ্গারু				
ধ্রুব	বৈশাখ	১৩১৯	পৃ:	১৯-২০

সন্দেশ

৩৭. ছুঁচো	বৈশাখ	১৩২৭	পৃ:	১৪২-১৬
৩৮. প্রজাপতি	জ্যৈষ্ঠ	১৩২৭	পৃ:	৪৪-৫০
	আষাঢ়	১৩২৭	পৃ:	৭২-৭৮
	শ্রাবণ	১৩২৭	পৃ:	১২২-১২৬

৩৯. অজগর	আশ্বিন	১৩২৭	পৃ: ১৬৫-১৭২
৪০. প্যাঙ্গোলিন	অগ্রহায়ণ	১৩২৭	পৃ: ২৩১-২৩৬
৪১. গঙ্গাফড়িং	পৌষ	১৩২৭	পৃ: ২৭৭-২৮৪
৪২. আমাদের শরীরের কথা	পৌষ	১৩২৮	পৃ: ৩৮-৪৫*
	আষাঢ়	১৩২৮	পৃ: ১০০-১০৭
	শ্রাবণ	১৩২৮	পৃ: ৯৮-১০৩
	ভাদ্র	১৩২৮	পৃ: ১৪৭-১৫২
	আশ্বিন	১৩২৮	পৃ: ১৭২-১৭৭
৪৩. আমিবা বা অনন্তরূপী প্রাণী	বৈশাখ	১৩২৮	পৃ. ২-৭
৪৪. আমরা কি ঘাস খাই?	ভাদ্র	১৩২৭	পৃ. ১৪১—১৪৪
৪৫. উই এর কথা—	অগ্রহায়ণ	১৩২৮	পৃ: ২৩৭-২৪৮

সাহিত্য

৪৬. ফুলের রং ও ভ্রমর	বৈশাখ	১৩০৭	পৃ: ৪২-৪৭
৪৭ আলোক দৃশ্য ও অদৃশ্য	ভাদ্র	১৩০৭	পৃ: ২৯২-২৯৮
	আশ্বিন	১৩০৭	পৃ: ৩৫১-৩৬১
	চৈত্র	১৩০৭	পৃ: ৭৩৯-৪৫
৪৮. উদ্ভিদের বংশ বিস্তার	কার্ত্তিক	১৩০৮	পৃ: ৪৩৫-৪৪৪
৪৯. মূষিকাদি	কার্ত্তিক	১৩২৬	পৃ: ৫১৩-৫২২
৫০. অমর জীব			
প্রদীপ	আশ্বিন + কা:	১৩০৮	পৃ: ৩৮৬-৩৮৯

সন্দেশ

১. রাক্ষুসে মাকড়সা	অগ্রহায়ণ	১৩২৩	পৃ: ২৩৭-২৪২
২. কাঁকড়া বিছে	পৌষ	১৩২৩	পৃ: ২৭০-২৭৪
৩. চেলা বা তেঁতুলে বিছা	চৈত্র	১৩২৫	পৃ: ৩৬৪-৩৬৮
৪. কাঠি ফড়িং	জ্যৈষ্ঠ	১৩২৬	পৃ: ৩৮-৪৩
৫. পোকার কীর্তি	আষাঢ়	১৩২৬	পৃ: ৮৫-৮৭
৬. পোকার কথা-a	শ্রাবণ	১৩২৬	পৃ: ৯৮-১০৩
	ভাদ্র	১৩২৬	পৃ: ১৩৪-১৪১

৭.	মাল পোকা	আশ্বিন ১৩২৬	পৃ: ১৬৬-১৭১
৮.	আরসলা	কার্ত্তিক ১৩২৬	পৃ: ২২১-২২৪
		অগ্রহায়ণ - পৌষ ১৩২৬	পৃ: ২৫৭-২৬৩
৯.	বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	মাঘ - ফাল্গুন ১৩২৬	পৃ: ২৮২-২৮৫
১০.	জোঁক	মাঘ ফাল্গুন ১৩২৬	পৃ: ৩০২-৩০৯

* মূল পত্রিকায় পৃষ্ঠাসংখ্যার গোলমাল আছে।